যুগস্রষ্টা নজরুল

খান মঈনুদ্দীন

হরফ প্রকাশনী
এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলকাতা-১২

প্রকাশক : আবদুল আজীজ আল্-আমান
এম. এ., সোলেমানপুর, রাজীবপুর,
২৪ পরগণা। প্রথম প্রকাশ : ১১ই জ্যৈষ্ঠ,
১৩৭১, নজরুলের ৭১তম জন্ম দিবস।
মুদ্রাকর : শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দলপতি, শ্রীসারদা
প্রেস; ৪এ বৃন্দাবন বোস লেন, কলকাতা ৬।
প্রচ্ছদ : শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী।

মূল্য : সাড়ে ছ' টাকা

যুগস্রষ্টা নজরুল

উৎসর্গ

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

অভিন্ন হৃদয়েষু—

আমার গানের পাখীরা তখনো জাগেনি ভোরের বায়,
কুয়াশা তখনো কাটে নাই নব আলোকের বন্যায়।
তব আহ্বান শোনালো সেদিন নতুন আশার বাণী,
পংক হইতে শতদল তুলি বক্ষে লইলে টানি।
জাগিনু সেদিন আমি মোর মাঝে ফুটিল নতুন প্রাণ,
মুঠি ভরে ভরে লইলাম তুলি সম্পদ অফুরাণ।...
পাঁকের পদ্ম নবদল মেলি' চাহিল চাঁদের পানে,
প্রতি কোষ তার উঠিল ভরিয়া জীবন-জাগানো গানে।
মহাসঞ্চয় ছিল যাহা কিছু করি নাই বেচা-কেনা,
দিলাম পাঠায়ে, তাহার খানিক শুধিতে সে-মোর দেনা।

প্রীতি ধন্য

খান মঈনুদ্দীন

সূচীপত্র

জন্মদিনে	১
বাল্য জীবন কথা	৫
প্রথম পরিচয়	২০
ধূমকেতুর আবির্ভাব	২৭
কায়কোবাদ-নজরুল সাক্ষাৎকার	৩৩
হুগলী জেলে	৩৬
নজরুলের বিবাহ	৫৪
হুগলীতে নজরুল ইসলাম	৬৫
বিপদের চরম মুহূর্ত	৭৫
নজরুল ও লাঙল	৮৩
সওগাত ও নজরুল	৮৬
'সওগাতী-দলে' নজরুল ইসলাম	৯২
নজরুলের অর্থ সংকটে বন্ধুরা	১০২
অধ্যক্ষ সাহেবের পত্র	১০৮
চট্টগ্রামে নজরুল	১৩২
নজরুলকে জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা	১৩৫
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষণ	১৪১
'কাব্য সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান'	১৫৩
নজরুল ও কল্লোল-গোষ্ঠী	১৫৯
নজরুলের একটি গান	১৬৫
কোলকাতায় নজরুল ইসলাম	১৭০
বুলবুলের মৃত্যু	১৭৬
গানের রাজ্যে নজরুল	১৮৭
দরাজদিল নজরুল ইসলাম	১৯১
'নজরুল-সাহিত্য'	২০৬
রুচিবান নজরুল	২১০
গণ-সাহিত্যের সংজ্ঞা	২১৫
কয়েকটি খুঁটিনাটি ঘটনা	২১৭
ধ্যান-স্তিমিত নজরুল	২৩৫
ধ্যান স্তিমিত হবার পর	২৪৬
নজরুলের চিকিৎসা	২৫৩
নজরুল গ্রন্থ-পরিচয়	২৫৮

ভূমিকা

'যুগ-স্রষ্টা নজরুল' জনপ্রিয় কবি নজরুল ইসলামের পূর্ণাংগ জীবনী নয়। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে আমার যতটুকু সম্পর্ক—আমি তাঁকে যেমন দেখেছি, তাই এখানে লিপিবদ্ধ করেছি। এ-সম্পর্কে যে-সকল কাগজ-পত্র, দলিল দস্তাবেজ আমার কাছে ছিল, যক্ষের ধনের মতো যা আমি আঁকড়ে রেখেছিলাম, বর্তমানে তার অনেকগুলি আমার কাছে নেই। তাই স্মৃতির সাগর মন্থন করে, আর সমসাময়িক বন্ধুদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে, এ-বইখানা প্রামাণ্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যে-সকল বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে, অথবা স্মৃতিতে ঝাপ্‌সা হয়ে দেখা দিয়েছে, ঘটনা বিকৃতির আশংকায় সেগুলো পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পাইনি। বাল্য-জীবনী নজরুলের নিকটতমদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি।

এতে ভাষার কারিকুরি দেখিয়ে নজরুলকে 'অতিমানুষ' হিসাবে চিত্রিত করার বৃথা চেষ্টা করিনি। নজরুলের ভক্ত হিসাবে তাঁর প্রতি যতটা পক্ষপাতিত্ব করা আমার পক্ষে ছিল স্বাভাবিক, তাও যথেষ্ট পরিমাণে পরিহার করার চেষ্টা করেছি। কোনো কাল্পনিক ঘটনাও এতে স্থান পায়নি। অনেক প্রয়োজনীয় এবং তথ্যপূর্ণ ঘটনা বাদ গেছে। কারণ ঐ সকল ঘটনার সাথে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটেনি।

নজরুল ও তাঁর সমসাময়িক ঘটনার আলোচনা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে হয়তো নিজেকে অতিরিক্ত প্রকাশ করে ফেলেছি। যে সকল ঘটনার নিন্দা বা প্রশংসার জন্ত একমাত্র আমিই দায়ী, সে-ক্ষেত্রে নিজেকে প্রকাশ না করে আমার উপায় ছিল না। নতুবা প্রকৃত ঘটনায় আলোকপাত করা একপ্রকার দুরূহ হতো।

এর কয়েকটি অনুচ্ছেদ আগেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আজকের তরুণ বন্ধুদের অনেকেই আমাকে কয়েক বৎসর ধরে অনুরোধ করছিলেন নজরুল ও তাঁর সমসাময়িক ঘটনাগুলো বিস্তৃত করে লিখতে। এ-বই লিখে তাঁদের সে ইচ্ছাই পুর্ণ করলাম। তাঁদের মনোমত করে লিখতে পেরেছি কি না, এ কথা তাঁরাই বলতে পারবেন।

যাঁরা দিয়েছেন এ বই লিখতে আমাকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, ঘটনা যাচাই করতে করেছেন অকুণ্ঠ সাহায্য, তাঁদেরকে জানাই আমার অন্তরের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা। এঁদের ভেতর অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, কবি সুফিয়া কামাল, এম নাসিরউদ্দিন, কবি আবদুল কাদির, মঈন উদ্‌দীন হোসায়ন, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, কবি পুত্র কাজী সব্যসাচী ইসলাম, মুস্তাফীজুর রহমান খান, ডাঃ সিরাজউদ্দীন আহমদ, ও ইজাবউদ্দীন আহমদ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোহাম্মদ নাসির আলি সাহেবের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন: তিনি তাঁর সংগৃহীত বহু মুল্যবান তথ্যপূর্ণ পত্র-পত্রিকা আমাকে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও নাট্যকার জনাব ইব্রাহীম খলিল সাহেবানও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন।

খান মঈনুদ্দীন

জন্মদিনে

এগারোই জ্যৈষ্ঠ।

প্রতি বৎসর এই দিনটি আসে আমাদের কাছে। আসে সোনালী ঊষার রঙ মেখে। সোনার মুকুট মাথায় নিয়ে। সোনাহাত বাড়িয়ে দেয় আমাদের দিকে। আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই, বিস্মিত হয়ে যাই। হতবাক হয়ে থাকি, ক্ষণিক। .

এই দিনে আমরা মেতে উঠি, নেচে উঠি। আনন্দে আমাদের বুক দুলে ওঠে, ফুলে ওঠে। আমরা উৎসব করি এই দিনে, আমোদ করি।

এই দিনে জন্ম হয়েছে এক কবির।

এই কবি সমগ্র জাতির মনে এনেছে আনন্দের জোয়ার। অবহেলিত, উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত জাতির মনে করেছে আশার সঞ্চার। দুর্বল মৃত-কল্প জাতির মনে জাগ্রত করেছে চেতনাবোধ। এই কবিকে আমরা জানাই এই দিনে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা।

এই কবির ছিল মহান সুন্দরের সাধনা। এ-সাধনা তিনি লোক লোচনের অন্তরালে কোনো গিরিগুহায় বসে করেননি। এরূপ প্রকৃতিও ছিল না তাঁর।

এসেছিলেন তিনি উল্কার মতো বেগে।

ঝঞ্ঝার মতো বেগে।

ধূমকেতুর বিরাট পুচ্ছে ভর করে।

একান্ত আকস্মিক।

তাঁর এক হাতে ছিল 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী', আর অপর হাতে ছিল 'রণতূর্য'। তিনি ডেকেছিলেন জাতিকে। জাতি তাঁর সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল। ঘুম ভেঙে তাঁর দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছিল। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বলেছিল ঃ "কে এলো—ঐ কে এলো।"

মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্র-প্রভাবিত দেশ। এক নয়া-নকীবের আগমন-বার্তা পেয়ে যেন চমকে উঠেছিল। দিকে দিকে পড়ে গিয়েছিল অপূর্ব সাড়া। সবার মন চীৎকার করে বলেছিল ঃ হাঁ, হাঁ, এই তো চেয়েছিলাম। আমাদের মনের কথাই বলছেন ইনি।

এই কবির নাম ঃ কাজী নজরুল ইসলাম।

কাজী নজরুল ইসলাম নতুনের জয়কেতন উড়িয়ে, হাত উঁচিয়ে, গা দুলিয়ে, মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে পরাধীন জাতির কানে অভয়মন্ত্র উচ্চারণ করলেন ঃ

"বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ
নবযুগ ঐ এলো ঐ,
এলো ঐ রক্ত-যুগান্তর-রে।"

দেশের বুকে তখন রক্ত-যুগান্তরই এলো। কবি রক্তযুগের নিশান-বরদার হয়ে দাঁড়ালেন এসে তরুণ-সমাজের সামনে। তাঁর কবিতা, তাঁর গান আর গানের অপূর্ব সুর-মূর্ছনা তরুণচিত্তকে উন্মাদ করে ছাড়লো। দেশ জেগে উঠলো, মেতে উঠলো। প্রাণ-বন্যায় ভেসে গেলো দেশ। কী যে জোয়ার এলো সবাকার মনে, আজ তা বলে বোঝাবার নয়। শুধু সে-যুগের সাক্ষী যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁরা সে-কথা কোনোদিন ভুলতে পারবেন না।

নজরুল তরুণের কবি। যৌবনের কবি। জাতীয় জাগরণের কবি। তাই যুগ যুগ ধরে তিনি বেঁচে থাকবেন তরুণ-মনে। বয়সের বিচারে মানুষ বার্ধক্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছলেও, যদি তাঁর অন্তরের নিভৃততম কোণে কণামাত্রও তারুণ্য বেঁচে থাকে, তা হলে নজরুলের কবিতা, নজরুলের গান তাঁকে অভিভূত করবেই। একে

একটা সাময়িক ঘটনা বা ভাবোচ্ছ্বাস বলে উড়িয়ে দিতে তাঁর হৃদয় কাঁপবে।

যে-সময় নজরুলের আবির্ভাব, সে-সময় পরাধীনতার গ্লানিতে দেশ মুহ্যমান। খেলাফৎ-অসহযোগ-আন্দোলনের গতি-চাঞ্চল্য দেশের সামনে ধরেছে এক আগে-চলার ইংগিত। এ কথা অস্বীকার করলে অন্যায় হবে যে, সে-আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়েছিল নজরুলের অপূর্ব কণ্ঠ-নিনাদ। সে-আন্দোলনকে জোরদার করেছিল নজরুলের গান আর কবিতা। বিশেষ করে বাঙলা দেশে। তার ধাক্কা গিয়ে পৌঁছেছিল সারা ভারতেই।

দেশ আজ আজাদ। এই আজাদী-প্রচেষ্টার এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে নজরুলের সৃষ্টি। তাঁর ছিল আল্লার দেওয়া বিরাট কাব্য-প্রতিভা। অকৃত্রিম দেশপ্রেম। আর সমগ্র মানব-সমাজের প্রতি সীমাহীন মমত্ববোধ। তাঁর ভাষা ছিল আবেগময়ী আর মর্মস্পর্শী, কণ্ঠে ছিল বলিষ্ঠ আওয়াজ, আর অন্তরে ছিল অসীম দরদ। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি ছিল আবেগের-গভীরতায় সমুদ্রের মতো অতলস্পর্শী।

এ জন্য নজরুল আজ 'জাতীয় কবি' আখ্যায় আখ্যায়িত। এ জন্য আমরা করি তাঁর জন্মদিনে—এগারোই জ্যৈষ্ঠ তারিখে,—আনন্দ-উৎসব।

প্রতি বৎসর এই দিনে জাগে আমাদের মনে আনন্দের জোয়ার।

এই দিনে পালন করি আমরা জাতীয়-উৎসব।

সালাম জানাই আমরা জাতীয় কবিকে।

তাঁর অপূর্ব দেশপ্রেমকে।

তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষার প্রবহমান গতিকে।

তাঁর সভা-সমিতিতে উচ্চতর কণ্ঠ-নিনাদকে।

তাঁরা আড্ডা-মজলিসে প্রাণখোলা আর দিলখোলা হাসি-উল্লাসকে।

তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটকের জীবন্ত চরিত্র-চিত্রণকে।

তাঁর কবিতার জ্বালাময় প্রলয়োল্লাসকে।

তাঁর রঙ্গরস, তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে।

তাঁর গানের অনাবিল সুর-মূর্ছনাকে।

তাঁর দারিদ্র্যের প্রতি, উৎপাড়িত আর লাঞ্ছিতের প্রতি সীমাহীন মমত্ববোধকে।

তাঁর সংসারবিবাগী, ধ্যান-স্তিমিত সেই পরম পবিত্র চিরসুন্দরের সাধনামগ্ন দীপ্তি-সমুজ্জ্বল সৌম্য-সমাহিত ভাবকে।

এক কথায় তাঁর সমগ্র মহান-সৃষ্টিকে।

তাঁকে জানাই আমাদের হাজারো সালাম।

বাল্য জীবন-কথা

নজরুলকে আমরা ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। ভালোবাসি তাঁর গান, কবিতা গল্প, উপন্যাস। তাঁর ভাষা জোরালো; বর্ণনাভঙ্গি সুন্দর। তাঁর কথায় যেন আগুন ঝরে। সকলের মনের কথা টেনে বার করে তিনি যেন ছড়িয়ে দিয়েছেন কাগজের বুকে। ঝরনাধারার মতো উচ্ছল তাঁর গতি। সাগর-কল্লোলের মতো আবেগময়।

নজরুল-দর্শন টেনে নিয়ে যায় মানুষকে মহা সুন্দরের দিকে, মহা সত্যের আবেষ্টনীতে। আর মানুষ হিসাবেও নজরুল প্রাণবান মানুষ। হয়তো লাখে একজন এমন মানুষ মেলে। তাই আমরা সবাই তাঁকে ভালোবাসি।

তেরো শ' ছয় সালের এগারোই জ্যৈষ্ঠ (২৫-৫-১৮৯৯ ইং)। এই দিনে নজরুলের জন্ম হয়েছিল বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ আর মা জাহেদা খাতুন কি ভাবতে পেরেছিলেন, দুঃখ-দৈন্যে পালিত নজরুল একদিন সমগ্র দেশের অন্তর জয় করতে পারবেন? শ্রদ্ধালাভ করতে পারবেন অগণিত জন-সাধারণের? তাঁর ছেলেবেলার ক্রিয়াকলাপ দেখে বরং তাঁদের মনে হতাশারই সঞ্চার হয়েছিল।

ফকির আহমদ সাহেব নিজে ছিলেন খুব মুসুল্লী আর পরহেযগার মানুষ। হরদম তিনি থাকতেন নামাজ-রোজা আর তসবীহ-তেলাওয়াৎ নিয়ে মশগুল। তাঁদের বাড়ীর কাছে ছিল পীর-পুকুর নামে এক প্রকাণ্ড দীঘি। তার পাড়ে ছিল হাজী পাহলোয়ান নামে এক পীর

সাহেবের মাজার-শরীফ, আর একটি মসজিদ। এই মাজার আর মসজিদের খিদমত করেই ফকির আহমদ সাহেব সারাদিন কাটিয়ে দিতেন।

নজরুল ইসলাম ছোটবেলায় ছিলেন খুব ডানপিটে আর দুষ্টু। তাঁর রহস্যময় জীবন-কথা তিনি কাউকেই বলেননি। তবে তাঁর ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে আমাদের কাছে বলেছেন, তাঁর দুষ্টুমির জ্বালায় গাঁয়ের সবাই নাকি ভয়ে কাঁপতো। কতো রকমের দুষ্টুমি-ই যে তাঁর মাথায় খেলতো, তা' আল্লা-ই জানেন। পাখীর ছানা পাড়া থেকে আরম্ভ করে মানুষের পাকা ধানে মই দেওয়া পর্যন্ত কোনো দুষ্টুমিতেই তিনি পিছপাও ছিলেন না। পিতার কড়া শাসন, মায়ের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে তিনি গাঁয়ের বখাটে ছেলেদের নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়াতেন। তাঁর দুষ্টুমি কখনো কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যেতো। গ্রামের সকল দুষ্টু ছেলের তিনি ছিলেন সর্দার।

আর দশটি ছেলের যেমন হয়, তেমনি তাঁর পিতা তাঁকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। পিতার ইচ্ছা ছিল নিজের আদর্শে তিনি ছেলেকে গড়ে তুলবেন। নজরুল মক্তবে কিছু ফার্সী আর কুরআন-শরীফ পড়েছিলেন।

●

দুষ্টু ছেলেদের বেলায় দেখা যায়, দুষ্টুমিতে তারা যেমন ওস্তাদ আবার পড়াশুনায়ও তারা হয় সবচেয়ে ভালো। নজরুলের বেলায় এর ব্যতিক্রম হয়নি। দশ বৎসর বয়সে যখন তিনি মক্তবের পড়া শেষ করলেন, তখন দেখা গেল: তিনি যেটুকু শিখেছেন, তার মধ্যে কোনো গলদ নেই। কোনো ফাঁকি নেই। এই বয়সেই তিনি উর্দু আর ফার্সী এমন সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতেন যে, তা শুনে সবার তাক লেগে যেতো। তাঁর খুশ-এল্‌হানে কুরআন-শরীফ তেলাওয়াৎ শুনে বড় বড় মওলানা সাহেবান আনন্দে তাঁর পিঠে হাত চাপড়াতেন।

মক্তবের পড়া শেষ হলো তাঁর দশ বৎসর বয়সে। পড়া-শুনায় আর তিনি এগুতে পারলেন না। দু'বছর আগেই (৭ই চৈত্র, ১৩১৪)

তাঁর পিতা ফকির আহমদ সাহেব ইন্তেকাল করেছিলেন। তাই তাঁদের সংসারে এই সময় নেমে এসেছিল চরম দারিদ্র। তাঁর দুঃখিনী মা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অকূল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। কে আর তাঁর পড়া-শুনায় সাহায্য করবে ?

নজরুল ঐ মক্তবেই শিক্ষকতা করলেন এক বছর পর্যন্ত। এই সময় তিনি গ্রামে মোল্লাকীও করতেন, আর করতেন মসজিদে ইমামতী। কিন্তু এই ব্যবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট নন। তাঁর অশান্ত মন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না এই অবস্থাকে। অভিভাবকহীন নজরুলের মন ছুটে চলে লাগামছেঁড়া ঘোড়ার মতো। বাধাহীন, বন্ধনহীন মন। কিন্তু এই অল্প বয়সে কো থায়যাবেন তিনি ?

তাঁর এক চাচার নাম কাজী বজলে করীম। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। ফার্সীতে তিনি কবিতা লিখতে পারতেন। তাঁর প্রভাব নজরুলের জীবনেও ছাপ ফেলেছিল। নজরুল ছোট বয়সেই ফার্সী-বাঙলা মিশানো কবিতা লিখতে চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে দু-একটা কবিতা বেশ ভালো হয়ে যেতো। একটি নমুনা ঃ

“মেরা দিল বেতাব কিয়া
তেরে আব্রুয়ে কামান
জ্বলা যাতা হ্যায়
ইশ্‌ক্ মে জান পেরেশান,
হেরে তোমায় ধনি,
চন্দ্র কলঙ্কিনী
মরি কী যে বদনের শোভা
মাতোয়ারা প্রাণ।
বুলবুল করতে এসেছে
তাই মধু পান।”

ঐ অঞ্চলে ‘লেটো’ নামে কয়েকটা গানের দল ছিল। তারা যাত্রা-গানের মতো পালা-গান করতো। নজরুল এদের জন্য পালা-গান

লিখে দিতেন। পরে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, নজরুলের গান ছাড়া আর আসর জমতো না। এতে কোনো কোনো সময় নজরুল অভিনয়েও অংশগ্রহণ করতেন।

এই পালা-গান লিখে নজরুলের বেশ দু'পয়সা উপার্জন হতো। ঐ অঞ্চলের অধিকাংশ দলই আসতো তাঁর কাছে পালা-গান লেখাতে। তাঁর অসাধারণ শক্তির পরিচয় পেয়ে সবাই একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এ জন্য তাঁর পাশের গাঁয়ে নিমশার দল তাঁকে ওস্তাদের পদ ছেড়ে দিতেও কৃপণতা করেনি। তাঁর ভবিষ্যৎ কবি-জীবনের সূত্রপাত এইখানেই হয়েছিল। এ-কথা তখনই সবাই বুঝতে পেরেছিল যে, একদিন নজরুল বড় হবে—সকলের চেয়ে বড়।

পরবর্তীকালে তাঁর নাম যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তেরা—বিশেষ করে নজরুলেব নিকটতম আত্মীয় কাজী আনওয়ারুল ইসলাম সাহেব সেই সময়কার কিছু কিছু গান আর কবিতা সংগ্রহ করেছেন। এই সংগ্রহেব কাজ এখনো চলছে। তার দু' একটি আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। এতে দেখা যাবে, তাঁর তখনকার সেই অপটু হাতের লেখায়ও বেশ শক্তিমত্তার পরিচয তিনি দিযেছিলেন। নজরুলের ছেলেবেলায় রচিত 'চাষীর সং' নামে ছোট নাটিকার একটি গান:

চাষ কর দেহ-জমিতে
হবে নানা ফসল এতে।
নামাজে জমি উগালে,
রোজাতে জমি সামলে
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কি হে ভবেতে ?
লা-ইলাহা ইল্লিল্লাতে
বীজ ফেলা তুই বিধিমতে
পাবি ঈমান ফসল তাতে
আর রইবি সুখেতে।

নয়টি নালা আছে তাহার,
ওজুর পানি নিয়াত ইহার
ফলে পানি নানাপ্রকার
ফসল জন্মিবে তাহাতে।

যদি ভাল হয়েছে জমি,
হজ-জাকাত লাগাও তুমি,
আর সুখে থাকবে তুমি
কয় নজরুল ইসলামেতে।

এই শিশু-বয়সেই তিনি ইংরাজী-বাঙলা মিশানো কমিক গান লেখায়ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন :

রব না কৈলাসপুরে
আই এ্যাম ক্যালকাটা গোইং।
যত সব ইংলিশ ফেসেন
আহা মরি, কি লাইট্‌নিং॥
ইংলিশ ফেসেন সবি তার
মরি কি সুন্দর বাহার,
দেখলে বন্ধু দেয় চেয়ার,
কামন ডিয়ার গুড্‌ মর্ণিং।
বন্ধু আসিলে পরে,
হাসিয়া হেণ্ডশেক করে,
বসায় তারে রেস্‌পেক্ট করে,
হোল্ডিং আউট এ মিটিং॥
তারপর বন্ধু মিলে
ড্রিঙ্কিং হয় কৌতূহলে
খেয়েছে সব জাতি কূলে
নজরুল ইসলাম ইজ টেলিং॥

নজরুল ইসলামের মনে ছিল আগুনের কুণ্ড। তিনি গ্রামের ঐ

অল্প পরিসরে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। বৃহত্তর জগৎ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, কেমন করে তিনি নিজেকে ঐ গ্রাম্য-পরিবেশে আটকে রাখবেন ? মুক্তপক্ষ বিহংগের মতো তিনি অজানার উদ্দেশ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন, বিলিয়ে দিলেন। গ্রাম থেকে তিনি পালালেন। পালিয়ে এলেন মহকুমা-শহর আসানসোলে। পেছনে পড়ে রইলো তাঁর আজীবন পরিচিত মাঠ। বনবাদাড়। অতি প্রিয় লেটোনাচের মুরুব্বিয়ানা। ব্যগ্রব্যাকুলিতা মা, আর আত্মীয়-স্বজন। কোন কিছুর মোহ-ই আর তাঁকে ধরে রাখতে পারলো না। দিশেহারা পথিক এসে উঠলো আসানসোলে (বাং ১৩১৭)।

আসানসোলে এলেন। কিন্তু কোথায় যাবেন, কি করবেন তিনি ?

এটা শহর। এখানে কেউ কারো দিকে ফিরে তাকায় না। প্রত্যেকটি লোক তার নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। পয়সা ছাড়া এখানে কোনো কাজ হবার জো নেই। পানি খেতে এখানে পয়সা লাগে। প্রয়োজনবোধে মাটিও এখানে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়।

উঠতি বয়স। সংসার-অনভিজ্ঞ কিশোর নজরুল, পেটের দায়ে চাকরি নিলেন এক রুটির দোকানে। আহার, আশ্রয় দুই'ই মিললো। উপরন্তু আরও মিললো তাঁর পাঁচ টাকা, এক মাস গেলে মাইনে পাবেন তিনি। তবু বৃহত্তর পরিবেশে এসে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

এই দোকানে দিনের বেলা কাজ করেন, আর রাত্রে অবসর সময়ে বসেন 'সহী বড় জংগ-নামা' আর 'আলেফ লায়লা' পুঁথি নিয়ে। সুর করে পড়েন তিনি দেয়ালে হেলান দিয়ে। কত লোক জমে যায় !

মসলিসী লোক যেখানে যান, তাঁর মজলিস জমতে দেরি হয় না। নজরুল চিরদিনই মজলিসী লোক। তিনি মাঝে মাঝে হারমোনিয়ম নিয়ে গান করেন, গল্প-কৌতুকে আসর গরম রাখেন, হাসিতে উল্লাসে পাড়া মাতিয়ে রাখেন। প্রাণখোলা তাঁর এই উদ্দামতার জন্য সবাই তাঁকে ভালবাসে।

আসানসোলে কাজী রফিজ উল্লাহ ছিলেন একজন পুলিস সাব-ইন্সপেক্টর। তিনি নজরুলের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন—হলেন বিস্মিত। ভাবলেন : এই প্রতিভাদীপ্ত ছেলেটিকে লেখাপড়া শেখাতে পারলে একদিন হয়তো এ বড় হতে পারবে। তিনি নজরুলকে নিজের দেশে নিয়ে এলেন।

তাঁর বাড়ী ছিল ময়মনসিংহ জেলার কাজীর সিমলা গ্রামে। এর কাছেই দরিরামপুর হাইস্কুল। সেখানে তিনি নজরুলকে ভর্তি করে দিলেন (বাং ১৩১৯, ইং ১৯১২) এই স্কুলে নজরুল ছিলেন মাত্র এক বৎসর। এর মধ্যে ওখানকার হেডমাস্টার বদলী হয়ে যাওয়ায় নজরুলের মন ওখানে টিকলো না। তিনি রাণীগঞ্জে শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেন (বাং ১৩২০, ইং ১৯১৩)।

অর্থকৃচ্ছ্রতা তাঁর জীবনের সাথী। যদিও তিনি একটি অভিজাত বংশে জন্ম নিয়েছিলেন, তবু দারিদ্র্যের নগ্নরূপ তাঁর জন্মগ্রহণের পরই চোখের সামনে প্রতিভাত হয়েছিল। এ-দারিদ্র্য তাঁর কাছে ছিল গৌরবের। দারিদ্র্যই তাঁকে করে তুলেছিল মহান। এ জন্যই তিনি উত্তরকালে 'দারিদ্র্য' সম্বন্ধে সার্থক কবিতা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তার অংশ বিশেষ এই :

"হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক-মুকুট শোভা। দিয়াছ তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি ; বাণী ক্ষুরধার
বীণা মোর শাপে তব হল তরবার !"

দারিদ্র্যকে তিনি বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, এ জন্য তিনি গর্বানুভব করতেন এ কথা সত্য। কিন্তু তাঁর পরবর্তী জীবনে এই দারিদ্র্য যেমন একদিকে তাঁর মুখে জুগিয়েছিল জ্বালাময়ী ভাষা, অপর-

দিকে তাঁর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে করেছিল নানা প্রকারের বাধার সৃষ্টি।

শিয়ারসোল স্কুলে ভর্তি হলেন। কিন্তু খরচ? তাঁর অনাথা মায়ের সংগতি নেই স্কুলের খরচ চালাবার। আত্মীয়-বান্ধব, স্ব-সমাজের ধনী ব্যক্তি কেউ দাঁড়ালো না তাঁর পেছনে। অথচ আরও কিছু লেখাপড়া তাঁকে শিখতে হবে। গ্রাম ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে তিনি এ-সত্য উপলব্ধি করেছেন তখন।

অর্থ তাঁব ছিল না। কিন্তু চোখে-মুখে ছিল প্রতিভার দীপ্তি। এই দীপ্তিতে আকৃষ্ট হলেন স্কুল-কর্তৃপক্ষ।

মৃত কুমার রামেশ্বর মালিয়াহ্ বাহাদুর ওখানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি বোর্ডিং করে দিয়েছিলেন। সেখানে মাত্র পনেরো জন মুসলমান ছাত্র থাকতো। স্কুল-কর্তৃপক্ষের স্নেহ-পুষ্ট নজরুল ঐ বোর্ডিংয়ে স্থান পেলেন বিনা খরচে থাকা ও খাওয়ার সুবিধা পেয়ে। এ ছাড়া স্কুলের বেতন আর পুস্তকের খরচও স্কুল-কর্তৃপক্ষ বহন করতেন।

আমার জনৈক আত্মীয় জনাব সিরাজউদ্দীন আহ্‌মদ নবমশ্রেণী পর্যন্ত নজরুলের সহপাঠী ছিলেন। তিনি বলেন: "পড়াশুনায় নজরুল ববাবরই খুব অমনোযোগী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর ছিল আশ্চর্য মেধা। এরই বলে তিনি প্রতিবারই শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করতেন।" তাঁর কাছ থেকে আমি যে কাগজপত্র সংগ্রহ করেছি; তাতে দেখা যায়, ১৯১৬ সালে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, মিঃ নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। এ-সময় স্কুলে একটি রচনা প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতায় নজরুল পুরস্কার সামান্যই পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রচনা সুধীজনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। স্কুলের মুদ্রিত বার্ষিক বিবরণীতে প্রধান-শিক্ষক মহাশয় নজরুলের নাম উল্লেখ করেছিলেন। রিপোর্টে বলা হয়:

"Further considering the intrinsic merit of the several papers of the competitors of the **Edgely Prize,**

the generous doner has kindly granted Rs. 4/- to each of the three other candidates viz. Balaram Mukherjee, Golak Bihari Misra and **Kazi Nazrul Islam** for their good production of the essay."

পরানুগ্রহে শিক্ষারত এক দরিদ্র মুসলমান বালকের নাম প্রধান-শিক্ষকের বার্ষিক বিবরণীতে স্থান পাওয়া সে-যুগে একটা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক বলে মানতে হবে।

আমাদের কাছে ঐ স্কুলের খানকতক কাগজ আছে। তাতে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে তিনজন শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে তিনখানা বিদায়-অভিনন্দন দেওয়া হয়। এই তিনখানা অভিনন্দন-পত্রই নজরুল ইসলাম লিখে দেন। এগুলো যদিও স্কুলের সকল ছাত্রদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়, তা হলেও এর প্রত্যেকটিতে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী নজরুল ইসলাম সুকৌশলে তাঁর নাম লিখে দেন। সকল ছাত্রের উপর তাঁর এমনি প্রভাব ছিল যে, এতে কেউ আপত্তি করেনি।

নজরুলের বৃহত্তর জীবনী-রচনাকারীদের সুবিধার জন্য এবং পাঠক সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে নিচে একটি অভিনন্দন-পত্র হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম। অবিশ্যি তাঁর কাঁচা বয়সের রচনার ভেতরে কেউ যদি সাহিত্যিক মূল্য খুঁজে বেড়ান, তিনি হতাশ হবেন। অভিনন্দন-পত্রটি এই:

সিয়ারসোল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক বাবু ভোলানাথ স্বর্ণকার বি. এ. মহোদয়ের বিদায় উপলক্ষে—

'করুণ গাথা'

(১)

নয়ন গলিয়া বয় তপ্ত অশ্রুনীর,
অশ্রু নয়, সে যে ভগ্ন-মরম-রুধির।

নয়গো চোখের দেখা হৃদয় হৃদয়ে আঁকা
ভিজায়ে সেনেহ ক্ষীরে তুষিত সোহাগ ভরে
ভকতি উথলি চিত করিত অধীর ;
মিহির কিরণে ওগো শুষিল শিশির।

(২)

জলধি শুকায়ে যাও অনিল বয়ো না,
বসিয়া তমাল ডালে পাপিয়া গেয়ো না,
নিঝুম নিঝুম সব থেমে যাক কলরব
থামুক শিশুর হাসি গোলকে বেজনা বাঁশী,
সেনেহ মমতা আর ধরায় রয়োনা।
অপত্য পিতার কোলে যেয়ো না যেয়ো না।

(৩)

রুদ্ধ বেদনা গো ছুটিছে মথিয়া হিয়া,
কাঁদিতে জনম, মোরা কাটাব কাঁদিয়া।
সন্তানে ফেলিয়া পিতা, কখন যায় কি কোথা ?
দিবনা দিবনা যেতে, কাঁদিয়া দাঁড়াব পথে,
দেখিব কেমনে যায় মোদের ঠেলিয়া,
হৃদয় বিদীর্ণ হও মরম চাপিয়া।

(৪)

ললাটে লিখন বিধি এত কি কঠোর,
নিমেষে ছিঁড়িয়া ফেলে দৃঢ় স্নেহ-ডোর,
কল্পিয়া কতই আশা, বাঁধিনু সুখের বাসা,
সহসা বহিল বায়, কোথায় উড়িয়া হায়,
সে বাসা ; নিরাশা শুধু হেরি এবে ঘোর।
সাধ না মিটিতে হল সুখনিশি ভোর।

(৫)

এতই উদার তুমি তরুণ বয়সে
হৃদয় গলিয়া যেত তোমার পরশে।
সুধীকুল শিরোমণি, সেনেহ হীরক খনি,
অটল করম ক্ষেত্রে, করুণা খেলিছে নেত্রে,
কর্তব্য সাধনে ধীর, বীর সু-সাহসে ;—
ভোলানাথ ! যেয়োনা গো ত্যাজি এ কৈলাসে

(৬)

সকলি ভুলিব কালে, রহিবে কীরতি,
তোমার মহিমা-গাথা গাউক ভারতী ;
ধাও গো উন্নতি পথে চড়িয়া কিরতি রথে,
বরষি বিমল যশঃ ধরার কলুষ নাশ,
হও গো আঁধারে চির ইরম্মদ জ্যোতি,—
তোমার রুচির বাসে মাতুক এ ক্ষিতি।

(৭)

লাবণ্য শুকাল আজ সকলি ফুরাল,—
মঞ্জু-কুঞ্জ বনে কলি ঝরিয়া পড়িল।
আড়ালে লুকাল চাঁদ ধৈরয ভাঙ্গিল বাঁধ,
থামিল সাগর জল, উড়ে গেল পরিমল ;
ক্ষণপ্রভা হেসে ওই কোথায় লুকাল
সাধ না মিটিল হায় আশা না পুরিল।

(৮)

মধুর স্বপন ভাঙ্গি স্তবধ নিশীথে
করুণ বিলাপ গান গাহিল বাঁশীতে—

উঠরে বালক কুল মুছিয়া আঁখির জল
করে নে' বরণ ডালা দে গলে পরিয়ে মালা
চরণ ঢাকিয়া দে রে প্রসূন রাশিতে
পাবি না আর যে কভু এ ভালবাসিতে।

১৯১৬ সালের ১৬ই জুলাই এই অভিনন্দন-পত্র পড়া হয়। তখন নজরুল ইসলাম উক্ত স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

প্রতিভাশালী লোকদের বোধহয় ধর্মই এই যে, পাঠ্যপুস্তকের ধরা-বাঁধা সীমার ভেতরে তাঁরা থাকতে চান না। তাই নজরুলের ভেতরেও দেখা যায়, তিনি এই সময় পাঠ্য-বইয়ের চেয়ে বাইরের বই পড়তেই ছিলেন বেশী আগ্রহশীল। এ ছাড়া খেলা-ধূলা, উৎসব-আয়োজনেই তাঁর সময় কাটতো বেশী। পরীক্ষার খাতা সামনে নিয়ে তিনি যেতেন ভাবরাজ্যে ডুবে। আসল জিনিস ছেড়ে তিনি তাতে হয়তো লিখে দিয়ে আসতেন ছন্দোবদ্ধ কবিতা বা আবেগময়ী রচনা। যাহোক এমনি হ-য-ব-র-ল আর গোলমালের ভেতর দিয়ে তিনি দশম শ্রেণীতে উঠলেন। তাঁর মেধা দেখে শিক্ষকদের আশা ছিল, তিনি ভালোভাবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের এ আশা পূরণ হলো না।

ইতিপূর্বেই (১৯১৪ খ্রীঃ) সারা পৃথিবীময় প্রথম মহাযুদ্ধের রণ-দামামা বেজে উঠেছিল। দলে দলে লোক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নাম লেখাতে শুরু করেছিল। চির-চঞ্চল নজরুল এই সময় একদিন ঊনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী-পল্টনে নাম লিখিয়ে করাচী পাড়ি দিলেন (বাং ১৩২৩, ইং ১৯১৭)। পিছনে পড়ে রইলো তাঁর স্কুল, আর ইতি হলো তাঁর পড়াশুনার। কেন, কি কারণে তিনি স্বেচ্ছায় এই মৃত্যুর মুখে এগিয়ে গিয়েছিলেন, সে গোপন কথাটি তিনি কাউকে বলেন নি। আমরা বহু চেষ্টা করেও তাঁর কাছ থেকে এ কথাটি বার করতে পারিনি। এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে

গেছেন অতি সুকৌশলে। এর ভেতরে কি গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে, তা কে বলবে?

নজরুল হঠাৎ যুদ্ধে চলে যাওয়ায় সবাই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত লেটোনাচের দল এ-সম্বন্ধে একটি গান লিখে নিজেদের দুঃখ প্রকাশ করেন। এ গানটি কাজী আনওয়ারুল ইসলাম সাহেব সংগ্রহ করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। গানটি এই:

"আমরা হয়েছি অধীন,
হয়েছি ওস্তাদহীন।
তাই ভাবি নিশি দিন,
বিষাদ মনে।

নামেতে নজরুল ইসলাম
কে দিবে তার গুণের প্রমাণ,
না পাই তাঁহার সন্ধান
কোনখানে।

শুনেছি মনের খেদে
গেছেন লড়ায়ে।
ভাই-ভগ্নী বন্ধু মাতা
সকলে ছাড়িয়ে।

নাহি কিছু চারা,
কেন্দে সবে সারা,
বহায় কেবল ধারা
দু'নয়নে।"

নজরুলের ভেতরে ছিল আল্লার দেওয়া অসীম শক্তি। তাই ছেলে-বেলা যখন তিনি দুষ্টুমি করতেন, তখন ছিলেন দুষ্টুদলের সর্দার। গ্রামে মোল্লাকী করার সময় তিনি হয়েছিলেন মসজিদের ইমাম। লেটোর দলে

গান গেয়ে বেড়াবার সময় তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ওস্তাদের আসন। সকল ছেলের ওপর স্কুলে মাতব্বরী করে বেড়ানোই ছিল তাঁর কাজ। এ-হেন নজরুল কি যুদ্ধে যোগ দিয়ে ক্ষুদে পল্টন হয়ে থাকতে পারেন? সেখানেও সকল পল্টনের ওপর হাওয়ালদার (হাবিলদার) হয়ে সকলের মাথার মণি হয়ে রইলেন।

পল্টনের দলে ছিলেন একজন ফার্সী-জানা মওলবী। তাঁর সাহায্যে তিনি ভাল ভাল ফার্সী কবিতার বই—বিশেষ করে হাফিজের বইগুলো পড়ে ফেললেন। আর বাঙলা ভাষায় দিতে লাগলেন তারই রূপ। তাঁর ভাষা নতুন। বলার ভঙ্গি নতুন। বাঙলা দেশের সবাই তাঁর এই নতুন লেখার সাথে পরিচিত হয়ে চমকে উঠলো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই তিনি পাঠাতেন তাঁর লেখা। আর পাঠক মুগ্ধ হতো, বিস্মিত হতো তাঁর লেখা পড়ে। তখন তিনি নাম স্বাক্ষর করতেন, 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' বলে। এই সময় তাঁর "বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী" 'সওগাতে' এবং "মুক্তি" 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।

এরপর নজরুল ১৩২৬ বাঙলা সালের (ইং ১৯১৯) শেষের দিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন। এসে তিনি আস্তানা নিলেন কলকাতার ৩২নং কলেজ স্ট্রীটের দোতলায়—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির অফিসে। সেখানে তখন থাকতেন : ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ মুজাম্মেল হক (বরিশাল) মুজাফ্ফর আহ্মদ ও এম, আফজাল-উল্-হক্ সাহেবান।

নজরুলের সামান্য কয়েকটি মাত্র লেখা এর মধ্যে বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। তাতেই তিনি 'সৈনিক কবি' আখ্যা পেয়েছেন। আর যুবক মনে ধরিয়ে দিয়েছেন আগুন। ক্রমে ক্রমে ঝুঁকে পড়ছে সারা দেশ তাঁর দিকে।

এখানেই আমি নজরুলের বাল্যজীবনের রেখা টানছি। কারণ আমি তাঁর বৃহত্তর জীবনী লিখছি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে

যেমন দেখেছি, তা-ই লিপিবদ্ধ করছি। এতে নজরুলের ভাবী বৃহত্তর জীবনীকারদের কিছু সাহায্য হতে পারে।

নজরুলের অনেক লেখার পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র এবং প্রামাণ্য দলিল-দস্তাবেজ আমি রক্ষা করেছিলাম। শত বাধা, শত বিপদ এড়িয়ে দেশ বিভাগের পর ওগুলো ঢাকায় নিয়েও এসেছিলাম। কিন্তু কতক উই পোকায় কেটে নষ্ট করে দিয়েছে। কতক বাসার এক চাকর আমার অজ্ঞাতে কোনো মুদী দোকানে বিক্রি করে দিয়েছে!

প্রথম পরিচয়

উনিশ শ' কুড়ি সাল।

ছয় নম্বর টার্ণার স্ট্রীট, কলকাতায় 'নবযুগ' অফিসে প্রথম দেখি আমি কবিকে। তিনি তখন যুদ্ধ থেকে ফিরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র অফিসে থাকেন, আর 'নবযুগে'র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন।

'নবযুগ' ছিল একখানি দৈনিক পত্রিকা। ডিমাই সাইজ বাদামী কাগজের চার পৃষ্ঠায় ছাপা হতো। এর পরিচালক ছিলেন, জনাব এ, কে, ফজলুল হক সাহেব। সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেনঃ জনাব মুজাফ্‌ফর আহমদ, জনাব ফজলুল হক সেলবর্ষী, মওলবী মঈন উদ্‌দীন হোসায়ন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেবান। ওয়াজেদ আলী সাহেব বিশেষ কারণে শেষ পর্যন্ত 'নবযুগে' যোগ দিতে পারেন নি।

চার পৃষ্ঠার কাগজ—কিন্তু আগুন! নজরুলের যোগদানের কয়েক দিনের মধ্যেই 'নবযুগ' সারা বাঙলাদেশে নবযুগের সৃষ্টি করে। তাঁর বলিষ্ঠ ভাষা আর সংবাদ-পরিবেশনের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে মেতে ওঠে জনসাধারণ। ভীরু বাঙালীর কলম যে পাঠকমনে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, 'নবযুগে' নজরুলের যোগ দেওয়ার আগে এ-কথা কেউ ভাবতে পারেনি। তাঁর ভাষার গতি ছিল প্রবহমান, বর্ণনার ভঙ্গী ছিল উচ্ছল আর বেগবতী। আর একটা অতি সাধারণ সংবাদও এমন রসালো করে পরিবেশন করা হতো, যার ফলে অতি সাধারণ পাঠকের মনও আনন্দ-চঞ্চল না হয়ে পারতো না। সবচেয়ে আনন্দ-

দায়ক হতো তাঁর হেডিংগুলো, আর সংবাদ-শেষে একটি শব্দ বা একটি বাক্যে মন্তব্য-প্রকাশে।

কবি আগামীকালের জন্য কপি তৈরি করছিলেন। মৃদু পদক্ষেপে সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি মাথা তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন : "কি চাই আপনার?"

আমি তখন কিশোর। সাহিত্যিকদের সাথে আলাপের ঔৎসুক্য নিয়ে এ-অফিস, ও-সমিতিতে ঢুঁ মারি। এখানে এই নতুন পরিবেশে এসে বুক দুরু দুরু কাঁপছে। কেমন করে বলবো কি চাই আমার? একটু ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললাম—"এই—এই—আমি হচ্ছি আপনাব লেখার একজন ভক্ত। দেখতে এলাম আপনাকে।"

হো হো করে কবি হেসে উঠলেন। সে কী বিরাট হাসি। একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন বসতে। আর হাত বাড়িয়ে দিলেন 'হ্যাণ্ডশেক' করবার জন্য।

হাতে হাত দিলাম। তুলোর মত নরম সুন্দর হাত। কিন্তু শিরায় শিরায় আমার যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। তাঁর মনের বলিষ্ঠতা আর যুদ্ধ-ফেরত রাইফেল-ধরা হাতের ইলেক্‌ট্রিসিটি কি আমার সমগ্র দেহে আর মনের পরতে পরতে এক অপূর্ব পুলকের সৃষ্টি করলো?

এরপর তাঁর সাথে আমার আরও কয়েকবার দেখা হয়েছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র অফিসে।

জনাব ফজলুল হক সাহেবের সরলতার সুযোগ নিয়ে জনৈক ব্যক্তি প্রেসের স্বত্বাধিকারপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে উঠেন। ফলে পরিচালক-মণ্ডলীর মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। আর 'নবযুগে'র প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়। আর নজরুল বেকার হয়ে পড়েন।

যুদ্ধে যাওয়ার পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট নজরুলকে সাব-রেজিষ্ট্রার অথবা পুলিসে চাকুরি দিতে চেয়েছিলেন। নজরুল তা গ্রহণ করেননি।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (শান্তিপুর) সাহেবের সম্পাদনায় এই সময় 'মোসলেম-ভারত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

উহা দেখাশোনা করার ভার ছিল তাঁর সুযোগ্য পুত্র এম, আফজাল-উল্-হক্ সাহেবের উপর। এর প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে। নজরুলের পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা' এর প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় এরও আগে প্রকাশিত হয় 'ব্যথার দানে'র কতক অংশ। 'ব্যথার দানে'র ভাষার উদ্দামতা আর আবেগের প্রাচুর্য, তরুণ-বাঙলাকে করে ফেলে অভিভূত।

এর পরের বৎসর ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' কবির বিখ্যাত দু'টি কবিতা 'বিদ্রোহী' ও 'কামাল পাশা' বের হয়। মনে আছে সেদিন আমাদের তরুণ মনে কী আবেগ, কী উদ্দামতা জেগেছিল। সারা বাঙলাদেশ যেন আনন্দে, উত্তেজনায় হয়ে উঠেছিল চঞ্চল। পথে ঘাটে, চায়ের বৈঠকে, রেস্তরাঁয় এই কবিতারই আলোচনা চলেছিল।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন গুরুগম্ভীর প্রবীণ সম্পাদক। তিনি অতি সাবধানে তাঁর সম্পাদিত 'প্রবাসী' পত্রিকার আভিজাত্য বাঁচিয়ে চলতেন। 'মোসলেম ভারত' থেকে 'প্রবাসী'তে তিনি 'বিদ্রোহী' সংকলন করেন (মাঘ, ১৩২৮)। এরপর যুদ্ধ-ফেরত 'সৈনিক কবি' বলে যাঁকে বাঙলাদেশ জানতো, তিনি সারা ভারতে খ্যাত হলেন 'বিদ্রোহী'র 'বিদ্রোহী-কবি' বলে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে 'বিদ্রোহী' মোসলেম ভারতে প্রকাশ হতে বিলম্ব হওয়ায় তার আগেই 'সাপ্তাহিক বিজলী'তে উহা প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে 'বিদ্রোহী'র রচনাকাল ১৩২৮ সালের পৌষ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। তখন কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' প্রেসের কবলে। নজরুল উহা 'মোসলেম ভারতে'ই প্রকাশের জন্য দেন। কিন্তু উহা প্রকাশ হতে দেরি দেখে নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকার তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে 'বিদ্রোহী'

আগেই প্রকাশ করেন (২২শে পৌষ ১৩২৮, ইং ৬।১।১৯২২)। এতে তিনি তাঁর সাংবাদিক কূটকৌশল প্রয়োগ করেন। তিনি এমনভাবে বিজলীতে 'বিদ্রোহী' প্রকাশ করেন, যেন তিনি উহা 'মোসলেম-ভারত' থেকেই উদ্ধৃত করছেন। ঐ সংখ্যা বিজলীতে কার্তিক-সংখ্যা 'মোসলেম-ভারতে'র একটি ছোট সমালোচনা তিনি প্রকাশ করেন। এই সমালোচনার শেষে তিনি লিখেছিলেন—"এই সংখ্যায় 'মোসলেম-ভারত' থেকে কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম।"

এটা একটা বেশ চমৎকার মজার ব্যাপার। প্রেসের কবলমুক্ত হবার আগেই তার সমালোচনা আর কবিতার উদ্ধৃতি বেরিয়ে গিয়েছিল বিজলীতে!

কবির 'বিদ্রোহী' নিয়ে তখন দেশে বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে এর স্বপক্ষে-বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করেছিলেন নানাভাবে। কবি গোলাম মোস্তফা সাহেব 'নিয়ন্ত্রিত' এই নামে বিদ্রোহীর ছন্দে একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশ করেছিলেন 'সওগাতে'। 'সাধনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা পরে 'বিদ্রোহী' ও 'নিয়ন্ত্রিত' এই দুটি কবিতা পাশাপাশি ছেপেছিল। 'ইসলাম-দর্শন' নামক একটি মাসিক পত্রিকায়ও 'বিদ্রোহীর' প্রতিবাদে অনুরূপ একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এ দুটো কবিতাই ছিল 'বিদ্রোহী'র অক্ষম প্রতিবাদ।

মরহুম ইসমাইল হোসেন শিরাজী সাহেব ছিলেন অত্যন্ত উদার প্রকৃতির লোক। তিনি এক সময় নজরুলকে দশ টাকা অর্থ-সাহায্য পাঠিয়ে লিখেছিলেন: "আমার আর নেই, থাকলে আরও পাঠাতাম।" তিনি সব সময় নজরুলকে সমর্থন করতেন। 'বিদ্রোহী'র অনুকরণে শিরাজী সাহেব একটি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন 'ছোলতান' নামক সাপ্তাহিকে (২৫শে মাঘ, ১৩৩০)। এই কবিতার নাম ছিল—'পরিচয়'। এ কবিতাটি 'বিদ্রোহী'র দ্বারা প্রভাবিত হলেও 'বিদ্রোহী'র

প্রতিবাদ নয়। এতে শিরাজী সাহেব মুসলমান সমাজকে তাঁর অতীতের কথা স্মরণ করে জেগে উঠতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। যথা :

"বল ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আমি বীর মোসলমান,
আল্লাহ্ ভিন্ন মানিনা অন্য আমি চির-নির্ভীক প্রাণ।
আমি মৃত্যুর মাঝে চিরদিন খুঁজি নব জীবনের সন্ধান,
আমি আগুনের হল্কা, ঘূর্ণিত উল্কা খোদা-ই তেজে তেজীয়ান।"
ইত্যাদি।............

শুধু ভাব-সম্পদই নয়। 'বিদ্রোহী' অতি অল্প সময়ে এত জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম কারণ : এর নব প্রবর্তিত ছন্দ। ছান্দসিক কবি আবদুল কাদির বলেন : "বাল্য থেকেই নজরুলের ছন্দ ও সুরের কান প্রখর ছিল। তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নবাবিষ্কৃত 'মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দে' কবিতা লেখেন। এই ছন্দে যে ওজস সৃষ্টি চলে, তা' 'কামাল পাশা' লিখে তিনি প্রমাণ করেন। তাঁর 'বিদ্রোহী' 'সমিল মুক্তক মাত্রাবৃত্ত' ছন্দে রচিত—বাঙলা ভাষায় তিনি এই নব ছন্দের প্রবর্তক।"

'মোসলেম ভারত' প্রকাশকালের একটি স্মরণযোগ্য ঘটনা : ঢাকার নওয়াব পরিবারের কোনও মহিলা একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন, 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশের জন্য। ছবিটি ভারী সুন্দর। ভাবটি এই : উত্তাল-তরংগ বিক্ষুব্ধ জলধি। তাতে একটি নৌকা তর্‌তর্ করে এগিয়ে চলেছে। এই নৌকায় আছে চারটি দাঁড় আর একটি হাল। দাঁড় চারটির মাথায় আরবী হরফে লেখা আছে : আবুবকর ওমর, উসমান ও আলি। (এঁরা চারজন ইসলামের প্রাথমিক যুগের চারজন মহামান্য খলিফা—আর হজরতের 'আসহাব' নামে পরিচিত)। আর হালের মাথায় লেখা আছে হজরত মুহম্মদের নাম। পালের মধ্যে লেখা আছে—শাফায়াৎ।

সম্পাদকমণ্ডলী ছবিটি প্রকাশ করার জন্য মনোনীত করেন।

কিন্তু ছবিটির নিচে কি নাম দেওয়া যায়, এ নিয়ে একটা বেশ সমস্যায় পড়েন। এর জল্পনা-কল্পনার সময় কবি নজরুল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছবিটি নিয়ে পাশে কামরায় চলে গেলেন, আর খানিকক্ষণ পর ছবিটিকে উপলক্ষ্য করে একটি কবিতা লিখে নিয়ে এলেন। এই কবিতাটির নাম—'খেয়া পারের তরণী'। কবিতাটি বাঙলা সাহিত্যের একটি সম্পদ। আর সারা মুসলিম জাহানের সিরতাজ। কবিতাটি এই ঃ

"যাত্রীরা রাত্তিরে হতে এল খেয়া পার,
বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার ?
প্রলয়েরি আহবান ধ্বনিল কে বিষাণে ?
ঝঞ্ঝা ও ঘন দেয়া স্বনিল রে ঈশানে !...

....তমসাবৃতা ঘোরা 'কিয়ামত' রাত্রি,
খেয়াপারে আশা নাই ডুবিল রে যাত্রী—
দমকি দমকি দেয়া হাঁকে কাঁপে দামিনী,
শিঙ্গার হুঙ্কারে থর থর যামিনী !....

....পুণ্য পথের এ যে যাত্রীরা নিস্পাপ,
ধর্ম্মেরি বর্ম্মে সুরক্ষিত দিল্ সাফ !
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতেও
কাণ্ডারী আহমদ তরী ভরা পাথেয় !

আবু বকর, উসমান, উমর, আলি হায়দর,
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর !
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী-মুখে সারিগান—লা শরীক আল্লাহ্ !

'শাফায়াৎ' পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নাত' হতে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল।
শিরেনত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারিগান ও-পারের যাত্রী!

বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হ'ল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়াপার!"

ধূমকেতুর আবির্ভাব

নজরুলের মনে এসেছে তখন সৃষ্টির জোয়ার। তিনি লিখে চলেছেন অবিরাম—অবিশ্রাম। উল্লাসে, আনন্দে। বল্‌গা-হারা ঘোড়ার মতো গতি তাঁর অবাধ। আব তখন তাঁকে ঘিরে এগিয়ে চলেছে তরুণ বাঙলা। তাঁকে অনুসরণ অনুকরণ করতে গিয়ে সবাই যেন ক্ষেপে উঠলো। ধীর প্রবহমান দেশের বুকে যেন জাগলো উন্মত্ত ঝড়ের বিষম মাতামাতি!

মনে হলো: এ সময় যেন সারা দেশের মোড় ঘুরে গেলো। একটা নতুন যুগের সৃষ্টি হলো। নজরুলের হাঃ হাঃ হাঃ হাসির উচ্ছলতা, কাপড় পরার অদ্ভুত ভঙ্গী, লম্বা চুল—উচ্ছৃঙ্খল, অবিন্যস্ত। তাঁর বেপরোয়া চলার গতি-ছন্দের অনুসারী হয়ে পড়লো সবাই।

বাইরে তখন চলছে রাজনৈতিক নেতাদের খেলাফৎ-অসহযোগ আন্দোলন। গান্ধীজী আর আলী-ভায়েরা সৃষ্টি করে চলেছেন তুমুল আলোড়ন। আজাদীর নেশায় পাগল হয়ে উঠেছে সারা দেশের লোক। আর অন্তরে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন নজরুল ইসলাম আর তাঁর ভাব-শিষ্যেরা। সারা দেশ মেতে উঠলো—নেচে উঠলো। জাতির জাগর-আলোর দীপ জ্বালালেন নজরুল ইসলাম।

'নবযুগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে নজরুল তাঁর মনের আগুন ছড়িয়ে যেন আরাম পান না—পান না তৃপ্তি। অবহেলিত উৎপীড়িত লাঞ্ছিত জাতি তাঁর মুখের পানে চেয়ে আছে। এটা তিনি অনুভব করছেন। তাই ঘা মেরে এদের জাগাবার

সংকল্প নিয়েছেন নজরুল। ব্রত নিয়েছেন। নিজের হাতে কাগজ না থাকলে তো স্বাধীনভাবে কথা বলা যায় না। দুঃসাহসী, লা-পরোয়া নজরুল স্থির করলেন, 'ধূমকেতু' নামে একখানি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করবেন। কপর্দকশূন্য রিক্ত নিঃসম্বল হলেও তিনি তাঁর ইচ্ছাকে রূপ দিলেন। ১৯২২ সালের ১১ই আগষ্ট তারিখে (বাং ১৩২৯) 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হলো বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী নিয়ে। তা এই ঃ

"আয় চলে আয় রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নি-সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গ-শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা,
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।"

'ধূমকেতু' যেদিন প্রকাশিত হলো, কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে দেখেছি সেদিন কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। সারা দেশের মনের কথা টেনে বার করে নজরুল যেন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন কাগজের পাতায় পাতায়, প্রতি ছত্রে।

অল্প সময়ের মধ্যে এমন জনপ্রিয় কবিও দেখা যায়নি, এমন জনপ্রিয় কাগজও। বাঙলা দেশে 'ধূমকেতু'র আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত, স্বল্পায়ু কিন্তু অবিস্মরণীয়। এর অফিস ছিল কলকাতা, মেডিকেল কলেজের পূব দিকে—৭ নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেনে। সেখানে সন্ধ্যার পরে বসতো যত 'লক্ষ্মীছাড়ার আড্ডা'। সেখানে যে কি হতো, আর কি হতো না, তা যাঁরা না দেখেছেন, তাঁদের বলে বোঝানো যাবে না।

ধূমকেতুর ধূমায়িত আস্তানায় সকল লক্ষ্মীছাড়ার মধ্যমণি হয়ে বসেছেন নজরুল। সে-কী উদ্দামতা, সে-কী প্রাণচাঞ্চল্য, সে-কী হাসির উচ্ছ্বসিত

হুল্লোড় ! সে হাসিতে ছাদের কড়িকাঠ বুঝি থর্ থর্ করে কাঁপতো। কাঁপতো দেয়াল, কাঁপতো পাশেব বাড়ীর নিরীহ মানুষগুলোর বুক !

গান গাইছেন নজরুল ঃ

"মোরা সব লক্ষ্মীছাড়ার দল।
মোরা সব লক্ষ্মীছাড়ার দল।"

চলেছে পান-জর্দা আর চা খাওয়ার ছড়াছড়ি। একদিন তো তিনি বন্ধুদের সাথে বাজী ধরে নিজের উচ্ছৃংখলতা আর উদ্দামতা প্রমাণের জন্য মেডিকেল কলেজের কোনো ছাত্রের কাছ থেকে চেয়ে আনলেন একটা মড়ার খুলি। আর খেয়ে ফেললেন তাতে করে চা !

এই আসরে নিয়মিত যেতেন জনাব মঈন-উদ্-দীন হোসায়ন, পবিত্র গাংগুলী, নৃপেন চাটার্জী এবং আরো অনেকে। আমি মাত্র দু-একবার উপস্থিত ছিলাম নীরব দর্শক হিসেবে।

মড়ার খুলিতে করে চা খাওয়ার ঘটনা আমি নিজে দেখিনি। পরিচয় গাঢ় হওয়ার পর কবি আমাকে বলেছেন—স্পষ্ট মনে আছে।

'ধূমকেতু'র আড্ডায় নজরুলকে দেখে মনে হতো, সারা শহরে এই একটি-ই যেন জীবন্ত মানুষ। এমন লা-পরোয়া মানুষ বুঝি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

'ধূমকেতু'র আড্ডা ভেঙ্গে গেলো। একদিন ভেঙ্গে গেলো ধূমকেতুর আস্তানা !

দেশের অবস্থা তখন ভীষণ আর ভয়ংকর। ভারতে ব্রিটিশ সিংহাসন টল-টলায়মান। কিছুদিন থেকে নজরুল 'ধূমকেতু'তে যে অনল উদ্গীরণ করছিলেন, তা কর্তৃপক্ষ সহ্য করতে পারলেন না। কঠোর বজ্র নেমে এলো। নেমে এলো আহত সর্পের উদ্যত ফণা।

রাজরোষে পড়ে নজরুল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী হলেন। 'ধূমকেতু'তে তিনি লিখেছিলেন 'আগমনী'। আগমনী কবিতা। কিন্তু তা 'ধূমকেতু'তে বেরিয়েছিল সম্পাদকীয়রূপে। নজরুল তা-ই

করতেন। অনেক সম্পাদকীয় তিনি ছন্দোবদ্ধ কবিতাতেই লিখতেন। আর সংবাদ-শেষেও দু'এক লাইন কবিতা দিয়ে সংবাদটিকে রসালো করে তুলতেন।

একবারের দু'টি লাইন আমার মনে আছে। তুর্কী বীর গাজী মোস্তফা কামালের এক সংবাদ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন :

"কামাল কামাল মোস্তফা
খুব ঠেঁসে ভাই গোস্ত খা।"

১৩২৯ সালেই (ইং ১৯২২) তাঁর দু'খানা বই প্রকাশিত হয়। একখানা 'অগ্নিবীণা,' আর একখানা 'ব্যথার দান'। অগ্নিবীণা তাঁর জ্বালাময়ী কবিতার বই। 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা, আর বিদ্রোহী, কামাল পাশা, আনোয়ার পাশা প্রমুখ বারোটি কবিতায় বইখানা সম্পূর্ণ। এটি তাঁর নিজের ব্যয়েই তিনি ছাপেন। আর 'ব্যথার দান' প্রকাশ করেন মুসলিম-পাব্‌লিশিং হাউসের মালিক এম, আফজাল্‌-উল্‌-হক্‌ সাহেব। অসুস্থ হয়ে মধুপুরে হাওয়া পরিবর্ত্তন করতে গিয়ে তিনি 'ব্যথার দানে'র স্বত্ব বিক্রয় করেছিলেন।

'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত কবির অগ্নিময়ী প্রবন্ধগুলি পরে 'যুগবাণী' 'দুর্দিনের যাত্রী' প্রভৃতি নাম নিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, আর রাজরোষে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।

এ-সময়ে সাপ্তাহিক 'মুসলিম-জগতের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেব। আমিও এই পত্রিকার সাথে কিছুটা জড়িত। এর সম্পাদক মওলবী আবদুর রশীদ সিদ্দিকী সাহেব তখন ধরা পড়ে হাজত-বাস করছেন।

'অগ্নিবীণা' বের হতেই নজরুল, শামসুদ্দীন সাহেবকে একখানা পাঠিয়েছিলেন সমালোচনার জন্য। সাহিত্য-সমালোচনায় গোড়া থেকেই শামসুদ্দীন সাহেবের বিরাট খ্যাতি। তিনি প্রায় আড়াই কলম ব্যাপী 'অগ্নিবীণা'র যে সুন্দর সমালোচনা করলেন, তা পড়ে

নজরুল সেদিন উৎসাহে আবেগে অধীর হয়ে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন তাঁকে। আমার বেশ মনে পড়ে।

এ-সমালোচনায় কোনো স্তুতিবাদ ছিল না। ছিল না অহেতুক বিরূপতার প্রকাশ। এই সমালোচনায়ই প্রথম তিনি নজরুলকে 'যুগ-প্রবর্তক' কবি বলে ঘোষণা করেন।

নজরুলের বিচার আরম্ভ হলো। মিঃ সুইন্‌হো ছিলেন তখন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। ইংরেজী সাহিত্যের তিনি কিছু কিছু চর্চা করতেন। তাঁরই এজলাসে বিচার।

বিচারের প্রতি তারিখেই আমি দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকতাম। যেদিন নজরুলকে দেয়া হলো ডিফেন্স করার সুযোগ—বলতে বলা হলো তাঁর বক্তব্য, তিনি বাঙলাতে লেখা এক জবানবন্দী নিয়ে হাজির হলেন কোর্টে। এ-জবানবন্দী তিনি হাজতে বসে বসে লিখেছিলেন (ইং ৭-১-১৯২৩)।

নজরুলের উকীল বললেন : "আরে রেখে দিন মশাই আপনার ঐ আবেগময় আর ভাবময় উচ্ছ্বাস। এখানে আইনের কথা হবে। ও-সব কবিত্ব এখানে চলবে না।"

উকীল আইন মতো নিজের কর্তব্য করে গেলেন। নজরুলকে দিয়ে যা বলাবার বলিয়ে নিলেন। এর পর নজরুলের এক বছরের জেল হলো। (ইং ৮-১-১৯২৩)।

জবান-বন্দী পরে 'রাজবন্দীর জবান-বন্দী' নামে ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। ওর মূল কপি নজরুলের মামলায় নথী-ভূক্ত করা হয়েছিল কি-না আজ স্মরণ করতে পারছি না। এই জবান-বন্দীতে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেন যে, তাঁকে অহেতুক 'রাজদ্রোহী' বলে অভিযুক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি রাজদ্রোহী নহেন। তিনি সত্য এবং ন্যায়ের উপাসক। তাঁর বিদ্রোহ অন্যায় এবং অনাচারের বিরুদ্ধে।

নজরুলকে হুগলী জেলে পাঠানো হলো।

এর মধ্যে আমাদের 'মুসলিম-জগতে'র সম্পাদক আবদুর রশীদ সিদ্দিকী সাহেব মুক্তি পেয়ে চলে আসেন। তিনি কোর্টের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

এরপর সিদ্দিকী সাহেব সম্পাদক হিসাবে আর নিজের নাম রাখলেন না। আমাকে সম্পাদনার ভার দিয়ে তিনি আরামের নিঃশ্বাস ছাড়লেন!

কায়কোবাদ-নজরুল সাক্ষাৎকার

উনত্রিশ-এ, আন্তনী বাগান লেনে ছিল 'মুসলিম জগতে'র অফিস। একদিন কবি কায়কোবাদ সাহেব সেই অফিসে গিয়ে উপস্থিত। গিয়েছিলেন তিনি আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাহেবের সাথে দেখা করতে। শামসুদ্দীনকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কলকাতায় গেলেই কায়কোবাদ সাহেব তাঁর সাথে দেখা করতেন।

কুশল প্রশ্নাদির পর বাঙলা সাহিত্যের নানাদিক নিয়ে উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো। কথায় কথায় নজরুলের প্রসঙ্গ এসে পড়লো।

কায়কোবাদ সাহেব বললেন: "কবি নজরুলকে তো আমি দেখিনি, কোথায় থাকেন তিনি?"

শামসুদ্দীন সাহেব বললেন: "এই কাছেই 'ধূমকেতু'র অফিসে— যাবেন সেখানে?"

বৃদ্ধ কবি খুশী হলেন। বললেন: "হ্যাঁ, যাব—চলুন, এখানে আর দেরি করে কাজ নেই, সেখানেই যাওয়া যাক।"

আমি পাশেই বসে এঁদের আলাপ শুনছিলাম। শামসুদ্দীন আমাকেও টেনে নিয়ে চললেন। বললেন: "চল না হে, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তুমি।"

'ধূমকেতু'র অফিসে তখন সান্ধ্য-আসর বেশ জমে উঠেছে। আমরা প্রবেশ করতেই সামনে পেলাম শ্রীশান্তিপদ সিংহকে— 'ধূমকেতু'র ম্যানেজার শান্তিপদ। বয়সে তরুণ। বেশ চটপটে।

তিনি আমাদের নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। ওঁদের আসরে একটু ছেদ পড়লো।

সঙ্গে নতুন লোক দেখে নজরুল উৎসুক চোখে আমাদের দিকে তাকালেন।

শামসুদ্দীন বললেন: "এঁকে চেনেন? ইনি কবি কায়কোবাদ সাহেব।"

নজরুল চীৎকার করে উঠলেন—আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন: "ইনিই মহাকবি কায়কোবাদ সাহেব? অমর কাব্য 'মহা-শ্মশানে'র গ্রন্থকার? আমাদের সকলের গুরু?"

তারপর তিনি পায়ে হাত দিয়ে একান্ত ভক্তিভরে তাঁকে সালাম করলেন।

কায়কোবাদ সাহেব নজরুলকে হাত ধরে টেনে তুললেন। যুবকের বল যেন এলো তাঁর গায়ে। নজরুলকে তিনি গভীরভাবে আলিংগন করলেন। অনেকক্ষণ ধরে উভয়ে আলিংগনাবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর এলো আতিথেয়তার পালা। চা এলো, বিস্কিট এলো। এলো বিরাট এক থালাভরা পান। হাসি-উচ্ছ্বাস আর আনন্দ কলরবে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দরাজ কণ্ঠে নজরুল তাঁর কবিতা আবৃত্তি করলেন কয়েকটি। তারপর দরদ-ভরা কণ্ঠে গাইলেন গান। সে-গানে সেদিন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন কায়কোবাদ সাহেব।

এরপর এই দুই কবির মধ্যে আবার দেখা হয়েছিল। সে ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে'র পঞ্চম অধিবেশনে, কলকাতায় এলবার্ট হলে।

সমস্ত হল লোকে লোকারণ্য। হারমোনিয়ম সামনে নিয়ে বসে আছেন নজরুল ইসলাম। উদ্বোধন-সংগীত গাইবেন তিনি। কবি কায়কোবাদ সাহেবকে মঞ্চের ওপরে আনা হলো। গলায় ফুলের মালা। তিনিই এ-সম্মেলনের মূল সভাপতি। গাড়ী থেকে নামাবার

সময় অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরা এই মালা দিয়ে তাঁকে অ্যভ্যর্থনা করেছেন।

মঞ্চে উঠেই কায়কোবাদ সাহেব নজরুলের দিকে এগিয়ে গেলেন। নজরুল উঠে দাঁড়িয়ে আবার ঝুপ করে বসে পড়লেন। আর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলেন। জনতা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো।

কায়কোবাদ সাহেব নিজের গলার মালা খুলে নজরুলের গলায় পরিয়ে দিলেন। বললেন: "বয়সের দাবীতে এঁরা আমাকে আজ সভাপতি করেছেন। কিন্তু এ সম্মানের প্রকৃত অধিকারী আপনি।"

নজরুল পুনরায় মাথা নত করে বৃদ্ধ কবি কায়কোবাদ সাহেবকে সালাম করলেন।

এরপর সেদিন নজরুলের গান যেন সারা হলে একটা ঝড় বইয়ে দিলো।

দু'বার বৃদ্ধ কবি কায়কোবাদ সাহেবের সাথে নজরুলের সাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের সামনে। দু'বারই নজরুল তাঁর প্রতি যে সৌজন্য, যে ভক্তি, যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন, তা' আমাদের স্মরণীয় হয়ে আছে—মুরুব্বিদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর গুণ শুধু নজরুল কেন, সে যুগের প্রায় সকলের ভেতরেই বর্ত্তমান ছিল।

হুগলী জেলে

ইংরেজী ১৯২৩ সালের ১৩ই মে। রাত্রি ন'টা। হ্যাঁ, রাত্রি তখন ন'টাই হবে। হুগলী জেল-গেটে আমার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি লিখে নেয়া হলো। তারপর জেল-ওয়ার্ডার আর জমাদারের তত্ত্বাবধানে এগারো নম্বর কামরার সামনে এসে দাঁড়ালাম। 'মুসলিম-জগতে' 'বিদ্রোহ' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশের জন্য আমার ছয় মাস জেল হয়েছে। তখন বছর কুড়ি বয়স হবে আমার। মুহূর্তে সারা কামরায় যেন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো—"আরে, ইদিকে—ইদিকে—এই জানালার ধারে আসুন, নতুন একজন বন্দী এসেছেন।"

লজ্জায় আমি লাল হয়ে উঠলাম। বুক টিপ্ টিপ্ করতে লাগলো। কি ভাবে এঁদের সাথে প্রথম আলাপ শুরু করা যায়?

প্রত্যেকটি অপরিচিত মুখ। আলাপের সূত্র খুঁজতে গিয়ে আমি ঘেমে উঠলাম, নেয়ে উঠলাম। বললাম: "কাজী সাহেব,—কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব এই জেলে ছিলেন শুনেছি। তিনি কোথায়?"

আবক্ষ শ্মশ্রু-বিলম্বিত এক ভদ্রলোক জানালার মোটা শিক ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন: "ঐ যে তিনি আসছেন।"

স্তিমিত আলোয় দেখলাম: দু'জন ভদ্রলোকের কাঁধে ভর দিয়ে কাজী সাহেব এসে জানালায় দাঁড়ালেন। জেলে নজরুল ইসলামকে দেখলাম নূতন রূপে। দেখে দুঃখ হলো। তাঁর চোখে এক সময় দেখেছি প্রতিভার দীপ্তি। বুকে দেখেছি অসীম সাহস। উদ্দামতা চঞ্চলতার চরম দেখেছি তাঁর ভেতরে। আর দেখেছি লা-পরোয়া

অনিয়ম-উচ্ছৃংখলতা। তাঁর ছাদফাটানো হাসি দেখে মনে হয়েছে, একজন বলিষ্ঠ লোক—একজন জীবন্ত মানুষ।

আজ হুগলী জেলের এগারো নম্বর কামরার সামনে দাঁড়িয়ে আমি কি সেই কবিকে দেখছি ?—'বিদ্রোহী'র বিদ্রোহী কবিকে ?—না, এ তাঁর কংকাল ?

বললাম ঃ "ভাই, আপনার কি অসুখ করেছে ?"

উত্তরে কবি কিছুই বললেন না। এমনি দুর্বল তিনি।

কিন্তু তবু বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছেন আমার আগমনবার্তা শুনে। সামনেই দাড়ি-বিলম্বিত যে-ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, উত্তর দিলেন তিনি। বললেন ঃ "আপনি শোনেননি ? রাজবন্দীদের ওপর অহেতুক অত্যাচার করায় কবি তার প্রতিবাদে অনশন ব্রত গ্রহণ করেছেন। আজ অনশনের তেইশ দিন।"

প্রায় দেড় মাসকাল হাজত-বাসের পর ছয় মাসের দণ্ডাদেশ নিয়ে আজ সবেমাত্র হুগলী জেলে প্রবেশ করলাম। অতএব কবির অনশন ব্রতের কথা আমি জানতাম না। কারণ হাজতে খবরের কাগজের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

বললাম ঃ "কি করে জানবো বলুন—বহুদিন আমাকে হাজতে কাটাতে হয়েছে কি না !"

এর ভেতরে এগারো নম্বর কামরার বিরাট লৌহতালা খুলে ফেলা হয়েছে। আমি ভেতরে প্রবেশ করতেই তালা আবার বন্ধ হলো। এগিয়ে গিয়ে সবাইকে একে একে আলিংগন করলাম। তারপর কবিকে অতি সাবধানে তাঁর বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো।

আবক্ষ দাড়ি-বিলম্বিত যে ভদ্রলোক এতক্ষণ জানালায় দাঁড়িয়ে আলাপ করছিলেন, পরিচয় পেলাম, তিনি কুষ্টিয়ার ত্যাগীনেতা মওলবী শামসুদ্দীন আহমদ সাহেবের ভাই, মওলবী আফসার উদ্দীন আহমদ।

সেই রাত্রেই আমাকে উপলক্ষ্য করে কবির বিছানার চারপাশ

ঘিরে একটা মজলিস বসলো। তখন আমার বাচ্চা বয়স হলেও 'মুসলিম-জগতে'র সম্পাদক হিসাবে আমি জেলে গিয়েছি শুনে সকলেই যেন বেশ শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলেন।

কবির সাথে বাইরে আমার কয়েকবার দেখা হলেও আলাপ তেমন নিবিড় ছিল না। তাই তিনিও দেখলাম, খুব সংযতভাবেই আলাপ করতে লাগলেন। যদিও আমি তাঁর কাছে এটা আশা করিনি। অনেক কথা—অনেক আলাপ-আলোচনা হলো, অনেক রাত্রি পর্যন্ত।

শেষে জেলের বর্তমান অবস্থা সংক্ষেপে আমাকে কবি বুঝিয়ে দিলেন। বললেন: "এই জেলের বর্তমান সুপার মিঃ থার্সটন। রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে তিনি ভালো ব্যবহার করেন না। বাধ্য হয়ে বন্দীদেরকেও জেল-আইন ভঙ্গ করতে হচ্ছে। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের ওপর অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করায় বাধ্য হয়ে আমাকে অনশন ব্রত গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রতিদিন সকলের ওপর রকমারি শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে। জেলের নিয়ম-শৃংখলা মেনে চললে অবিশ্যি আপনি জেল-জীবন নির্বিবাদে কাটিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু এঁদের সাথে জেলের শৃংখলা ভঙ্গ করলেই আপনাকেও শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকবে হবে। যে-কোনো রকমের শাস্তি।"

এরপর সে-রাত্রে এ-সম্পর্কে আর কোনো কথা হয়নি। আমি শুধু বলেছিলাম: "আমার স্বদেশবাসী ভাইদের ওপর আমার সহানুভূতি থাকবে না, এটা তো হতে পারে না। তবে নতুন এলাম....।"

এ-কথায় সবাই হর্ষপুলকিত হয়ে উঠেছিলেন। হ্যাঁ, কবি আর আফসার উদ্দীন সাহেবকে সেই রাত্রেই আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতে অনুরোধ করেছিলাম।

পরদিন সকাল সাতটা। জেলগেটে ঢং করে একটা ঘণ্টা বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সারা জেলখানা যেন স্তব্ধ হয়ে গেলো।

সপারিষদ জেল-সুপার আসছেন অনুগ্রহ করে বন্দীদেরকে দর্শন দিতে, আর কারো কোনো অভাব-অভিযোগ থাকলে তা শুনতে।

লাল সুরকি-ঢালা সুন্দর রাস্তা। তার দুই পাশে সাধারণ কয়েদীরা লাইন ধরে বসে আছে। সামনে তাদের ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে মাজা লোহার থালা ও বাটি। এর একটা ভাত খাওয়ার জন্য, আর একটা পানি খাওয়ার। এর পরিচ্ছন্নতা দেখেন সুপার। দেখে কিছু কিছু 'মার্কা' দেন। তার ফলে দু'এক দিনের শাস্তি মাফ পাওয়া যায়। অথবা জেলের অন্য কোনো সুবিধা পাওয়া যায়। প্রত্যেকেরই কার্ড আছে, তাতে লেখা হয় সব কিছু।

জেলের বিরাট লৌহ-কপাট ঝন্‌ঝন্ করে খুলে গেলো। ভিতরে প্রবেশ করলেন সুপার। সঙ্গে তাঁর জেলার, ডেপুটি জেলার, ডাক্তার, সিপাহী, জমাদার।

শাহী কায়দায় এগিয়ে আসছেন সুপার। কালো পাগড়িধারী একজন বন্দী-প্রহরী (convicted warder) চীৎকার করে উঠলো : "হুঁশিয়ার হো যাও—সরকার—সালাম—আজবর (as you were)।"

কালো পাগড়িধারী বন্দী-প্রহরী হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী। এরা আনুগত্য দেখিয়ে ও জেলকর্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন হয়ে প্রমোশন পায়। আর জেল-সিপাহীর মর্যাদা লাভ করে। আবার কোনো সামান্য ত্রুটির জন্য কেউ কেউ সাধারণ কয়েদীদের স্তরেও নেমে যায়। দু'একদিন জেলের মেয়াদও বেড়ে যায় কারো কারো।

সাধারণ কয়েদী যারা এতক্ষণ লাইন দিয়ে বসেছিল, কালো-পাগড়ির ঐ কথাগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লো—সালাম করলো—আবার যেমন ভাবে বসেছিল, তেমনি বসে পড়লো।

এটা হলো জেলের প্রাথমিক শৃংখলা। এ শৃংখলা রাজনৈতিক বন্দীরা কেউ মানেন না। এগারো নম্বর কামরার সামনে এসেও কালো-পাগড়ি ঐ কথাগুলিই উচ্চারণ করলো। কিন্তু এগারো

নম্বর কামরার রাজবন্দীদের ভেতরে কোনো চাঞ্চল্যই দেখা গেলো না। সবাই নির্বিকারচিত্তে যাঁর যাঁর বিছানায় চুপ করে বসে রইলেন। কেউ কেউ আবার পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে নাচাতে লাগলেন। কাজী সাহেব তাঁর বিছানায় চুপ করে শুয়েছিলেন।

অপমানে সুপার সাহেবের মুখ লাল হয়ে উঠলো। যাঁরা বিছানায় বসে পা নাচাচ্ছিলেন, তাঁদের দু'একজনের শাস্তির ব্যবস্থা হলো— সাধারণ শাস্তি। তিন দিন এঁদের ভাত দেয়া হবে না। তার পরিবর্তে দেয়া হবে মাড়ভাত (penal diet)। তাতে ডাল, তরকারি, লবণ কিছুই দেয়া হবে না। কতকগুলো চালের গুঁড়ো পাতলা করে রেঁধে হাজির করা হবে ওঁদের সামনে।

শাস্তির সংবাদ শুনে বন্দীমহল গর্জন করে উঠলো—মেঘ-গর্জন : "গান্ধী মহারাজ কী জয়।"

প্রথম দিনের অবস্থা দেখে দ্বিতীয় দিন থেকে আমি এঁদের সাথে ভিড়ে পড়লাম—নিবিড়ভাবে। এরপর নজরুলের প্রীতি ও ভালবাসায় আমার সমগ্র সত্তা আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। তাঁর যে স্নেহ, যে ভালোবাসা পেলাম, তা' আমার জীবনে আজ অক্ষয় সম্পদ হয়ে আছে।

হুগলী কংগ্রেস-কমিটির সেক্রেটারীর সাথে রাজবন্দীরা যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। কোনো জেল-ওয়ার্ডার কর্তৃপক্ষের সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে রাজবন্দীদের বিশ্বাস অর্জন করেছিল। অবশ্য পয়সার বিনিময়ে। গভীর রাত্রে যখন সে ডিউটি দিতে আসতো, তখনই চিঠিপত্র দেয়া-নেয়া চলতো।

একদিন খবর পাওয়া গেলো : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে নজরুলের অনশনের সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছেন। আর আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের ঠিকানায় নজরুলকে টেলিগ্রাম করেছেন : Give up hunger strike, our literature claims you" (অনশন ত্যাগ কর, আমাদের সাহিত্য দাবি করছে তোমাকে।)

এই টেলিগ্রাম সেণ্ট্রাল জেলের কর্তৃপক্ষ হুগলী জেলে কবিকে

পাঠানো প্রয়োজন বোধ করেন নি। ঐ টেলিগ্রাম সরাসরি কবিগুরুর কাছে ফেরত পাঠানো হয়। তাতে লেখা ছিল: "Addressee not found" (প্রাপককে পাওয়া গেল না।) কবিগুরুর টেলিগ্রামের সংবাদ আমরা কাগজের কাটিং থেকে পেয়েছিলাম, আর সবাই খুশী হয়ে উঠেছিলাম। নজরুল ইসলামের চোখে মুখেও ফুটে উঠেছিল আনন্দের দীপ্তি।

হুগলী জেলের ব্যাপার নিয়ে যে বাইরে একটা আন্দোলন হচ্ছে, তার ছিটেফোঁটা আমাদের কানে আসছিল মাঝে মাঝে। একদিন সংবাদ এলো: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে কলকাতার কলেজ-স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভা হয়েছে। তাতে দেশের জনসাধারণের পক্ষ থেকে অনশন ভঙ্গ করার জন্য কাজী সাহেবকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই সংবাদ বহন করে একজন প্রতিনিধি হুগলী জেলে যাবেন—অবশ্য গভর্ণমেণ্টের অনুমতি নিয়ে। আর কাজী সাহেবের সাথে দেখা করবেন।

আমরা এই আগন্তুকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কয়েক দিন পর একদিন দুপুর বেলা ডাক্তার আবদুল্লাহ-আল-মামুন সুহরওয়ার্দী সাহেব এলেন। তিনি ছিলেন বে-সরকারী জেল-পরিদর্শক।

দেশবাসীর সনির্বন্ধ অনুরোধ বহন করে নিয়ে গেছেন ডাঃ সুহ্‌র-ওয়ার্দীর মতো লোক। এতে লক্ষণীয় ছিল দুটো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রথমতঃ তিনি সারা দেশের প্রতিনিধি হয়ে সকলের অনুরোধ বহন করে এনেছেন। দ্বিতীয়তঃ সে সময় ডাঃ সুহরওয়াদীর মতো পণ্ডিত লোক সারা ভারতে খুব বেশী সংখ্যক ছিল না।

প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। অনেক তর্ক-বিতর্ক হলো। অনেক অনুরোধ-উপরোধ হলো। কিন্তু কবি নিজের সংকল্পে রইলেন অটল-অচল। তিনি অনশন ভঙ্গ করলেন না।

সেই সময় আমাদের সাথে হুগলী জেলে ছিলেন কুষ্টিয়ার মওলবী আফসার উদ্দীন আহমদ, নেপালী-নেতা সর্দার দল বাহাদুর সিং,

বরিশালের ত্যাগী কর্মী সতীন্দ্রনাথ সেন, মেদিনীপুর গড়বেতার পণ্ডিত রামসুন্দর সিং, পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী এবং আরো অনেকে। (পরে শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ও এসে জুটেছিলেন।) বিচলিত হয়ে আমরাও অনশন ব্রত ভঙ্গ করতে কবিকে অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি আমাদের অনুরোধও অগ্রাহ্য করলেন। সুহরওয়ার্দী সাহেবের সাথে সুর মিলিয়ে সবাই অনুরোধ জানালাম, কিন্তু কবি কিছুতেই নিজের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হলেন না।

আমরা যুক্তি দেখালাম: হুগলী জেলের রাজবন্দীদের সাথে সুপার যে দুর্ব্যবহার করছেন, তা সুহরওয়ার্দী সাহেব গবর্ণমেন্টের গোচরে আনবেন। আর প্রতিকার ব্যবস্থা করবেন বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আর এ জন্য কবির মতো একজন প্রতিভাশালী লোকের দেহপাত করা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হবে। উৎসুক দেশবাসীর মুখের দিকে চেয়ে কবির অনশন ভঙ্গ করা উচিত।

কবি আমাদের কারো কথাই শুনলেন না।

এরপর কবির মাতা জাহেদা খাতুন চুরুলিয়া থেকে হুগলী জেলগেটে গেলেন কবিকে অনুরোধ করার জন্য। কবি তাঁর সাথে দেখা করলেন না।

হতাশ হয়ে ভগ্ন-মনোরথ হয়ে মা সেদিন ফিরে গিয়েছিলেন। এরপর আর মাতা-পুত্রে সাক্ষাৎ হয়নি।

১৩৩৫ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯২৮) কবির মাতা জাহেদা খাতুনের মৃত্যু হয়।

হুগলী জেলের গা ঘেঁষে চলে নৈহাটি-বণ্ডেল রেলওয়ে লাইন। এই রেললাইন গঙ্গার সেতুর সাথে সমতা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক উঁচুতে পাতা হয়েছে। জেলের কামরায় বসে বসেই রেল চলাচল দেখা যায়।

একদিন—হ্যাঁ, এগারোটা কি বারোটাই হবে তখন। হাঁপাতে হাঁপাতে মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী মহাশয় এসে খবর দিলেন:

রেললাইনের ধারে উঁচু পাঁচিলের ওপর বসে কবির প্রিয়বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার আর পবিত্র গাঙ্গুলী কবিকে ডাকছেন।

আমরা তখন এগারো নম্বর কামরায় কবির পাশে বসে গল্প করছিলাম। হুড়মুড় করে অন্যান্যেরা বেরিয়ে পড়লো এই অপরূপ দৃশ্য দেখতে। কবির সাথে দেখা করবে, তা রেলপ্রাচীরের ওপরে কেন?

আমার এবং আর একজন স্বেচ্ছাসেবকের কাঁধে ভর দিয়ে কবি ঐ দিকে এগিয়ে চললেন। খানিক দূর গিয়েছিলেন—কিন্তু বেশী দূর এগুতে পারলেন না। বসে পড়লেন। এমনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

বাতাস ছিল উজান। ওরা চেঁচিয়ে কি বললেন কিছুই শোনা গেলো না। দেখা গেলো: হাতজোড় করলেন, ইশারা করলেন অনশন ভাঙ্গতে। কাকস্য পরিবেদনা। কবি হাতজোড় করে ওদের কাছে মাফ চাইলেন।

এরই মধ্যে সারা জেলে তখন হৈ-চৈ পড়ে গেছে। জেলার সাহেব কয়েকজন সান্ত্রী নিয়ে সেখানে হাজির হলেন।

একজন কোথা থেকে রটিয়ে দিলো: ওঁরা কী যেন একটা বাণ্ডিল ফেলেছে জেলের ভেতরে। প্রহরারত সিপাহী এ কথা অস্বীকার করলো, কয়েদী-প্রহরীও। কিন্তু জেলার এদের কারো কথাই বিশ্বাস করলেন না। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আমাদের বিছানা-পত্র ইত্যাদি উলটে পালটে সার্চ করা হলো—আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া গেলো না।

এরপর শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী, কবির রাঙাদা, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জননী, কবির স্ত্রী প্রমীলা নজরুলের কাকীমাও গিয়েছিলেন একদিন কবিকে অনশন ব্রত ভঙ্গ করাবার জন্য।

সেদিন ছিল কবির অনশনের উনচল্লিশ দিন। এই দিন অনশন ভঙ্গ করলেন কবি। কিন্তু বলার সুবিধার জন্য চল্লিশ দিন অনশন ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হলো।

এগারো নম্বর কামরার সামনে একফালি ফাঁকা মাঠ। সেখানে নানা জাতের ফুলের চারা রোপন করে একটা চমৎকার বাগানে সৃষ্টি করা হয়েছে।

সারামাঠ ভরে নরম নরম কচি দুর্বা ঘাস। মাঠের চারদিকে লাল সুরকি-ঢালা পথ। সকাল হতেই আমরা কয়েকজন সেখানে পায়চারি করে বেড়াতাম।

বিকেল চারটের সময় কবিকে ঘিরে দুর্বা-গালিচার ওপর বসতো আমাদের আসর। সেখানে আলোচনা হতো রাজনীতি—আলোচনা হতো সাহিত্য। কবির কবিতা আবৃত্তি হতো—গান হতো। এক একদিন মজলিস এমন জমে উঠতো যে, ছ'টা বেজে গেছে, জেল জমাদার আর ওয়ার্ডাররা এসে তাগিদ দিচ্ছে কামরায় বন্ধ হওয়ার জন্য, সে কথায় কেউ আমলই দিতো না। চুপ করে শুধু গানই শুনতো সবাই।

একদিন সন্ধ্যার আগে কবি গাইছিলেন একটি ভজন। তার সুর, তার তান, তার লয় চারিদিকের আবহাওয়াকে এমন মাধুর্যরসে সিক্ত করে তুলেছে, এমন মাতাল করে তুলেছে সবাইকে যে কেউ আর আসন ছেড়ে উঠতেই পারছে না। হিন্দুস্থানী সিপাহী-জমাদাররা পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে। মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে সকলে। তাদের কর্তব্য তারা ভুলে গেছে।

শেষে কোয়ার্টার ছেড়ে জেলার এসে জমাদারকে ধমক দিতেই সবার চৈতন্য ফিরে এলো। জেলার অনেক অনুরোধ-উপরোধ করে সেদিন আমাদের কামরায় বন্ধ করিয়েছিলেন। তখন রাত্রি আটটা বেজে গিয়েছিল। পরে জমাদারকে এ জন্য যথেষ্ট কৈফিয়ত দিয়ে অব্যাহিত পেতে হয়েছিল।

ঐ মাঠে বসে আমাদের যে শুধু কাব্য, রাজনীতি আর সাহিত্য-চর্চাই হতো তা নয়। জেল-আইন ভঙ্গ করার নতুন নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার করা হতো।

শাস্তি গ্রহণ করতে করতে বন্দীরা কাবু হবে কি, শাস্তি দিতে দিতে জেল সুপারই শেষ পর্যন্ত কাবু হয়ে পড়েছিলেন। ইদানীং শুধুমাত্র বসে থাকলেই আর সুপার কাউকে শাস্তি দিতেন না। কিন্তু শাস্তি না পাওয়ায় বন্দীরা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কবিকে ধরা হলো— আপনি গান লিখে দিন। 'সুপার' এলেই সকলে একযোগে সেই গান গাইবেন।

কাগজ পাওয়া যায় কোথায়? আমার কাছে একখানা 'সাম্যবাদী পত্রিকা' ছিল। ওটা পাঠাতেন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব আমাকে বাইরে থেকে। দেখা গেল, তার প্রথম পৃষ্ঠায় খানিকটা বেশ খালি জায়গা আছে। তাতেই কবি লিখলেন রবীন্দ্রনাথের "তোমারই গেহে, পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে" এই বিখ্যাত গানের একটা প্যারডি। যথা:

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধন্য ধন্য হে,
আমার এ গান তোমারি ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে॥
রেখেছ সান্ত্রী পাহারা দোরে,
আঁধার-কক্ষে জামাই আদরে!
বেঁধেছ শিকল প্রণয়-ডোরে,
তুমি ধন্য ধন্য হে॥
আঁকাড়া চালের অন্ন লবণ
করেছে আমার রসনা-লোভন
বুড়ো ডাঁটা-ঘাঁটা লাপসী শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে॥ —ইত্যাদি।

এই গান পেয়ে সেদিন আমাদের মধ্যে যে যৌবন-জোয়ার আর উচ্ছ্বাস জেগেছিল, তা আজ আমি ভাষায় রূপ দিতে পারছি না।

পরদিন সকালে সুপার এলে গানটি সমারোহ করে গাওয়া হলো। সেদিন যেন সাহেব একেবারে ক্ষেপে গেলেন। রাগে রাঙামুখ তাঁর এমনি রাঙা হয়ে উঠলো যেন মনে হলো, এক্ষুণি বোধহয় তাঁর গালের চামড়া ফেটে দর দর করে রক্ত গড়িয়ে পড়বে। কবি সম্মুখে গিয়ে উন্মাদের মতো চীৎকার করে বললেন : "ইউ ড্যাম ফুল,—সোয়াইন।" বীর সেনানীর মতো দাঁড়িয়ে কবিও ঐ কথাগুলোই আবার তাঁকে ফিরিয়ে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হলো আমাদের সবাইকে সেলে বন্দী করবার। পূর্বকৃত তথাকথিত অপরাধের জন্ম আগেই আমদের পায়ে ছিল ডাণ্ডা-বেড়ী। ঝম্ ঝম্ করে তাই বাজিয়ে আমরা চললাম সেলের দিকে। কবি শুয়ে পড়েছিলেন তাঁর বিছানায়। তাঁকে ওয়ার্ডাররা পাঁজা-কোল করে সেলে নিয়ে বন্ধ করে দিলো। সকালে এক ঘণ্টা আর বিকালে এক ঘণ্টা বাইরে ছেড়ে দেওয়া হতো, বাদবাকী সময় নির্জন সেলের এক এক কামরায় সবাইকে বন্দী থাকতে হতো।

জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীদের কোনো কাজ করতে হতো না। সুপারের সাথে ঝগড়া করে—শাস্তি গ্রহণ করে, আর বাগানে বসে বসে জটলা পাকিয়ে আমাদের সময় কাটতো।

একদিনকার একটি সামান্য ঘটনায় আমাদের ওপর সাধারণ কয়েদীরা বিরূপ হয়ে উঠলো। এই ঘটনার আগে সাধারণ কয়েদীরা আমাদেরকে ফেরেশতার মতো শ্রদ্ধা করতো, ভক্তি করতো।

আমাদের ওপর তাদের ভক্তির আধিক্য এত গভীর ছিল যে—তাদের অনেকেরই ধারণা ছিল : রাজবন্দীরা যে-পথ দিয়ে চলে, সেই পথের ধূলো গায়ে মাখলে অসুখ সেরে যায়। কিন্তু কেন যে হঠাৎ তারা সেদিন বিরূপ হয়ে উঠেছিল, তা ভাবতে গিয়ে আজও আমি অবাক হয়ে যাই।

আমাদের কার্যকলাপে জেল-কর্তৃপক্ষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। যে-কোনো মূল্যে তাঁরা আমাদের একতা, আমাদের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে চুরমার

করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলেন। আজকের ঘটনায় তাঁদের পরোক্ষ কোনো ইঙ্গিত ছিল কি না তা' আমার জানা নেই। তবে সন্দেহ হয়। নতুবা এমন সাহস সাধারণ কয়েদীদের ভেতর এলো কি করে? যে ক্ষুদ্র এবং হাস্যাস্পদ কারণে তারা রাজবন্দীদের কাজের প্রতিবাদ করলো—তা শুনে পাঠকও হয়তো হেসে উঠবেন।

বরিশালের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক একদিন বিকালে কবির একটি গান গাইছিলেন। গানটি এই:

"কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট
রক্ত জমাট, শিকল পূজার পাষাণ বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান! বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ।
ধ্বংস-নিশান, উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি!
গাজনের বাজনা বাজা! কে মালিক? কে সে রাজা?
কে দেয় সাজা, মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি, ভগবান পরবে ফাঁসি?
সর্বনাশী শিখায় এ-হীন তথ্য কে রে!
ওরে ও পাগলা ভোলা, দেরে দে প্রলয়-দোলা,
গারদগুলা, জোরসে ধরে হেঁচকা টানে;
মার হাঁক হায়দরী হাঁক, কাঁধে নে দুন্দুভি-ঢাক
ডাক ওরে ডাক, মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে।
নাচে ঐ কাল-বোশেখী, কাটাবি কাল বসে কি?
দেরে দেখি, ভীম-কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি।
লাথি মার ভাঙরে তালা! যত সব বন্দী-শালায়,
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি।"

এতে আছে: "লাথি মার ভাঙরে তালা, যত সব বন্দী-শালায়"—ইত্যাদি। সাধারণ কয়েদীদের রাগ হলো: স্বেচ্ছাসেবকেরা তাদের

"বন্দী-শালা" (শ্যালক) বলে গাল দিয়েছেন। প্রথমে ব্যাপারটা আমাদের বোধগম্য হয়নি। কিন্তু সন্ধ্যা ছ'টার সময় সমস্ত সাধারণ বন্দী তাদের ওয়ার্ডের সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়েই রইলো। দৃঢ়ভাবে তারা বললে: এর প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেউ কামরায় প্রবেশ করবে না। প্রত্যেকের মুখে-চোখে একটা বিদ্রোহের ভাব যেন ফুটে বেরুচ্ছে। আমরা নির্দিষ্ট সময়ে যার যার সেলে গিয়ে বন্ধ হয়েছিলাম। পরে শুনলাম: স্বয়ং জেলার কতিপয় সঙ্গীনধারী ওয়ার্ডারসহ ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাপারটা আগাগোড়া শোনেন। তারপর আমাদের ভিতর থেকে মুরুব্বী শ্রেণীর মওঃ আফসার উদ্দীন আহমদ এবং পণ্ডিত সামধ্যায়ীকে নিয়ে গিয়ে তাদের গানের মানে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। বন্দীশালা মানে যে বন্দী শ্যালক নয়, বন্দীখানা বা বন্দীআলয়— এই কথাটি তাদের বোঝাতে সেদিন পাক্কা আধঘণ্টা সময় ব্যয় হয়েছিল।

এরপর সাধারণ-কয়েদীদের সাথে আমাদের আর কোনো বিরোধ বাধেনি।

আমার জেল-জীবনের মধ্যে দু'টি আকর্ষণের জিনিস ছিল। এক কবি নজরুল ইসলাম, আর ছিল একটি বুলবুল্ পাখী।

বাগানের ধারে ছোট একটা ফুলগাছের ঝোপে একটা বুলবুল্ পাখী বাসা বেঁধে ডিম পেড়েছে। সেই বাসাটি হঠাৎ একদিন কবিই আবিষ্কার করেন আর আমাকে দেখান। কিছুদিন যেতে দেখা গেলো ডিম ফুটে তাতে দু'টি ছানা বেরিয়েছে। এই ছানাটি বড় হলে নিয়ে এসে পুষতে হবে, এই ছিল আমাদের ইচ্ছা। কবির সাথে পরামর্শ করে রোজ সকাল-সন্ধ্যায় ছানা দু'টির খোঁজ করতাম আমি। কিন্তু ছানা দু'টির লোভ সারা জেলখানা ভরে সবাকার মনেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সাধারণ কয়েদীর পক্ষে নিজ নিজ সীমানা ছেড়ে আসার উপায় ছিল না। ফলে ছানা দু'টো যে যথাসময়ে আমাদের হাতেই পড়বে, এ-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন

সকাল বেলা সেল থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়ে দেখলাম, বাসা শূন্য। ঝগড়া, চীৎকার, দাপাদাপি। আমার অবস্থা দেখে কবির বোধহয় দুঃখ হলো। তিনি ব্যাপারটা জেলারকে জানালেন। অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীরাও কবিকে সমর্থন করলেন।

বহু অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হলো: ধোবীখানার চার্জে যে সাধারণ কয়েদীটি আছে, কাল সন্ধ্যায় কাজী সাহেবের ধোয়া কাপড় দিতে এসে সেই-ই নিয়ে গেছে ছানা দু'টি।

তাকে খবর দিতেই কাঁপতে কাঁপতে সে ছানা দু'টি নিয়ে হাজির হলো জেল-অফিসে। কবি-ই এর মীমাংসা করে দিলেন। একটা ওকে ফিরিয়ে দিলেন, আর একটা দিলেন আমাকে।

সেই দিন থেকে আমার অতিরিক্ত একটা কাজ বাড়লো। ছানাটিকে নাওয়ানো আর খাওয়ানো। সারা জেলখানা ঘুরে ঘুরে ফড়িং আর পোকা খুঁজে বেড়াতাম ছানাটিকে খাওয়াবার জন্য।

অল্প দিনের মধ্যেই ছানাটির সুন্দর পালক গজালো। বাঁ হাতের তর্জনী আঙুলের ওপর ওকে বসিয়ে সারা জেলখানা ঘুরে বেড়াতাম। (সব জায়গায় যাবার আমাদের ছিল অবাধ অধিকার)। ওটা এমনি পোষ মেনে গিয়েছিল, কোনো দিনই পালাবার চেষ্টা করতো না। মাঝে মাঝে বেল গাছের উঁচু ডালের ওপরে গিয়ে বসতো। আবার শিস দিলেই উড়ে এসে বসতো আমার আঙুলের ওপর।

আমার একটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, আমি ফাঁসি-কাষ্ঠের ওপর বসে বসে আমার সকালের নাশ্‌তা—লপ্‌সী খেতাম। বুল্‌বুল্‌টি এ-সময় আমার খাবার বাসনের ধারে বসে লপ্‌সীর ওপর ঠোকর মারতো। আমার এই বুল্‌বুল্‌-প্রীতি দেখে জেলার একদিন বলেছিলেন: "একটা খাঁচা তৈরী করিয়ে দেবো ওটা পুষ্‌বার জন্য?—সাধারণ কয়েদীদের ভেতর ভালো কারিগর আছে।"

তাঁর এই সদিচ্ছার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম: "না,

তার দরকার হবে না। কারণ নিজেরাই বন্দী—ওকে আর খাঁচায় বন্ধ করে পাপ কামাতে চাই না।"

ওকে প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে এমনি বন্দী করেছিলাম যে, এক মুহূর্তও এই বনের পাখী আমাকে ছেড়ে থাকতে পারতো না। জেলখানায় আমাদের ওপর যে-সকল অন্যায় হতো, এই নিরীহ প্রাণীটি যেন তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারতো। আমরা যখন "শিকল পরার গান" গাইতাম, ও তখন লৌহ-দরওয়াজার ওপর বসে একান্ত নিবিষ্টচিত্তে শুনতো। পাশের 'সেল' থেকে ভেসে আসতো গান :

"ওদের আঁখি যতোই রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে
ও-ভাই মোদের আঁখি ফুটবে।
ওদের বাঁধন যতোই শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে
ও-ভাই মোদের বাঁধন টুটবে।।"

গানের প্রতিটি শব্দ যেন ও বুঝ্‌তো আর মাথা নেড়ে সায় দিতো। একদিন একটি ছেলে গাইছিলো :

"বিধির বিধান ভাঙ্‌বে তুমি, এমনি শক্তিমান
তুমি কি, এমনি শক্তিমান।
মোদের ভাঙা-গড়া তোমার হাতে, এতোই অভিমান
তোমার কি, এমনি অভিমান—।"

হঠাৎ দেখি, আমার সাধের বুলবুলি ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে ঐ ছেলেটির দরওয়াজায় গিয়ে বসেছে।

সবার মনে এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, ও বোধহয় কোনো পোকা বা ফড়িংয়ের খোঁজে ওখানে গিয়েছিল। কিন্তু আজও আমার বিশ্বাস, ছেলেটির গানই ওকে ওখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। নতুবা

আমাকে ছেড়ে ও অনর্থক উড়ে চলে গেছে, এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি।

রাজবন্দীদের কোনো মতেই কাবু করতে না পেরে জেল-কর্তৃপক্ষ স্থির করেছিলেন এঁদের বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দিয়ে সকলকে দলছাড়া করে দেবেন। এতে হয়তো গোলযোগের অবসান ঘটতে পারে। তাই কিছুদিন পর I. G. of Prisons থেকে অর্ডার গেলো: কবিকে আর হুগলী জেলে রাখা হবে না—বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দেয়া হবে। তাঁদের এই ধারণায় গলদ ছিল। কবিকে ওখান থেকে সরিয়ে দেবার পরও গোলযোগের অবসান হয়নি। আমরা সেদিন অত্যন্ত দুঃখের সাথে কবিকে বিদায় দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি চলে যাবার পরও হুগলী জেলে গোলযোগ ছিল। কারণ তিনি যে-বীজ বপন করে গিয়েছিলেন, তা তখন বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছিল। এ-গোলযোগের মীমাংসা করতে হুগলীর জেল-কর্তৃপক্ষকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। জেলে কোর্ট বসিয়ে অনেকের মেয়াদ দীর্ঘদিন বাড়িয়ে দিতে হয়েছিল।

কবিকে জেলখানায় দেখেছি অসীম শক্তিশালী বলীয়ান পুরুষরূপে। তিনি তাঁর কবিতায় বলেছেন!

` "মোর একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতূর্য।"

এই-ই যেন তাঁর সত্যিকার রূপ। জেলে এত বিরোধ, এত ঝগড়া, এত গোলমাল সত্ত্বেও কবির ওপর ছিল সবারই অসীম শ্রদ্ধা। যিনি একবার মাত্র তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তিনি মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। নিজের অধিকার, নিজের সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এমন দৃঢ়তা আর কুত্রাপি দেখা যায় নি।

এখানে উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, হুগলী জেলে থাকতেই কবির 'দোলনচাঁপা' বই কলকাতায় ছাপা হচ্ছিল। ওর উৎসর্গ পৃষ্ঠাটি কবি জেল থেকে লিখে পাঠিয়ে দেন শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর নামেই বইখানা উৎসর্গ করা হয়েছিল।

আমার বুল্‌বুলের কি হয়েছিল? সে এক মর্মন্তুদ কাহিনী। কবি বহরমপুর চলে যাবার পর আমাকে দেয়া হয় এক কঠিন শাস্তি— নির্জন কারাবাস (Solitary confinement)। এতে চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর একবারও বাইরে বেরুবার হুকুম নেই। কারো সাথে আলাপ—দেখাশুনা পর্যন্ত করতে পারবে না বন্দী। সেলের দরওয়াজা থাকে সব সময় সম্পূর্ণ বন্ধ। শুধু একটি ছোট ফোঁকর দিয়ে মাঝে মাঝে ওয়ার্ডার বন্দীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। এ এক কঠিন শাস্তি। শোনা গেছে, এরূপ নির্জনতা সহ্য করতে না পেরে অনেক বন্দী নাকি এর আগে পাগল হয়ে গেছে!

এ সময় বুল্‌বুল্‌-ই ছিল আমার একমাত্র সঙ্গী। সারাদিন তার সাথেই কথা বলতাম আমি। তার সাথেই গল্প করতাম।

একদিন বুল্‌বুল্‌টি আহারের খোঁজে বেল গাছের উচুঁ ডালে গিয়ে বসেছিল। এমন সময় এলো ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি! সে কী বৃষ্টি! কান পাতা যায় না তার আওয়াজে। আমি ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলাম—শিস দিতে লাগলাম ওকে ফিরে আসার জন্য। ও ওখান থেকেই চিড়িক্‌ চিড়িক্‌ করে আমার শিসের জওয়াব দিতে লাগলো, কিন্তু ফিরে এলো না। পরে তার কোনো আওয়াজই আর শুনতে পেলাম না। একান্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেল-জীবনের কয়েক দিন কাটালাম। এর মধ্যে একজন ওয়ার্ডারকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম এগারো নম্বর কামরায়।

যে-দিন আমি সেল থেকে বেরিয়ে এলাম, সেদিন রাজবন্দী সবার কাছেই অনুযোগ করলাম। বললাম: "আপনারাও কি বুলবুলটিকে ডেকে নিজের কাছে রাখতে পারলেন না?"

মওঃ আফসার উদ্দীন আহমদ সাহেব বললেন: "প্রথম আমরা জানতেই পারিনি, যে বুলবুল তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। ওয়ার্ডারের কাছে খবর পেয়ে খোঁজ করছিলাম, কিন্তু ওর কোনো পাত্তা পাইনি। বোধহয় বৃষ্টির পানিতে ভিজে ওর পাখা ভারী হয়ে গিয়েছিল। তাই

আর তোমার কাছে ফিরে যেতে পারেনি। আর আমরা ডাকলেই কি আর আমাদের কাছে আসতো? ওটা যে ন্যাওটা হয়েছিল তোমার।"

এই বুলবুল আমার মনে যে ছাপ ফেলে গেছে, কবি নজরুলের মনেও বোধহয় তেমনি ছাপ ফেলেছিল। তাই তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের 'বুলবুল' নামকরণ করে সে-স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হায়! সে বুলবুলও আজ উড়ে গেছে।

নজরুলের বিবাহ

নজরুল ইসলাম মানুষের কাছে একটা ছুর্ভেদ্য রহস্য। যাঁরা তাঁর সাথে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁদের কেউ-ই এ-কথা অহংকার করে বলতে পারবেন না—"আমি তাঁর সম্বন্ধে সব কিছুই জানি।" যদি কেউ বলেন, তিনি ভুল বলবেন। "আমার কৈফিয়ত" নামে কবির যে কবিতাটি আছে, তাতে তিনি আমাদের এই মতের কিছুটা প্রতিধ্বনি করেছেন।

যে সময়টুকু তিনি সাহিত্যের আসর থেকে অনুপস্থিত, সেই সময়টুকুতে তাঁর সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলছেন। কিন্তু এই রহস্যময় মানুষটির সম্বন্ধে কেউই সঠিক কিছু বলতে পারছেন না। এক ভদ্রলোক বলেছেন: তিনি নাকি ছেলেবেলায় "হুকো-কলকেয় তামাক খেতেন।" কথাটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য লেগেছে।

চা আর পান তিনি প্রচুর পরিমাণে খেয়েছেন। জর্দা আর কিমামের খুব করে পিণ্ডি চট্‌কিয়েছেন, কিন্তু তামাক-বিড়ি-সিগারেটের ধার দিয়েও তিনি যাননি, কোনো প্রকার মাদকদ্রব্য তিনি কোনোদিন স্পর্শ করেননি। লজ্জায় অন্যকে আড়াল করে লুকিয়ে খাবেন, এমন ছেলে তো নজরুল নন!

মানুষের দোষ নেই। তাঁর রহস্যপুরীর ভেতরে তিনি অতি যত্নে কি কথা লুকিয়ে রেখেছেন, সে-কথা কারুর কাছে তিনি প্রকাশ করেননি। যখন তিনি সুস্থ ছিলেন, তখন তিনি লাফিয়েছেন, দৌড়িয়েছেন, নেচেছেন, আকাশফাটা চীৎকারে প্রাণ-খোলা আর

দিল-খোলা হাসি হেসেছেন। কিন্তু তাঁর ভেতরকার আসল রহস্যের সন্ধান তিনি কাউকে দেননি।

তাঁর লেখার ভেতর দিয়ে যদি তিনি কোনো দুর্বল মুহূর্তে কোনো কিছু প্রকাশ করে থাকেন, তা ভবিষ্যতের গবেষকরা বেছে বার করবেন। আমরা তাঁর আস্‌হাব—যাঁরা তাঁর সাথে মিশবার কিছু কিছু সুযোগ পেয়েছি, তাঁর সম্বন্ধে যা জানি, তারই মালা গেঁথে যাওয়া হবে আমাদের কাজ। কল্পনা করে তাঁর সম্বন্ধে কোনো কিছু বলা হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

'হুগলী জেলে' শীর্ষক নিবন্ধে পূর্বে আমি অনেকগুলি তথ্য পরিবেশন করেছি। জেল হতে বের হবার পর যা ঘটলো—

১৯২৩ সালের ১৪ই নভেম্বর। বেরিয়ে এলাম আমি হুগলী পাষাণকারার ভেতর থেকে। এসে আবার যোগ দিলাম 'মুসলিম-জগতে'। নজরুল ইসলাম তখন বহরমপুর জেলে। দু'একটা ছোটখাটো সংবাদ তাঁর সম্বন্ধে কানে এসে পৌঁছতো। সেখানে তিনি খোশ-মেজাজে বহাল তবিয়তেই আছেন। হুগলী জেলের মতো বিশৃঙ্খল আবহাওয়া সেখানে ছিল না। অতএব উৎকণ্ঠার কোনো কারণও আমার ছিল না।

একদিন কাগজে বের হলো: তিনি জেল থেকে মুক্ত হয়েছেন। (১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৩) আমরা প্রতীক্ষা করছিলাম—ছিলাম অধীর প্রতীক্ষায়। তাঁকে হৈ হৈ করে ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসবো—এলবার্ট হলে সভা ডেকে বহু পোশাকী বক্তৃতা করে স্তুতি-গান করবো, সত্য-মিথ্যা বিশেষণে তাঁকে বিশেষিত করে বাঙলা দেশকে তাক লাগিয়ে দেবো। কত কল্পনা-জল্পনা মাথার ভেতরে গিসগিস করছে।

'মুসলিম-জগতে'র তৎকালীন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সাথে এ-আলোচনায় কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি। কিন্তু কোথায় নজরুল? বহরমপুর জেলে নজরুল নেই—সারা কলকাতায় নজরুল নেই—হুগলীতে নজরুল নেই। কোথায় তিনি? তাঁর অগণিত

ভক্তবৃন্দকে একেবারে পথে বসিয়ে তিনি সরে পড়েছেন কুমিল্লার এক নিভৃত পল্লীতে।

দুঃখ হলো, রাগ হলো, অভিমান হলো। কিন্তু সে রাগ-অভিমান কতক্ষণ? এই বেপরোয়া লোকটির চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, আমরা তো কোন ছার, কেউ তাঁর ওপর রাগ করে থাকতে পারেন না।

উত্তেজনার মুহূর্ত কেটে যাবার পর আমাদের মনও পরিষ্কার হয়ে গেলো।

এরপর বেশ কিছুদিন তাঁর কোনো খবর পাওয়া গেলো না। একদিন হুগলী থেকে মিসেস এম, রহমান আমাকে একখানা চিঠি লিখলেন। মিসেস এম, রহমান ছিলেন হুগলীর সরকারী উকিল খানবাহাদুর মজ্‌হারুল আন্‌ওয়ার চৌধুরী সাহেবের কন্যা। 'চানাচুর' (প্রবন্ধ) 'মা ও মেয়ে' নামক উপন্যাসের লেখিকা। নজরুলকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। নজরুলের সাথে আমাদের দলের সবাই তাঁকে 'মা' বলে ডাকতাম।

চিঠিতে তিনি আদেশ করেছেন: "একখানা বাড়ী দেখে দিতে হবে। ছোটখাটো একখানা বাড়ী—কয়েক দিনের জন্য। সেখানে তাঁর এক আত্মীয়ের বিয়ে হবে।"

আমাকে তিনি তাঁর মনের খাঁটি কথাটি লেখেননি। ফলে আমি সরল বিশ্বাসে বহু ঘুরে খোঁজ করে তাঁকে কয়েকখানা বড় বড় বাড়ীর সন্ধান দিলাম। একটাও তাঁর পছন্দ হলো না।

কয়েক দিন পর। একদিন তিনি তাঁর কলকাতার বাসায় জরুরী খবর দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। গেলাম। বললেন: "নজরুলের বিয়ে। আর এর আয়োজন খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। পেছনে ঢের শত্রু। বেশী হৈ-চৈ করো না।"

বিয়ের আয়োজন আর কি! মিঞা বিবি রাজী আছেন—গহনা পত্র, কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়ার কোন হাঙ্গাম নেই। অতএব আমাদের বিশেষ কিছু করবার ছিল না। সামান্য টুকিটাকি যে

আয়োজন করতে হবে, তা মিসেস এম, রহমান একাই করতে পারবেন।

বাসায় এসে ভাবলাম: আমাদের একটা কিছু করা দরকার। বেশী লোককে জানানো চলবে না—অথচ কিছু করতে হবে। সেদিন ছিল বুধবার। আগামী শুক্কুর বারেই বিয়ে। এই অল্প সময়ে কি করা যায়?

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি সাহেব কথিকা লিখতে ওস্তাদ। তিনি কথিকার ভাষায় একটি অভিনন্দন লিখলেন। ডবল ক্রাউন একটায়-আটটা সাইজ, হলদে কাগজে লাল কালিতে অভিবন্দনা ছাপা হলো। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ আর আমি তাতে স্বাক্ষর করলাম।

৬নং হাজী লেনে বাসা নেয়া হয়েছিল। অভিবন্দনার কাগজগুলো নিয়ে অতি সন্তর্পণে ২৫শে এপ্রিল ১৯২৪ শুক্রবার (বাং ১২ই বৈশাখ ১৩৩১, ২০শে রমজান ১৩৪২ হিঃ) বেলা আড়াইটায় অর্থাৎ বাদ্ জুম্‌আ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম সবাই আমাদের প্রতীক্ষায় সেখানে বসে আছেন। সবাই আর কে? আমাদের বিখ্যাত সাহিত্যিক-বন্ধু, নূর লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী মওলবী মঈন-উদ্-দীন হোসায়ন সাহেব আর মিঃ আবদুস সালাম নামে কুমিল্লার এক ভদ্রলোক। ইনি মিসেস এম, রহমানের বিশেষ পরিচিত। আবুল কালাম শামসুদ্দীন আর আবুল মনসুর আহমদ বিশেষ কাজে আটকে যাওয়ায় যেতে পারেননি। আমি ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি মাত্র গিয়েছিলাম।

আধুনিক যুগে হিন্দু-মুসমলানে বিবাহ এই প্রথম। মুসলমান এবং হিন্দু উভয় পক্ষ থেকেই প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে, তাই এত সতর্কতা! কবির অন্যান্য হিন্দু এবং মুসলমান বন্ধুরা যে এ-বিবাহের কথা জানতেন না, এমন নয়। তবে সঠিক তারিখটি সবার কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। কাজেই যথাসময়ে অতিভক্তদের কেউ উপস্থিত থাকতে পারেননি।

মওলবী মঈন-উদ্-দীন হোসায়ন সাহেবকে "কাজী" মনোনীত করা হলো। আবতুস সালাম সাহেব উকীল নিযুক্ত হলেন, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি সাহেব ও আমি সাক্ষী হলাম।

বিয়ের আগে কথা উঠেছিল: কোন্ মতে বিয়ে হবে? হিন্দু মতে হতে পারে না। এক হতে পারে সিভিল-ম্যারেজ। আর হতে পারে মুসলমানী মতে। সিভিল-ম্যারেজ আইন অনুযায়ী বর-কনে উভয়কে এক স্বীকৃতি এই বলে দিতে হয় যে—"আমি কোনো ধর্ম মানি না"। কবি এতে প্রবল আপত্তি জানালেন। বললেন: "আমি মুসলমান—মুসলমানী রক্ত আমার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে, এ-আমি অস্বীকার করতে পারবো না।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কোনো কোটিপতি মাড়োয়ারী ভদ্রলোক নাকি তাঁকে লক্ষ টাকার বিনিময়ে আর্যধর্ম গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কবি তাতে রাজী হননি।

যাক। অনেক আলাপ-আলোচনায় স্থির হয়েছিল, মুসলমানী মতেই বিয়ে হবে।

আমরা গিয়ে বললাম: "কনেকে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করতে বলা হোক।" কবি এতে রাজী হলেন না। বললেন: "কারুর কোনো ধর্মমত সম্বন্ধে আমার কোনো জোর নেই। ইচ্ছে করে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে, পরেও করতে পারবেন।"

ইতিহাসের বহু নজীর তিনি উপস্থিত করলেন। কবির মত মেনে নিয়ে আমাদের পক্ষ থেকে যুক্তি দেয়া হলো: 'আহ্‌লে কেতাব'দিগের সঙ্গে স্ব-স্ব ধর্ম বজায় রেখে বিয়ে হওয়া মুসলমানী আইন মতে অসিদ্ধ নয়। এখন কথা হচ্ছে এই যে, হিন্দুগণ 'আহ্‌লে কেতাব' কি না। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন বলে মুসলমানীরা বিশ্বাস করেন। এই সকল পয়গম্বর যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষেও

পয়গম্বরের আবির্ভাব অসম্ভব নয়। অতএব এ-বিয়ে হওয়া সম্ভবতঃ আইনমতে অন্যায় হবে না।

আমাদের মনোনীত "কাজী" সাহেব অর্থাৎ বিয়ে-পড়ানোর কাজী মওলবী মঈন-উদ্-দীন হোসায়ন সাহেবের আদেশে আমি, ওয়াজেদ আলি সাহেব ও আবদুস সালাম অন্দর-মহলে ঢুকে পড়লাম।

কনে শ্রীমতী আশালতা সেনগুপ্তা লম্বা ঘোমটা দিয়ে বসেছিলেন। মিসেস এম, রহমান ও কনের মা শ্রদ্ধেয়া গিরিবালা সেনগুপ্তা একটু আড়ালে বসেছিলেন। মুসলমানী কায়দা অনুযায়ী উকীল জনাব আবদুস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন: "বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রাম নিবাসী মরহুম জনাব কাজী ফকির আহমদ সাহেবের পুত্র কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব আপনাকে ১০০০্ টাকা দেনমোহরের এওজে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। তার অর্ধেক মওয়াজ্জেল তার অর্ধেক মায়াজ্জেল। আপনি তাকে শওহরীয়তে কবুল করতে রাজী আছেন?

কনে নিশ্চুপ।

কথাটি আবার তাঁকে ফিরে বলা হলো। এবারও কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

মুসলমানদের বিয়েতে সাক্ষী ও উকীলকে এরূপ সমস্যায় পড়তে হয়, এ আমি জানতাম। কারণ যে-কন্যা টপ করে 'কবুল' বলে ফেলেন, তিনি নাকি সবচেয়ে বেহায়া। বর্ষীয়সী মেয়েদের এরূপ ধারণা। অনেকক্ষেত্রে তাঁরা কনেকে অনবরত চিমটি কাটতে থাকেন, আর কনেকে 'কবুল' বলতে যে খুব দেরি করতে হবে, এরূপ ইঙ্গিত করতে থাকেন। পর্দার আড়ালে যে সব কনেকে বসানো হয়, তাঁদের বেলায়ই এরূপ করা হয়।

কিন্তু এখানে কনেকে আমাদের সামনেই বসানো হয়েছিল। ওরূপ ইঙ্গিত করার কারো কোনো উপায় ছিল না। এখানে কনে চুপ করে আছেন—কবুল বলতে অযথা দেরি করছেন। ব্যাপার কি? বিশেষ করে উভয়ের সানন্দ সম্মতিক্রমে স্ব স্ব সমাজের সাথে বিদ্রোহ

ঘোষণা করে যেখানে বিয়ে হচ্ছে, সেখানে স্বীকারোক্তি পেতে দেরি হওয়া তো উচিত নয়।

আমার কেমন সন্দেহ হলো। বললাম: "কথাগুলো সহজ সরল বাঙলা ভাষায় বলুন। হয়তো কনের পক্ষে মুসলমানী শব্দগুলো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে।"

উকীল মুসলমানী শব্দগুলোকে বাঙলায় রূপান্তরিত করলেন। শেষে বললেন: "আপনি কি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবকে স্বামীত্বে বরণ করতে স্বীকৃত?"

এবার কনে ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিলেন: "হাঁ, স্বীকৃত।"

তিনবার এরূপ স্বীকৃতি আদায় করে সগর্বে আমরা বাইরের ঘরে চলে এলাম। নজরুল ইসলামের কাছ থেকেও "অমুকের" কন্যা "অমুক বলে স্বীকৃতি আদায় করে 'কাজী' সাহেব বিবাহকার্য সমাধা করলেন।

তারপর তিনি আরবী ভাষায় খুৎবা পাঠ করলেন। এটা তিনি পকেটে করে নিয়ে এসেছিলেন।

তারপর তাঁদের মঙ্গল কামনা করে মুনাজাত করা হলো। বলা বাহুল্য। আমরা সবাই ওজু করেছিলাম। নজরুল ইসলাম সাহেব সাদা চাদর দিয়ে পাগড়িও বেঁধেছিলেন।

আমরা যে কয়জন এই বিয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম, সবাই আশঙ্কা করেছিলাম: এই বিয়ের সংবাদ প্রচারিত হবামাত্র না জানি কি একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হবে বাঙলা দেশে। একেবারে যে হলো না, এমন নয়। দু'একজন কাগজের মারফত গালাগাল দেবার চেষ্টা করলেন। কনের চাচাতো ভাই শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত (রাঙা দা) 'বৈকালী' কাগজে দু'এক কথায় ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু সে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অধিকাংশ কাগজই এ-বিয়ে সমর্থন করলো। ৪ঠা আষাঢ় ১৩৩১ সালের 'মুসলিম-জগতে' সৈয়দ তাজাম্মুল আলি ও খানবাহাদুর একিন

উদ্দীন আহমদ (দিনাজপুর) সাহেবানের পত্র বের হলো। খানবাহাদুর সাহেব লিখলেন :

"—কবিবর নজরুল ইসলাম সাহেবের শুভপরিণয় সংবাদে যারপরনাই আহ্লাদিত হইলাম। খোদাতালার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এই পরিণয় শুভ হউক।....

"কবি নজরুল ইসলাম মুসলমান থাকিয়া হিন্দুকন্যাকে বিবাহ করিলেও আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে, শিক্ষিতা হিন্দুকন্যা পবিত্রগ্রন্থ কোরাণ শরীফে আস্থাবতী এবং একত্বস্বীকারকারিণী বটেন। সুতরাং মুসলমান ধর্মের সারমর্ম তিনি দৃঢ়রূপে স্বীয় জীবনের মূলমন্ত্র করিতেছেন। তজ্জন্য অন্তরের অন্তস্থল হইতে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি। ভরসা করি, নজরুল ইসলাম ও তাঁহার ধর্মধর্মিণী বঙ্গদেশের চিন্তার ধারা নূতন দিকে প্রবাহিত করিবেন। বিবাহের দায়িত্বপূর্ণ জীবন ধীর গম্ভীর ভাবে স্বদেশ ও সমাজের সেবায় উৎসর্গ করুন। তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা। আমিন।"

বাঙলাদেশে মিসেস এম, রহমান ছিলেন একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। যে-কয়টি লেখা তাঁর বেরিয়েছে, তা' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা আমার এ-উক্তি সমর্থন করবেন। তিনি নজরুল ইসলামের বিবাহের সকল দায়িত্ব নিয়ে যে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা' অভূতপূর্ব। সামাজিক আর পারিবারিক শাসন তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। নজরুল ইসলামের ওপর ছিল তাঁর অগাধ স্নেহ। পর্দার আড়ালে থেকেও তিনি যে সাহস দেখিয়েছেন, এজন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তাঁকে এক পত্র লিখেছিলাম।

৬-১২-১৯২৪ তারিখে তিনি তাঁর উত্তরে লিখেছিলেন : "যক্ষপুরীর জালের বেড়া যত শক্তই হোক তা ভাঙ্গবার শক্তি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন। তা নৈলে নজরুলকে কোলে নিয়ে মুক্তাকাশ তলে দাঁড়াতে পারতাম না।"

মিসেস এম, রহমান নবদম্পতিকে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে ভালোভাবে সংসার পেতে দেবেন, এই ইচ্ছায় তিনি এঁদের হুগলীতে নিয়ে পৃথক বাসা করে দিয়েছিলেন। নজরুল ঐ বাসায় স্বাধীনভাবে বাস করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর শাশুড়ী শ্রদ্ধেয়া গিরিবালা সেনগুপ্তা।

শত হোক, মিসেস এম, রহমান পরের কন্যা—পরের গৃহিণী। তাঁর পক্ষে নজরুলকে সব সময় সাহায্য করা সম্ভব হতো না। বাইরে থেকে তিনি প্রয়োজনের তুলনায় তাঁকে বেশীই সাহায্য করতেন। নজরুল-সংসারে গৃহিণীপনায় তাঁর শাশুড়ীর দান সীমাহীন। স্বীয়-সমাজকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়ে তখন যদি তিনি এই সংসারের ভার না নিতেন, তা হলে নজরুলের উচ্ছৃংখল জীবনের গতি কোন দিকে ফিরে যেতো, তা কেউ বলতে পারে না।

এই দৃঢ়চিত্ত মহিলা স্বহস্তে লাগাম ধরে অস্থিরমনা, লক্ষ্মীছাড়া, আইনঅমানা বিদ্রোহী নজরুলের জীবনকে কিছুটা সুনিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছিলেন।

নজরুলের শাশুড়ীকে আমরা মাসীমা বলে ডাকি। তিনি নিজে সাত্ত্বিক জীবনযাপন করেন। হিন্দু বিধবার কঠোর নিয়ম পালন করেন। অথচ মুসলমান নজরুলের সাংসারিক জীবনের সমস্ত তালই তাঁকে সামলাতে হয়েছে।

নজরুলের স্ত্রী-টি হচ্ছেন শান্তস্বভাবা আর ভদ্র। আজকালকার মেয়েদের সাথে তাঁর তুলনা হয় না। নিজে তিনি শিক্ষিতা বিদুষী। কিন্তু যে-কোনো সহজ অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারিণী গ্রাম্য-মেয়েদের মধ্যে ফেলে দিলে ইনি নির্বিবাদে তাঁদের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। (অন্ততঃ আমার স্ত্রীর তো তাঁর সম্বন্ধে এই ধারণা)। মাসীমার সাহায্য না পেলে এঁর পক্ষে নজরুলের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়তো কঠিন হতো।

হুগলীতে নজরুল বাসা বাঁধলেন। কিন্তু সংসার চলে কি করে?

নজরুলের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন: "বাঙলা দেশ তাঁকে গ্রহণ করলো, স্বীকার করলো। তাঁর বই রাজরোষ এবং প্রজানুরাগ লাভ করে এডিশনের পর এডিশন কাটতে লাগলো। অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করলেন তিনি।"

সত্যিই তাই। তাঁর বইয়ের আয় থেকে, আর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে তাঁর সংসারযাত্রা নির্বাহ হতে লাগলো।

ডি. এম. লাইব্রেরীর শ্রীগোপালদাস মজুমদার হচ্ছেন তাঁর বইয়ের প্রধান প্রকাশক। এই সময় বাঙলাদেশ জানতো ডি. এম. লাইব্রেরী বলতে নজরুল ইসলামকে, আর নজরুল ইসলাম বলতে ডি. এম. লাইব্রেরীকে। বই থেকে নজরুল প্রচুর টাকা পেতেন। কিন্তু তাতে অভাব তাঁর মিটতো না। তবু সুপরিচালিত হওয়ায় এই অভাবের সংসারও তাঁর স্বচ্ছন্দভাবে চলতো।

নজরুল ইসলাম যৌবনের কবি, তরুণ্যের কবি। বাঙলার তরুণ দল একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল তাঁর লেখা পড়ে। নিজের সত্তা, নিজের অস্তিত্ব গিয়েছিলাম আমরা একদম ভুলে। যে কোনো দুঃসাহসিক কাজ বোধহয় তাঁর জন্য আমরা করতে পারতাম। প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার তাঁকে না দেখলে মন থাকতো চঞ্চল। হুগলী হয়েছিল যেন আমার তীর্থস্থান। প্রতি সপ্তাহে একবার যেতাম হুগলীতে। মাসীমার সে কি আদর-আপ্যায়ন! তাঁর হাতের নারকুল-চিংড়ি রান্নার স্বাদ এখনো আমি ভুলতে পারিনি।

বাইরের বিরুদ্ধ সমালোচনা, কাগজের বাদ-প্রতিবাদ, তাঁর শাশুড়ীর প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ, দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি উপেক্ষা করে নজরুলের দাম্পত্যজীবনও মধুর ভাবেই কাটতে লাগলো।

কিছুদিন পর। হঠাৎ একদিন মিসেস এম, রহমানের পত্র পেয়ে হুগলী গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম: নজরুলের বৈঠকখানা ঘর

অনেক নিমন্ত্রিতের কলহাস্যে মুখরিত। তার মধ্যে দীনেশরঞ্জন দাশ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার প্রমুখ 'কল্লোলে'র দলবল, আর মঈন-উদ্-দীন হোসায়ন, ডাঃ লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি এবং আরো দু'একজন মুসলমান সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

ইতিমধ্যে কাজী সাহেবের একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আজ তার আকিকা-উৎসব। এই সঙ্গে বিয়ে বাবত বন্ধুদের যে খাওয়াটা নজরুলের কাছে পাওনা ছিল, তাও শোধ দেওয়া হবে।

ছাতের ওপর খাওয়ার স্থান করা হয়েছিল। পোলাও, গোশ্‌ত, দৈ, চাটনি—আয়োজনের কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু কে কত খাবে? যৌবনের জোয়ারে সবাই ডগমগ। খাওয়া যত হলো, ফেলা হলো তার চেয়ে অনেক বেশী। হৈ-হুল্লোড়, চেঁচামেচি, দাপাদাপি। খাবার থালা হাতে নিয়ে সে কী ধেই-ধেই নৃত্য! গোশ্‌তের টুকরো ছিঁড়ে খেয়ে হাড়গুলো ছুঁড়ে মারছে এ-ওর গায়ে। এ-বাড়ীর চীৎকার শুনে পাড়ার লোকে বোধহয় সেদিন ভেবেছিল, কাজী সাহেবের বাড়ীতে বুঝি ডাকাত পড়েছে!

হুগলীতে নজরুল ইসলাম

১৩৩১ বাঙলা সাল। হুগলী শহরে আমাদের প্রিয় কবি নজরুল ইসলাম সুখের নীড় বেঁধে নির্বিবাদে সংসার আর সাহিত্য-চর্চা করতে লাগলেন। সেখানে তাঁর প্রথম সন্তান আজাদ কামাল ভূমিষ্ঠ হলো। আকিকা-উৎসব মহা আড়ম্বরে হয়ে গেলো। কত সাধ, কত আমোদ-আহ্লাদ করে আকিকা-উৎসব সম্পন্ন করে এলাম। হঠাৎ একদিন মিসেস এম. রহমান সাহেবার পত্রে জানতে পারলাম: সেই আজাদ কামাল নেই! এত সেবা-যত্ন, বন্ধু-বান্ধবের এত স্নেহময় আশীর্বাদ উপেক্ষা করে সে মারা গেছে। এ-সংবাদ একান্ত আকস্মিক কঠোর বজ্রের মতো আমার কাছে নেমে এলো। কিন্তু কি করা—সবই আল্লার হাত।

আমার কিন্তু হুগলী যাওয়ার বিরাম নেই। একটুখানি সময় পেলে বা মন একটু বিচলিত হলেই হুগলী ছুটি। কবির একটুখানি সান্নিধ্য লাভের জন্য মন হাহাকার করে ওঠে। এক সপ্তাহের বেশী সময় তাঁর অদর্শন আমার পক্ষে তখন একান্ত অসহ্য।

তাঁকে কলকাতায় থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারলে হুগলী যাওয়ার এই যিল্লতি আমাকে সহ্য করতে হতো না। কিন্তু কলকাতার মতো খরচবহুল স্থানে তাঁর মতো বে-হিসেবী লোকের থাকার ব্যবস্থা করা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়!

হুগলীতে থাকার খরচ কলকাতার চেয়ে অনেক কম। বই থেকে, লেখা থেকে সামান্য কিছু, আর মিসেস এম, রহমান সাহেবার সাময়িক

সাহায্য ছাড়া আয়ের অন্য কোনো পথ নেই। স্ত্রী, শাশুড়ী এবং তাঁর অনুগৃহীত দলের পেছনে খরচের কমতি নেই। জনবহুল, খরচবহুল কলকাতায় এলে এই খরচের পরিমাণ বাড়বে বৈ কমবে না।

আমাদের মতো যাঁরা তাঁর উগ্র ভক্তের দল, তাঁদের আর্থিক অবস্থা এমন স্বচ্ছল নয় যে, এক অন্তরের শ্রেষ্ঠ ভক্তি-নিবেদন ছাড়া তাঁকে কোনো প্রকার আর্থিক সাহায্য কেউ করতে পারে। অতএব তাঁর দৈন্য শুধু দেখেই যেতাম। প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থাই করতে পারতাম না।

নজরুল ইসলামের জোরালো কলম বাঙলাদেশের যুবকচিত্তে এক মহাপ্লাবন এনে দিয়েছিল। এই প্লাবনের ফলে তারা ভুলে গিয়েছিল পিতামাতার কঠোর শাসন, উপেক্ষা করে চলতো তারা আত্মীয়-স্বজনের কুটিল ভ্রূকুটি, সমাজের বিধিনিষেধের বিরাট প্রাচীর উলঙ্ঘন করে তারা চলতো নিজের খুশীমতো পথে। নজরুলই তাদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন সত্য, নজরুলের নামে তারা পাগল। মানুষ মানুষকে যে এমন ভালবাসতে পারে, সেই সময়ে আমরা তা একান্তভাবে প্রত্যক্ষ করেছি।

এই প্লাবনে ভেসে যাওয়ার আশংকায় রক্ষণশীলেরা আতংকে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। আর যুবক-বাঙলা হয়ে উঠেছিল আনন্দে উদ্বেল। এ-সময় যে-কোনো অস্বাভাবিক কাজকেই তারা গৌরবের এবং শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করতো। সবার মনেই যেন একটা 'ডোণ্ট কেয়ার' ভাব। নতুবা সে-সময় একদিন যে-অবস্থায় হুগলী গিয়ে পৌঁছেছিলাম, আজ সে-কথা ভাবতে গিয়ে লজ্জা হয়।

রমজান মাস। আমি রোজা ছিলাম। বেলা তখন প্রায় এগারোটা। দুপুরের অবসর কি করে কাটানো যায়, ভাবতে ভাবতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। মুসলমানপাড়া লেনে—'সত্যাগ্রহী' অফিসে থাকি। এক পা, দু'পা করে শেয়ালদা'র মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। হকারের কাছ থেকে একখানা মাসিক নিয়ে তার পাতা ওল্টাচ্ছি,

এমন সময় বন্ধু বাহার এসে উপস্থিত। আমাদের হাবিবুল্লাহ বাহার। ট্রামে কোথায় যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখে নেমে পড়েছেন। বললেন: "কেমন আছ? কি করছ?"

আনন্দে জড়িয়ে ধরে বললাম: "এই আছি কোনো রকম। এই একখানা কাগজ নিতে এসেছিলাম। তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

ওঁর ঠোঁটের আগায় এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেলো। বলল: "উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোথাও একটা আড্ডা জমাতে হবে—কোথায় যাওয়া যায়, বল দেখি?"

বললাম: "রোজার দিন—এই দুপুরে রোদের সময় কোথায় আর যাবে? চল, আমার বাসায়ই যাওয়া যাক—নিকটেই আমার বাসা। মন খুলে সেখানে আড্ডা দেওয়া যাবে। বেশ খানিকক্ষণ গল্প করা যাবে।"

বাহার ঈষৎ মাথা নাড়লে। বলল: "তাই হোক।"

বেশ দু'কদম এগিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ বাহার থমকে দাঁড়াল।

বলল: "ইদানীং কাজী সাহেবের কোনো খবর পেয়েছ? কেমন আছেন তিনি?"

বললাম: "কোনো খবরই পাইনি। এ-সপ্তাহে তাঁর কাছে আমার যাওয়াও হয়নি।"

বাহার উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল: "তা হলে চল না, আজ তাঁর সাথেই দেখা করে আসি। কলকাতায় তো তাঁকে ধরা যায় না। এ-পর্যন্ত আমার আলাপ-ই হয়নি তাঁর সাথে। হুগলীতে বেশ নিরালা পাওয়া যাবে তাঁকে। আমার প্রথম আলাপটা ওখানে হলেই ভালো হয়।"

'বুড়ী! তুই ওপার যাবি?—না, আমি তো সেই জন্যেই বসে আছি।' নজরুলের ওখানে যেতে হবে কি না, এ-কথা কি আমাকে জিজ্ঞেস করতে হয়? আমি তো পা বাড়িয়েই আছি! চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলাম: "ঠিক বলেছ দোস্ত তুমি, চোস্ত কথা, আয় দেখি তোর হস্ত চুমি।"

নজরুলের কথা দিয়েই ওঁর কথার উত্তর দিলাম। বললাম: "চমৎকার বলেছো বন্ধু। দেখতো কটা বেজেছে? হুগলী যাওয়ার ট্রেন ক'টায়?"

শেয়ালদা' ষ্টেশনের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি: এর পরেই যে গাড়ীখানা নৈহাটি ষ্টেশনে ধরবে, তা ছাড়তে মাত্র মিনিট দশেক বাকী।

বললাম: "যাবো তো ঠিক। তবে একটুখানি চল, বাসা থেকে কাপড় বদলে আসি।"

আমার পরনে ছিল একটা কম দামের লুঙ্গি, খালি গায়ের ওপর একখানা খদ্দরের সাদা চাদর, আর পায়ে ছেঁড়া স্যাণ্ডেল।

বেশ পরিবর্তন করতে হলে এই ট্রেন আমাদের হারাতে হয়। বাহার বলল: "কাপড় ছেড়ে আর কি হবে? চল, এমনিভাবে গিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দেবো।"

বললাম: "তবে তাই চল। অবশ্য আমরা ফর্মালিটির ধার ধারি না। তবে তুমি তো সেখানে নতুন যাচ্ছো হে! পকেটে পয়সা-কড়ি কিছু আছে? কিছু মিষ্টি আর ফল নিয়ে যেতে পারলে ভালো হতো।"

দু'জনার ট্যাক খুঁজে যে পরিমাণ পয়সা জড় হলো, তাতে ফল ইত্যাদি কিনেও টায়ে টায়ে যাতায়াতের ভাড়াটা চলতে পারে। তখন আর কথা কি!

দৌড়ে আমরা স্টেশনের প্লাটফর্মে প্রবেশ করলাম। গাড়ী তখন প্রায় চলতি পথে।

পেছনে পড়ে রইলো আমাদের উচ্ছৃঙ্খল-জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ কলকাতা নগরী। আমরা ছুটে চললাম সামনের দিকে—যেখানে রয়েছে আমাদের জাগ্রত যৌবনের নিশানবরদার, সত্য এবং সুন্দরের মূর্তিমান প্রতীক।

হুগলী পৌঁছে কবিকে আমরা বাড়ীতেই পেলাম। তিনি বৈঠকখানায় বসে এইমাত্র একটা কবিতা শেষ করে উঠলেন। আমাদের পেয়ে সে কী বিরাট লাফ! আর ছাদ-ফাটা হাসি!!

বাহারের সাথে তাঁর পরিচয়-পর্ব শেষ করে দিতেই তিনি তাঁর সন্ত লেখা কবিতাটি পড়ে শোনালেন। মনে আছে, কবিতাটির নাম "চৈতি-হাওয়া।

কবিতার বিষয়বস্তু আর অদ্ভুত পড়ার ভঙ্গি আমাদেরকে মুগ্ধ করলো—বিশেষ করে, তার একটা লাইন তো এখনো আমার মনের পাতায় জ্বল্ জ্বল করছে। সে লাইনটি হচ্ছে :

"দুপুর বেলায় চবুতরায় ডাকছে কবুতর।"

ভাব-সম্পদে লাইনটি হয়তো খুব সমৃদ্ধ নয়। তবু সেদিনের আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধিটুকু এখানে চিহ্নিত করে রাখলাম।

একটু পরেই একদল ছেলে এলো। এরা হুগলীরই ছেলে। টাউন হলে বিরাট সভা। অনেক বড় বড় লোক সেখানে আসবেন, নজরুলকে সেখানে যেতে হবে। ওরা তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে।

আমাদের দু'জনকেও নজরুল সেই সভায় নিয়ে গেলেন। পোশাকের স্বল্পতার জন্য আমি যেতে ইতস্ততঃ করছিলাম। ঘাড় ধরে নজরুল আমাকে সামনে ঠেলে দিলেন। বললেন : "চল, ওতে কি হবে?—মোরা সব লক্ষ্মীছাড়ার দল, মোরা সব লক্ষ্মীছাড়ার দল!"

তিনি নিজেও আর পোশাক পরিবর্তন করলেন না। ধুতি, নিমা আর একটা রঙিন চাদর দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

নজরুল যাবে শুনে সারা শহর যেন সেখানে ভেঙ্গে পড়েছিল। অগণিত মানুষের ভেতর দিয়ে পথ কেটে কবিকে সভাপতির আসনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও তাঁর কাছে গিয়ে বসলাম। অগণিত মানুষের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমাদের ওপর নিবদ্ধ। আমরা দুটি অপরিচিত—অখ্যাত ব্যক্তি কি করে ওখানে স্থান পেলাম, এই-ই বোধহয় তারা অবাক হয়ে দেখছিল।

নজরুলের মনের ভাব বোধহয় এই ছিল : "তোমরা হাজারো বড়লোক হও না কেন, এই দরিদ্র বেশেই আমরা মহীয়ান। আমরা তোমাদের থোড়াই 'কেয়ার' করি।"

হুগলীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ নাগরিকেরা সভা জাঁকিয়ে বসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেক রায়বাহাদুর, খানবাহাদুরও ছিলেন। অমন একটা অভিজাত মজলিসে সাহস করে বসেছিলাম বটে, আমার পোশাকের দৈন্যের জন্য মনে মনে সংকোচও বোধ করছিলাম। কিন্তু দুর্জয় আত্মচেতনার বলে সে সংকোচ কাটিয়ে সবার সম্মুখে অকুণ্ঠিতচিত্তে বসেছিলাম। একটি ছোকরা পেছন থেকে টিপ্পনী কাটলো "কবির উপযুক্ত শিষ্যই বটে।"

হাসির ধমকে কবি আবহাওয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিলেন। সে কি হাসি! কড়ি-বরগা যেন থর্থর্ করে কাঁপতে লাগলো।

সভার কাজ শেষ হলো সন্ধ্যার একটু আগে। জানতাম: আমরা যদি সন্ধ্যার এই ট্রেন ধরতে না পারি, তা হলে কবির ওখানে আমাদের পাত পাততে হবে। দু'জনার এক বেলার আহারের ভারও তাঁর ওপর জুলুম। যতই লক্ষ্মীছাড়া হই না কেন, এতটুকু সাংসারিক বুদ্ধি আমাদের ছিল। কবি তাঁর বন্ধুদের বেলায় অকুণ্ঠিতভাবে খরচ করতেন। এটা আমরা কোনো সময়ই সমর্থন করিনি।

আমরা দু'জনে পরামর্শ করে স্থির করলাম: 'এই ট্রেনেই আমাদের যেতে হবে।' বললাম: "কলকাতায় একটা ভীষণ কাজ ফেলে এসেছি, এই ট্রেনেই না গেলে আমাদের ক্ষতি হবে।—এবার আমরা যাই।"

কবি যেন আঁৎকে উঠলেন। বললেন: "এখন কোথায় যাবি রে? খানবাহাদুর আবদুল আজিজ সাহেব চাটগাঁয়ের বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাতিকে নিয়ে এসেছিস। বললেই হলো—এখন যাই?"

বললাম: "আর একদিন সময় হাতে নিয়ে আসবো। আজ যাই বিশেষ দরকার আছে।"

কবি বললেন: "তা কিছুতেই হয় না। তা ছাড়া তুই তো রোজা আছিস। ইফ্‌তারের সময়ও হয়ে এসেছে। অন্ততঃ ইফ্‌তার তো করে যা।"

তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন। একটু পরে বাড়ীর ভেতর থেকে কবির ভীষণ রাগারাগির শব্দ কানে এলো। অন্দরের দরওয়াজায় কান পেতে আমরা দু'জনে কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলাম। বুঝলাম: আমাদের নিয়েই কবি তাঁর শাশুড়ীর সাথে ঝগড়া করছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় হলো: "যখন তিনি জানেন যে আমরা রোজা আছি, তখন কেন ইফতারী তৈরী করে রাখা হয়নি?"

তাঁর শাশুড়ী বলছেন: "আমি কি জানি বাপু—ইফ্তারী কাকে বলে, আর তাতে কি কি দরকার হয়!"

একটু পরে কবি আদার কুচি, লবণ, শশা প্রভৃতি নিয়ে আমাদের কাছে ফিরে এলেন। বললেন: "ভেজা ছোলা আর হলো না রে।"

বললাম: "তাতে আর কুণ্ঠা কি। ওঁরা তো আর জানেন না যে রোজা রেখে আমরা এখানে আসবো। আর ও-তো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সেই সকাল বেলা ছোলা ভিজিয়ে রাখতে হয়।"

হো হো করে কবি হেসে উঠলেন। বললেন: "শরবৎটা একটু পরে খা'—বরফ আনতে পাঠিয়েছি। আসতে দেরি হবে না।"

ভাবলাম: বিদ্রোহী কবির এ-কি রূপ? আমার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে তাই, না, এ-তাঁর কবি-জীবনের স্বাভাবিক কোমলতা? কোনটা?

বললাম: "এটা আপনার ভারী অন্যায় ভাই! মাসীমা তো আর এ-সব ব্যাপারে অভ্যস্ত নন, যে, আপনি তাঁর ওপর অনর্থক রাগারাগি করলেন? আমরা কিন্তু এখান থেকেই সব শুনতে পেয়েছি।"

চোখ দুটো তাঁর যেন দপ করে জ্বলে উঠলো। বললেন: "মুসলমানের ঘরে মেয়ে দিতে পারলেন, আর এ সব জানবেন না মানে?—তাঁকে জানতে হবে।"

মনে মনে তাঁর ওপর আরও শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলাম। আহা! এই লোকটিকেই মুসলমানদের কেউ কেউ ফতোয়া দিয়ে সমাজ থেকে সরিয়ে রাখতে আগ্রহশীল!

আমরা আর দেরি না করে তাড়াতাড়ি গিয়ে ট্রেন ধরলাম।

এরপর আর একদিন বাহারকে নিয়ে হুগলী গেলাম। দেখলাম: কবির সামান্য জ্বর। গায়ে দু'একটা বসন্ত দেখা দিয়েছে—পানি বসন্ত। যারা কবির বাড়ীতে সব সময় ভিড় জমিয়ে রাখতো, তাদের কেউ নেই তখন আশেপাশে। একটা ডাক্তার ডাকবার লোকও নেই বাড়ীতে। বাড়ীর সবাই উৎকণ্ঠিত। কবি নীরবে বিছানায় শুয়েছিলেন। মাসীমাকে বললাম: "ব্যাপার কি? একজন লোকও নেই? ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা, এ সব চলছে কি করে?"

তিনি বললেন: "কি করবো বাবা! মাঝে মাঝে দু'একজন আসেন। তাঁদের দিয়েই কোনো রকমে বাইরের কাজগুলো করিয়ে নি।"

আমাদের তখন তরুণ বয়স। অভিজ্ঞতা কম। পানি-বসন্তকেই একটা ভয়াবহ ব্যাপার কল্পনা করে, একটা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিলাম। কোথায় বসন্তের ডাক্তার পাওয়া যায়, কোথায় কবিরাজ পাওয়া যায়, এর অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠলাম। হুগলী আমাদের কাছে অপরিচিত জায়গা। চট করে এ সকলের সন্ধান পাওয়া আমাদের কাছে সোজা ব্যাপার নয়।

মৃদু হেসে কবি বললেন: "চুপ করে বোস, হৈ-চৈ করে লাভ নেই। মনের বসন্ত আমার দেহে ফুটে বেরিয়েছে; তাকে আনন্দিত মনে অভিনন্দিত কর।"

মৃদু হেসে আমরাও এর নীরবে উত্তর দিলাম। বললাম: "সে তো ঠিক, তবে আপনার সামান্য জ্বর আছে বলে মনে হচ্ছে। অন্ততঃ একজন হোমিওপ্যাথকেও দেখানো দরকার।"

বললাম বটে, কিন্তু টাকা কোথায়? বাড়ীতে পা দিয়েই বুঝেছিলাম, সেদিন কবির বাড়ীতে চাল বাড়ন্ত। ক'দিন থেকে তিনি শয্যাশায়ী। কোথাও বেরুতে না পারলে তো আর টাকা পয়সার কোনো ব্যবস্থা হবে না। উপায়? মিসেস এম, রহমানের সাহায্য

নেব, তারও উপায় নেই। কারণ প্রথমতঃ তাঁর বাড়ী ওখান থেকে কাছের পথ নয়। দ্বিতীয়তঃ সংবাদ পেলাম, তিনি তখন কলকাতায়।

দ্বিধা-সঙ্কোচে নিচে নেমে এলাম। দেখলাম, এক ভদ্রলোক দহ্‌লিজে বসে আছেন। পরিচয় নিয়ে জানলাম, তিনি বর্ধমান থেকে কবির সাথে দেখা করতে এসেছেন। কবির একজন আত্মীয়। তাঁকে কবির বর্তমান অবস্থার কথা বললাম।

অবস্থা শুনে ভদ্রলোক খুব উৎসাহের সাথে বললেন: "আপনারা এখানে বসুন, আমি একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।"

ঘণ্টা দেড়েক তাঁর প্রতীক্ষায় আমাদের কাটলো। কিন্তু ভদ্রলোকের আর পাত্তা নেই। অতিষ্ঠ হয়ে কবিকে গিয়ে সকল কথা বললাম।

হেসে তিনি বললেন: "বসন্তের নাম শুনে ও পালিয়েছে রে— তোরা এখন যা, এরপর হয়তো কলকাতার গাড়ী পেতে অসুবিধা হবে।"

বুঝলাম: অবস্থা চরম সীমায় এসে ঠেকেছে। চিকিৎসা উপলক্ষে আমরা ওখানে থেকে গেলে, আমাদের পেছনেও একটা খরচ আছে।

বললাম: "হাঁ আমরা এই ট্রেনেই যাব। কিন্তু আপনার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে না পারলেও তো নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারছি না।"

তিনি বললেন: "তবে যা, ঐ মোড়ের মাথায় একজন হোমিও-প্যাথ আছেন, ওঁকেই না হয় ডেকে নিয়ে আয়।"

সব দেখে-শুনে ডাক্তার আশ্বাস দিলেন: আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। আর এর কোনো চিকিৎসারও প্রয়োজন হবে না। তবে সেবায়-যত্নে এমনভাবে রাখতে হবে যে, বাইরের কোনো উপদ্রব যেন আক্রমণ না করে। আমরা আশ্বস্ত হলাম। ডাক্তার কোনো ফী নিলেন না।

অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করে সন্ধ্যার ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে এলাম। আসার সময় সামান্য কয়েকটি টাকা দিয়ে এসেছিলাম—সে

অতি সামান্য। আমার কাছে কোনো টাকা ছিল না—এ-টাকা বাহারই দিয়েছিল।

কলকাতায় ফিরতে আমাদের সেদিন রাত প্রায় এগারোটা হয়ে গিয়েছিল। সেদিন আর হলো না। পরদিন গিয়ে ডি, এম, লাইব্রেরীর গোপাল বাবুকে আর বর্মণ পাবলিশিং হাউস-এর ব্রজবিহারী বর্মণকে কবির সংবাদটি দিয়ে কিছু টাকা পাঠাতে অনুরোধ করলাম।

আমাদের প্রতি কবির এরূপই নির্দেশ ছিল।

বিপদের চরম মুহূর্ত

হুগলীতে নূতন সংসার পেতে নজরুল দারুণ সংকটে পড়েছিলেন। এই সময় তাঁর জীবনে এসেছিল দারুণ দুর্দিন। অভাব-অনটন যেন ভীষণ ভয়াল মূর্তি নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করেছিল।

চিরদিন তিনি কাটিয়েছেন ছন্নছাড়া, বাঁধন-হারা জীবন।

"আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা" অন্তরের অন্তস্থল থেকে একদিন এই বাণী তাঁর বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তিনি যেন নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলেন। টাকা নেই—পয়সা নেই—কোথাও দাঁড়াবার স্থান নেই। যে-মেয়েটির দায়িত্ব স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিয়েছেন, সুষ্ঠুভাবে সে-দায়িত্ব পালন করতে না পারলে, অতিভক্ত তরুণ-সমাজও তাঁর ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলবে। দেশের আবহাওয়া ঘোরালো। হিন্দু-মহাসভা আর আর্যসমাজীরা শাণিত কৃপাণ উঁচিয়ে আছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রক্ষণশীলদলের সহানুভূতি তিনি পাচ্ছেন না। এমতাবস্থায় যদি তিনি মুহূর্তের ভুলে তরুণ-সমাজের সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত হন, তবে তার পরিণামফল হবে অত্যন্ত মারাত্মক। অথচ এই সংসারবন্ধন তাঁর দৃঢ় করতে হলে, তাতে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তার কিছুই নেই তাঁর। জীবনের সাথে বিপুল বিক্রমে তিনি যুদ্ধ করতে লাগলেন।

এই সময় ১৬ই জুন (১৯২৫) তারিখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জিলিং-এ মারা গেলেন। তাঁর শবদেহ বিপুল আড়ম্বরে কলকাতায়

নিয়ে আসা হলো। পথে নৈহাটী ষ্টেশনে হুগলী জেলার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে কবি নজরুল ইসলাম শ্রদ্ধানিবেদন করলেন কয়েক লাইন কবিতা লিখে। লাইন ক'টি এই :

"হায় চির-ভোলা! হিমালয় হতে
অমৃত আনিতে গিয়া,
ফিরিয়া এলে যে নীলকণ্ঠের
মৃত্যু গরল পিয়া!
ধরা আর তোমা ধরিতে পারে না
আজ তুমি দেবতার ?
নিয়ে যাও দেব, মরু হুগলীর
অর্ঘ্য নয়নাসার।"

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

প্রত্যেকটি দৈনিকে পরে মাসিক-পত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাশে নজরুলের কবিতাও ছাপা হলো। কিন্তু দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্বে অভিভূত নজরুল যেন তৃপ্তি পেলেন না। তিনি 'ইন্দ্রপতন' নামে এক বিরাট কবিতা লিখে, তারপর গান লিখে, নিজের প্রাণকে উজাড় করে দিলেন। পরে এই সকল কবিতা ও গান দিয়ে একখানা পুস্তিকা বের হয়। এর নামকরণ করা হয়—'চিত্ত-নামা'।

হুগলী থাকতেই কবি তাঁর বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত উদ্দীপনাময়ী কবিতাগুলি গ্রথিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। নাম দেওয়া হয়—"বিষের বাঁশী।" কবির নিজের এবং বন্ধুদেরও অনেকের ইচ্ছা ছিল, এ-গুলোর নাম দেওয়া হবে 'অগ্নিবীণা' দ্বিতীয় খণ্ড। কিন্তু নানা কারণে এ-পরিকল্পনা পরে পরিত্যক্ত হয়। এর কবিতাগুলো যেন আগুনের ফুলকি। বইখানা 'নাগ-দুহিতা' মিসেস এম, রহমানের নামে উৎসর্গ করা হয়।

মুসলমানদের মধ্যে যেমন একদল নজরুলকে সহ্য করতে পারতেন না, তেমনি একদল হিন্দু—দুঃখের বিষয় কয়েকজন তরুণ-হিন্দুও তাঁকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা 'প্রবাসী' অফিস থেকে 'শনিবারের চিঠি' নামে একখানা সাপ্তাহিক বার করতেন। আমাদের কিন্তু মনে হতো এটা যেন নজরুল-নিধনের জন্যই বার করা হতো। তাতে নজরুল-সাহিত্য নিয়ে কী উৎকট রসিকতাই না করতেন তাঁরা! এঁদের লেখায় যথেষ্ট শক্তির পরিচয় থাকলেও, সাফল্যজনক রসিকতা এঁদের লেখায় ফুটে উঠলেও, শুধু নজরুলের নিন্দা-প্রচারের জন্যই তাঁর অগণিত ভক্তের কাছে ছিলেন এঁরা অশ্রদ্ধেয়।

"যোগানন্দ দাস"—সম্ভবতঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস 'শনিবারের চিঠি' সম্পাদনা করতেন। কিছুদিন আগে সজনী বাবু 'বিষের বাঁশী'র আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন :

"স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ যেভাবে বহুবিধ সঙ্গীত ও কবিতার সাহায্যে বাঙ্গালীর দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তম বিপ্লবে যে-কারণেই হউক তাঁহারা ঠিক সেভাবে সাড়া দেন নাই। একমাত্র কবি নজরুলই ছন্দে, গানে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন।....বাংলা দেশের মত অনড় ও জড় দেশকে জাগাইবার জন্য যে আবেগময় উচ্ছ্বসিত প্রাণ-বন্যার প্রয়োজন ছিল, কবি নজরুলের মধ্যে তাহার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। কবি নজরুল ইসলামের "বিষের বাঁশী" এই থর থর প্রাণ-স্পন্দন যুগের গান।"

দীর্ঘদিন পরে একান্ত অসময়ে হলেও নজরুলের বিরূপ-সমালোচক শ্রীসজনীকান্ত দাসের এই স্বীকৃতির মূল্য আছে।

'বিষের বাঁশী'র কবিতাগুলি পূর্বে বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। এর অধিকাংশ গান মুখে মুখে সমগ্র বাঙলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর 'শিকলপরা ছল' 'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ' 'জাতের

নামে বঙ্গজাতি, প্রভৃতি সংগীত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে গীত হয়ে সমগ্র দেশকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করেছিল। আশ্চর্যের কথা এই যে, এবার ঐ গান ও কবিতাগুলি যখন গ্রথিত হয়ে 'বিষের বাঁশী' নামে প্রকাশিত হলো, তখন সরকারী-রোষে বইখানা বাজেয়াফ্‌ত হয়ে গেলো। যদিও অবস্থা আঁচ করে কবি পূর্বেই ভূমিকায় লিখে-ছিলেন :

"বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্য হলাম। কারণ আইনরূপ আয়ান ঘোষ যতক্ষণ তাঁর বংশদণ্ড উঁচিয়ে আছে, ততক্ষণ বাঁশীতে তথাকথিত বিদ্রোহী রাধার নাম না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঐ ঘোষের পোর বাঁশ, বাঁশীর চেয়ে অনেক শক্ত। বাঁশে ও বাঁশীতে বাঁশাবাঁশি লাগলে, বাঁশীরই ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কেন না বাঁশী হচ্ছে সুরের, আর বাঁশ হচ্ছে অসুরের।"

এ কথা বলা সত্ত্বেও 'বিষের বাঁশী' বাজেয়াফ্‌ত হলো। 'বিষের বাঁশীর' জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে আমরা ভেবেছিলাম, এবার হয়তো কবির অর্থ সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। কিন্তু হায় দুরাশা। 'বিষের বাঁশী' বাজেয়াফ্‌ত হওয়ায় তাঁর দুর্গতি চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছলো। কিন্তু তাতেই কি দমবার পাত্র তিনি? স্বয়ং তিনি সভা-সমিতিতে যোগদান করে, তাঁর স্বভাবগত জোরালো কণ্ঠে গান গেয়ে, বাঙালীর জাতীয় জীবনের জড়তা ভেঙে চুরমার করে দিতে লাগলেন। অর্থাভাবে তাঁর কষ্ট হচ্ছে—চালের হাঁড়িতে তাঁর নেংটি ইঁদুরে বক্সিং খেলছে, জুতো নেই, জামা নেই। তিনি চারণের বেশে গান গেয়ে দেশে দেশে বেড়াতে লাগলেন।

কী কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনা! দেশপ্রেমে যেন তিনি একেবারে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন।

আর সরকার তাঁর 'বিষের বাঁশী' বাজেয়াফ্‌ত না করেই বা কি করে, বলুন! এর ভেতরে প্রতিটি অক্ষরে, প্রতিটি শব্দে যেন তিনি এক-একটা বোমা পুরে রেখেছিলেন। অসহযোগের লেলিহান অগ্নি-

শিখায় সমগ্র বৃটিশ-ভারত পুড়ে ছারখার হবার উপক্রম। তার মধ্যে নজরুল ইসলাম যেন ঢেলে দিলেন পেট্রোল। তিনি লিখলেন :

"বন্দী থাকা হীন অপমান, হাঁকবে যে-বীর তরুণ,
শির দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,
সত্য মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের।"

আবার :

"আজি রক্ত নিশি ভোরে,
একি এ শুনি ওরে,
মুক্তি কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে।
কাহারা কারাবাসে,
মুক্তি হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়াতলে।"

তারপর :

"এই শিকলপরা ছল মোদের এ শিকলপরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবোরে বিকল।
ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্চনা,
এ যে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা।
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।"

পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই। এরূপ বহু জাগরণ-গীতিতে বইখানা পরিপূর্ণ। যুগবাণী, ভাঙার গান প্রভৃতি বইয়েও ঐ ধরনের লেখা থাকায় ও-গুলোও বাজেয়াফ্‌ত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় সর্বকালে সর্বযুগে সর্বজন গ্রহণযোগ্য কবির বিখ্যাত কবিতা, 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' কবিতাও এই বইয়ে সংযোজিত থাকায় তা-ও বাজেয়াফ্‌ত হয়ে যায়।

সুখের বিষয় দীর্ঘদিন পরে বাঙলা-সরকার বহু তদবীরের পর সব কয়খানা বই-ই মুক্তি দিয়েছিলেন।

কবি যখন হুগলীতে, আমি তখন 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'র সাথে সংশ্লিষ্ট। এই সময় আমি ত্রৈ-মাসিক 'সাম্যবাদী' পত্রিকাও সম্পাদনা করছি। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে কবি 'সাম্যবাদী'র জন্য একটি কবিতা লিখে পাঠান। এই কবিতাটির নাম 'সুবহ উম্মিদ'। এতে সমগ্র মুসলান সমাজকে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন তিনি। কবিতাটি প্রথমে পড়ে বন্ধু আবুল মনসুর আহমদের হাতে। তিনি তখন সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদীর' সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন। উৎসাহে আবেগে চঞ্চল হয়ে ওঠেন আবুল মনসুর আহমদ। বলেন: "এটা 'সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে ছেপেদি' কি বল?"

কিন্তু কবি ওটা আমার অনুরোধে বিশেষভাবে 'সাম্যবাদী'র জন্যই পাঠিয়েছিলেন। এ-কথা আমি তাঁকে বললাম। আবুল মনসুর আহমদ বললেন: "তা হলে এটা তুমি 'সাম্যবাদী'তেই প্রকাশ কর, পরে না হয় ওটা 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে পুনর্মুদ্রণ করবো।"

আমি হেসে বলেছিলাম: "বেশ।"

এরপর একদিন আমি হুগলী গেলে কবি আমার হাতে একটি কবিতা দিলেন। গোটা গোটা অক্ষরে মেয়েলী হাতের লেখা কবিতা। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে কবির মুখের দিকে তাকালাম। বললাম: "কার লেখা এটা?"

তিনি একটু হাসলেন। বললেন: "তোর ভাবীও যে আজকাল কবিতা লিখতে শুরু করেছেন!"

তাই নাকি?—আনন্দে নেচে উঠলাম। বললাম: "এটা কিন্তু আমি 'সাম্যবাদী'তে ছেপে দেবো।"

কবি বললেন: "হ্যাঁ রে, এ জন্যই তো তোকে দিলাম।" কবিতাটি এই:

শঙ্কিতা

—আশালতা সেনগুপ্তা

কেন আজি প্রাণমন বেদনা-বিহ্বল,
কেন আজি অকারণে চোখে আসে জল !
সন্ধ্যায় সমীরণ হু হু করে বয়ে যায়,
র'য়ে র'য়ে মোর প্রাণ কেন করে হায় হায় !
কোন্ বেদনায় মম বুক আজি কম্পিত,
কে জানে গো হিয়া মাঝে কত ব্যথা সঞ্চিত !
বেলাশেষে নীলিমায় চেয়ে আছি অনিমিখ,
কে ছড়ালো বিদায়ের সিন্দুর চারিদিক।
কিছুই বুঝি না হায় কেন প্রাণ ভয়াতুর,
কে দিল হৃদয়ে বেঁধে মল্লার রাগ সুর ?
মনে হয় এ-নিখিলে কেহ নাই, নাই মোর,
তুমিও কি বল সন্ধ্যা ?   কেহ নাই, নাই তোর ?

কবিতাটি প্রথমে আমি 'সাম্যবাদী'তে প্রকাশ করি। এর অনেকদিন পর 'সওগাতে'র মহিলা-সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। অমরেশ কাঞ্জিলাল সম্পাদিত একটি সাপ্তাহিকেও পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছিল।

এই সময় নজরুল বেগম শামসুন্নাহারের 'পুণ্যময়ী' বইখানার একটি প্রশস্তি লিখে দেন কবিতায়। যথা ঃ

শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীপ,
তারই বুকে নারী ব'সে আছে জ্বালি' বিপদ-বাতির সিন্ধু-দ্বীপ।
শাশ্বত সেই দীপান্বিতার দীপ হ'তে আঁখি-দীপ ভরি'
আসিয়াছ তুমি অরুণিমা আলো প্রভাতী-তারার টিপ পরি'।
আপনার তুমি জান পরিচয়—তুমি কল্যাণী, তুমি নারী,
আনিয়াছ তাই ভরি' হেম-ঝারি মরু-বুকে জম্‌জম্‌-বারি।

অন্তরিকার আঁধার চিরিয়া প্রকাশিলে তব সত্যরূপ—
তুমি আছ, আছে তোমারও দেবার, তব গেহ নহে অন্ধ কূপ।
তুমি আলোকের—তুমি সত্যের—ধরার ধূলার তাজমহল,
রৌদ্রতপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল।
আপনারে তুমি চিনিয়াছ যবে—শুধিয়াছ ঋণ টুটেছে ঘুম;
অন্ধকারের কুঁড়িতে ফুটেছ আলোকের শতদল কুসুম।
বন্ধ কারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয়-নিশান—
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।
লহ স্নেহাশিস—তোমার "পুণ্যময়ী"র "শাম্‌স্" পুণ্যালোক
শাশ্বত হোক! সুন্দর হোক! প্রতি ঘরে চিরদীপ্ত রোক্!

—নজরুল ইসলাম

হুগলী
১৯শে মাঘ, ১৩৩১

এই কবিতাটিও আমি 'সাম্যবাদী'তে ছেপেছিলাম।

হুগলীতে কবি যে আর্থিক দুর্গতিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তা' থেকে উদ্ধার করার জন্য মাঝে মাঝে চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তা' ছিল তাঁর চাহিদার পক্ষে অপ্রচুর।

হুগলী থেকে নজরুল সপরিবারে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে চলে যান। তাঁর অভিভাবিকা মিসেস এম, রহমান এতে আপত্তি করেননি। কারণ তিনি স্বাধীনচেতা মহিলা হলেও নজরুলের সকল দায়িত্ব ঘাড়ে নেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরিবারিক বহু বাধা তাঁর সামনে চীনের প্রাচীরের মতো উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি এই ভেবে সান্ত্বনাবোধ করছিলেন যে, হয়তো এই স্থান-পরিবর্তনের ফলে নজরুলের অর্থকষ্ট কিছুটা দূরীভূত হবে। তাঁর চোখের আড়ালে থাকলেও নজরুল সুখে থাক, এটাই তিনি চেয়েছিলেন; যেমন প্রত্যেকটি মা-ই সন্তানের মঙ্গল-কামনায় চেয়ে থাকেন।

নজরুল ও লাঙল

নজরুলকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যান শ্রীহেমন্তকুমার সরকার—আমাদের সকলের হেমন্ত দা'। সে সম্ভবতঃ ১৩৩২ সালের পৌষ মাসের দিকে।

প্রথমে নজরুল গিয়ে হেমন্তবাবুর বাড়ীতেই সপরিবারে উঠেছিলেন। তারপর তাঁকে চাঁদ-সড়কের ধারে বিরাট কম্পাউণ্ডওয়ালা একটা একতলা বাঙলো প্যাটার্ণের বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হয়। বাড়ীটি ঠিক কবির উপযুক্ত বাড়ী-ই হয়েছিলো।

এই বাড়ীর দান অপরিসীম। কবির বহু বিখ্যাত কবিতা ও গান এই বাড়ীতে বসেই লেখা। এর উঠানে প্রকাণ্ড একটি গাছ ছিল। কি গাছ মনে নেই। তার নিচে বেতের চেয়ার ও বেতের টেবিলে কবি বসতেন। আর লিখে যেতেন ঝড়ের বেগে। 'খালেদ' (এর বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র দেখুন) 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' 'শ্রমিকের গান' 'ধীবরের গান' এবং আরও অনেক লেখা এখানকারই দান। কবির 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস এই বাড়ী আর তার পারিপার্শ্বিকতাকে কেন্দ্র করেই লেখা।

এখানে তিনি পেয়েছিলেন বিখ্যাত গল্পলেখক এস, এম, আকবর-উদ্দীন ও তাঁর ভাই এস, এম, জহুরুদ্দীনের সাহচর্য। আত্মীয়াধিক যত্নে এঁরা কবিকে ঘিরে রেখেছিলেন।

এই সময় অর্থাৎ ১৩৩২ সালের ১লা পৌষ (১৬-১২-১৯২৫) কলকাতা থেকে 'লাঙল' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হলো। এর অফিস ছিল মির্জাপুর স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের জংসনে—৩৭নং হ্যারিসন রোডে, দোতলার ওপরে। অধুনা বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা

কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা। এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন: কমরেড শামসুদ্দীন আহমদ, কমরেড আবদুল হালিম, কমরেড সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরো অনেকে।

কৃষ্ণনগরে গিয়েও নজরুলের খুবই আর্থিক দুর্গতি চলছিল। শুধু পত্র-পত্রিকায় লিখে তাঁকে ব্যয়বহুল সংসার প্রতিপালন করতে হতো। অর্থকষ্ট কিছুটা দূরীকরণের ইচ্ছায় মুজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব নজরুলকে 'লাঙল' পরিচালনার ভার দিলেন। সম্পাদক হলেন শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। এর প্রথম সংখ্যায়ই কবির বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী' প্রকাশিত হলো।

পত্রিকার নাম 'লাঙল' হলে হবে কি, এটা ছিল একটু উঁচু ধরনের কাগজ। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এর নীতি আর আদর্শের সাথে পরিচত হওয়া সহজসাধ্য ছিল না। এ-সম্বন্ধে আমি একদিন মুজাফ্‌ফর আহমদ সাহেবকে প্রশ্নও করেছিলাম। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "এ-পত্রিকা সাধারণ পাঠকের জন্য নয়—শুধু এক শ্রেণীর কর্মী তৈরী করার জন্যই এ-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।"

লাঙলের আয়ুষ্কাল বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। বোধহয় ইট-কাঠঘেরা কলকাতা মহানগরীতে লাঙল দিয়ে চাষ করার উপযুক্ত জমি ছিল না।

এ-ছাড়া 'লাঙল' প্রকাশিত হয়েছিল 'এক শ্রেণীর কর্মী' তৈরী করার জন্য। 'লাঙল' বলতে শুধু চাষী-সমাজের কাগজ বলেই মনে হয়। কলের কুলি, কামার, কুমার, জেলে প্রভৃতি এর আওতা থেকে বাদ পড়ে যায়। তাই পরে লাঙলের নাম পরিবর্তন করে এর নাম রাখা হয় 'গণবাণী'। গণবাণীর প্রথম প্রকাশ ১৯২৬ সালের ১২ই আগস্ট।

'লাঙল-গণবাণীর' সংস্রবে যাওয়ায় নজরুল সম্বন্ধে আমাদের মনে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা সবাই সশংকচিত্তে ভেবেছিলাম, হয়তো নজরুল কমিউনিস্ট মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠবেন। কিন্তু তা' হয়নি। নজরুল-চরিত্র কমিউনিস্ট হবার উপযোগী ছিল না।

নজরুল মানবতার কবি—বেদনার কবি। সাধারণ মানুষের জন্য, দুঃখী মানুষের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর অন্তরে যে মমতা, যে বেদনাবোধ ছিল, তারই প্রকাশ ও বিকাশ হয়েছিল লাঙল-গণবাণীর সংশ্রবে গিয়ে। কমিউনিস্ট মতবাদকে তিনি আদৌ মেনে নিতে পারেননি। তাই বেশি দিন তাঁকে এখানে ধরে রাখা সম্ভবও হয়নি। বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, মুজাফ্ফর আহমদ সাহেব ছিলেন নজরুলের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, আত্মীয়াধিক আত্মীয়, আর সুখ-দুঃখে সমভাগী। বিশ্ব-মানবতার সেবক নজরুল তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন হয়েও তাই কমিউনিস্ট হতে পারেননি।....

সওগাত ও নজরুল

এরপর ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাস থেকে নব-পর্যায়ের 'সওগাত' বের হলো ৮২ নং কলুটোলা স্ট্রীট্, কোলকাতা থেকে। অল্পদিনের ভেতরেই 'সওগাত' জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। এর অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ বহুদিন থেকে বাংলার মুসলমান সমাজ একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক-পত্রিকার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করছিল। দ্বিতীয়তঃ 'সওগাত' বের হবার অল্প কিছুদিন আগেই (১৯২৬-এর দাঙ্গা ২রা এপ্রিল, বাংলা ১৩৩২ সালের ১৯শে চৈত্র, শুক্রবার) হিন্দুদের রাজরাজেশ্বরী মিছিলকে উপলক্ষ্য করে কোলকাতায় এক ভীষণ দাঙ্গা বেধেছিল। তাই 'সওগাত' বের হওয়ায় প্রথম শ্রেণীর সকল সাহিত্যিকই এর ওপর সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। এঁরা সওগাতের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীন মতবাদ ব্যক্ত করতে থাকেন। আবুল মনসুর আহ্‌মদের 'ধর্মরাজ্য' ও গো দেওতাকা দেশ' নামে দুইটি রস-রচনা এই সময়ই সওগাতে প্রকাশিত হয়। তৃতীয়তঃ তরুণ-সাহিত্যিকদের সহযোগিতায় এর বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় আর সুরুচিসম্মত সম্পাদনায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদার মতাবলম্বী চিন্তা-নায়কেরা নানা দিক দিয়ে একে সাহায্য করতে থাকেন। এতে ধীরে ধীরে একটা 'সওগাত-গোষ্ঠী' গড়ে ওঠে 'সওগাত'কে কেন্দ্র করে।

সওগাত-গোষ্ঠী নতুন চিন্তাধারায় যদিও দেশের বুকে করলেন এক নবজাগরণের সূত্রপাত, তা' হলেও এই নতুন চিন্তার অগ্রগামী বীর

নজরুল ছিলেন এ গোষ্ঠীর বাইরে। সবাই নিজেদের মধ্যে তাঁর অভাব তীব্রভাবে অনুভব করতে লাগলেন। তাঁকে একান্তভাবে নিজেদের মধ্যে না পাওয়ায় সকলেই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

সওগাত-এর সম্পাদক এম, নাসিরউদ্দীন সাহেবকে প্রথম প্রথম একাই ঘোরাফেরার সকল কাজ সম্পাদন করতে হতো। অর্থাভাবে লোকজন রাখার সঙ্গতি তখন সওগাতের ছিল না। তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন 'সওগাত' অফিসে সাময়িক সাহায্যের জন্য। আমি 'সওগাত' অফিসে এর প্রুফ দেখা, লেখা আদায়, লেখা বাছাই প্রভৃতি সকল কাজেই নাসিরউদ্দীন সাহেবকে সাহায্য করি কিন্তু চাকুরি করি অন্যত্র। সকালে-বিকালে-রাত্রে আর ছুটি-ছাটার দিনে থাকি 'সওগাতে'র জন্য ব্যস্ত। সওগাতকে বাঁচিয়ে রাখার নেশা যেন পেয়ে বসেছিল আমাদের সকলকে। সন্ধ্যার পর সকল তরুণ-সাহিত্যিক বন্ধুরা গিয়ে জড় হতেন 'সওগাত' অফিসে। আর অক্লান্ত পরিশ্রমে এত ভিত্তিমূল দৃঢ়ীভূত করতে খরচ করতেন বুকের এক-এক ফোঁটা রক্ত।

আমার কাজের কিছুটা পরিচয় পেয়ে বন্ধুরা আবিষ্কার করলেন, চির-চঞ্চল নজরুলকে 'সওগাত-গোষ্ঠী'র আওতায় একমাত্র আমি-ই আনতে পারি—যদি চেষ্টা করি। তাই তাঁরা আমাকে লাগিয়ে দিলেন নজরুলের পেছনে। নজরুল-স্নেহে অভিষিক্ত ছিল আমার হৃদয় ও মন। তাই তাঁর কাছে আমার আবদার চলতো যথেচ্ছভাবে।

আমি কৃষ্ণনগরে মাঝে মাঝে গিয়ে, 'গণবাণী' অফিসে মাঝে মাঝে হানা দিয়ে, সওগাত-গোষ্ঠীর মত ও পথ বলে বলে তাঁর কান ঝালাপালা করে দিতে লাগলাম। সওগাতে লেখা দেবার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগলাম। আমার অনুরোধ এড়াবার সাধ্য ছিল না তাঁর। মনের দিক দিয়ে এমনি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম আমি। একদিন তাঁর কাছ থেকে "সর্বসহা" নামে একটা দীর্ঘ কবিতা আদায় করে নিয়ে এলাম।

এর কয়েক দিন পরেই নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম হলো। এই আনন্দ-সংবাদটি জানাতে গিয়ে কবি সওগাত-অফিসের ঠিকানায় আমাকে একখানা চিঠি লিখলেন। ওতে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিসের সীল ছিল ১৯২৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের। পত্রখানা ১০ই সেপ্টেম্বর আমার হস্তগত হয়। কিন্তু কবি ভুল করে ওতে তারিখ লিখেছিলেন ৯-১০-২৬। বুলবুলের জন্ম-তারিখটি সঠিক নির্ণয়ের জন্য তারিখের এই গোলমালটুকুর ওপর গুরুত্ব দিলাম।

নজরুলের পত্র :

কৃষ্ণনগর

৯-১০-২৬

স্নেহভাজনেষু,

মঈন। আজ সকালে আমাদের একটি খোকা এসেছে। তোর ভাবী ভাল আছে। খোকা বেশ মোটাতাজা হয়েছে। নাসিরুদ্দীন সাহেবকে খবরটা দিস। চট্টগ্রাম থেকে কোন কবিতা পেয়েছিস্ কি আমার? "সর্বসহা" দিবি ত সওগাতে? নতুন লেখা শীগ্‌গীরই দেবো। আমি যশোর-খুলনা ঘুরে আজ ফিরছি। অন্য পোস্টকার্ড ছিল না বলে এটাতেই লিখ্‌লাম। কিছু মনে করিসনি। এইবার গিয়ে শ্যামসুন্দীন সাহেবকে বইগুলো পাঠিয়ে দেবো। কাল কিম্বা পরশু যাব কোলকাতা। ৩৭নং-এ খবর দিস একবার। ভালবাসা ও স্নেহাশীষ নে।

ইতি

কাজী ভাই

১৩৩৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা নবপর্যায়ের সওগাতে প্রথম নজরুলের লেখা 'সর্বসহা' প্রকাশিত হয়েছিল। আর এর কৃতিত্ব

আমাকেই দিতে হবে। কিন্তু কবি, এরপর সওগাতে নিয়মিত লিখবেন, ঐ লেখা ছাপার গোড়ায় এরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না।

এরপর একদিন গিয়ে হাজির হলাম তাঁর কাছে—সওগাতে নিয়মিত লিখবার দাবী নিয়ে। বিশ্বস্ত ভক্তের দাবী উপেক্ষা করার সাধ্য তাঁর ছিল না। বললেন: 'আজ আর হবে না রে, আর একদিন আসিস।'

আর একদিন যেতে তো বেশ বলে দিলেন, কিন্তু তাঁকে পাই কোথায়? আজ তিনি এখানে তো, কাল তিনি এমন জায়গায় চলে গেলেন, যে জায়গা আমাদের নাগালের একেবারে বাইরে। কয়েক দিন বেশ হাঁটাহাঁটি করলাম।

নাসিরউদ্দীন সাহেব একটু স্বভাবগম্ভীর লোক। বেশ বোঝা যাচ্ছে আমার এই ব্যর্থতায় তিনি বেশ বিরক্ত হয়ে উঠছেন। আমি কিন্তু আশাবাদী আর জেদী। কোনো কাজে হাত দিয়ে তা' শেষ না করা পর্যন্ত আমার সোয়াস্তি নেই। আমি ফাঁক পেলেই কবিকে চেপে ধরি।

তখন ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সওগাত' ছাপা আরম্ভ হয়েছে। নজরুলের লেখা পাওয়া গেলে তা' গোড়ায় দিতে হবে এরূপ ইচ্ছা ছিল। এ জন্য দ্বিতীয় ফর্মা ছেকে কম্পোজ আরম্ভ করিয়ে ছাপা শুরু হয়েছিল। নজরুলের লেখা পেতে দেরি হচ্ছিল বলে একদিন নাসিরউদ্দীন্ সাহেব বলে দিলেন: "আজ তাঁর লেখা পাওয়া না গেলে অন্য যে কোনো লেখা দিয়ে স্থান পূরণ করে সওগাতের ছাপা শেষ করতে হবে—অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

দ্বিধা-সঙ্কোচে হ্যারিসন রোডে, 'লাঙল'-অফিসে গিয়ে হাজির হলাম। কবি তখন নিবিষ্টচিত্তে কি যেন লিখছেন।

বললাম: "কি লিখছেন?"

ইংগিতে তিনি পাশে বসতে বললেন। আমাকে আড়াল দিয়ে তাঁর কলম দ্রুত এগিয়ে চল্‌ল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তিনি মুখ

তুলে চাইলেন। বললেন: "বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম। তোকে আসতে দেখে আরম্ভ করেছিলাম। শোন্:

ঋতুর ভরিয়া এলো কি ধরণীর সওগাত?
নবীন ধানের আঘ্রাণে আজি অঘ্রাণ হল মাত।
গিন্নী-পাগল চা'লের ভিরণী,
তশ্‌তরী ভরে নবীনা গিন্নী,
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে খুশীতে কাঁপিছে হাত,
শিরণী রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ী গন্ধে তেলেসমাত।"—ইত্যাদি

আনন্দে চীৎকার করে উঠলাম। বললাম: "চমৎকার—চমৎকার। যা' চেয়েছিলাম, যেমনটি চেয়েছিলাম, তা-ই আপনি লিখেছেন।"

বললেন: "চুপ করে বোস, এটা আমি কপি করে দি।"

আমার আর তখন তর সয় না। বললাম: "আমাকে দিন, আমি এটা কপি করি।"

বললেন: "হতভাগা! আঁতুড়-ঘরে তুই হাত দিতে চাস? একে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে, তোদের হাতে দেবো, তার আগে এতে হাত দেবার তোদের কোনো অধিকার নেই।...এতে কবির ওপর মানুষের শ্রদ্ধা কমে যায়।"

লেখাটা নিয়ে আমি সরাসরি বৈঠকখানা রোডে 'সুলেখা প্রেসে' চলে এলাম। এখানেই 'সওগাত' ছাপা হতো। ফোনে নাসিরউদ্দীন সাহেবকে ডাক্‌লাম। হ্যালো....

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ এলো: "কে মঈউদ্দীন সাহেব? কি খবর?"

বললাম: "কাজী সাহেবের লেখাটা পাওয়া গেছে—চমৎকার।"

নাসিরউদ্দীন সাহেব যেন সজাগ হয়ে উঠলেন। বললেন: "তাই নাকি? কি কবিতা? নাম কি?"

বললাম: "অগ্রহায়ণের সওগাত"—ওটা কি নিয়ে আসবো? পড়ে দেখবেন?"

জওয়াব এলো: "না না, আসবার দরকার কি, এই এতটা পথ! ওটা প্রেসে দিয়ে দিন। বিকেলে প্রুফ এলে তখন মজা করে পড়া যাবে, কি বলেন?"

বললাম: "সেই ভালো। কিন্তু কবিতা যা' একখানা হয়েছে,—চমৎকার।"

আমার কথায় তিনি যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। বললেন: "ভালো কথা, এক কাজ করুন। আপনি ওখান থেকেই পড়তে থাকুন—আর আমি শুনতে থাকি, কি বলেন?"

আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। বললাম: "উত্তম প্রস্তাব!"

তারপর আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেলের অদ্ভুত যন্ত্র আমার কণ্ঠ নিয়ে পৌঁছে দিতে লাগলো কবিতা শ্রবণোৎসুক সওগাত-সম্পাদক সাহেবের কর্ণকুহরে।

ধীরে ধীরে স্পষ্ট স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলাম প্রতিটি শব্দ। পড়া শেষ হলে তিনি যেন ছেলেমানুষের মতো উৎসাহে, উচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। ফোনের এ-প্রান্তে বসে আমি বেশ বুঝতে পারলাম।

এরপর যখন তাঁর সাথে আমার দেখা হলো, তিনি বললেন: "একদিন কবিকে ধরে নিয়ে আসতে হবে।"

সম্মতি জানিয়ে বললাম: "তথাস্তু!"

বিকেল বেলায় আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও আবুল মনসুর আহমদ এলেন 'সওগাত' অফিসে। তাঁদের নিয়ে মজলিস করে কবিতাটি পড়া হলো। সবারই চোখে-মুখে আনন্দের দীপ্তি। সবারই মন্তব্য হলো: কবিতাটি চমৎকার—সুন্দর।

অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'সওগাত' বার হবার পর পাঠক-সাধারণের কাছ থেকেও কবিতাটি খুব প্রশংসা পেয়েছিলো। এই কবিতার দরুণ কবিকে কিছু টাকা পাঠানো হয়েছিল। সে অতি সামান্য। এর কিছুদিন পরই নজরুল 'গণবাণী' থেকে 'সওগাতে' চলে আসেন।

'সওগাতী-দলে' নজরুল ইসলাম

কলুটোলায় স্থানের অসংকুলান হওয়ায় 'সওগাত' অফিস ১১নং ওয়েলেসলী স্ট্রীটের (কোলকাতা) এক বিরাট দোতলা বাড়ীতে স্থানান্তরিত হলো। এ-সময় তার নিজস্ব প্রেসও হলো। এখানে আসার পর আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আবু লোহানী, মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার, ময়ীনউদ্দীন হোসায়ন এদের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঃপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ অধুনা প্রতিষ্ঠাশালী সাহিত্যিকেরা এ-সময় ছিলেন সওগাতের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সুর-শিল্পী শ্রীনলিনীকান্ত সরকার এঁরাও রেখেছিলেন সওগাতের সাথে যোগাযোগ।*

জনাব প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, কবি শাহাদাৎ হোসেন, মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী, একরামউদ্দীন, গোলাম কাসেম, আহবাব চৌধুরী এঁরা তখন থাকতেন কোলকাতার বাইরে। এঁদেরও যোগাযোগ ছিল সওগাতের সাথে নিবিড়ভাবে।

সওগাতের যে-মত, যে-পথ—তা' তরুণ-বাঙলার প্রাণে এক পুলক-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। মুসলমান-সমাজের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে এঁরা ঘোষণা করেছিলেন জেহাদ। নজরুল মুখপাত্ররূপে তাঁর মনমাতানো, প্রাণদোলানো গান আর কবিতা দিয়ে সারা দেশকে যেন মাতাল করে তুলেছিলেন।

---

* সওগাতে ধারাবাহিক শিল্পের ওপর আমার লেখা চলেছিল প্রায় বছর দুই।

কোলকাতার এই নতুন চিন্তা-বাহকেরা 'সওগাতী-দল' নামে সারা বাঙলা দেশে পরিচিত হয়েছিলো।

এই সময় ঢাকায় প্রগতিশীল আর একটি দল খাড়া হয়েছিল। এই দলটি 'শিখা-সম্প্রদায়' নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা মুক্ত-বুদ্ধি ও স্বাধীন-চিন্তার চর্চা করতেন। এই দলে ছিলেন জনাব কাজী আবদুল ওদুদ, জনাব আবুল হোসেন, জনাব কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবান। অধুনা বিখ্যাত ছান্দসিক কবি আবদুল কাদির, জনাব শামসুল হুদা, জনাব আবদুস সালাম খাঁ, প্রফেসর আবদুল কাদের, কবি আজহারুল ইসলাম প্রমুখ অনেক নতুন চিন্তার অধিকারীরা ছিলেন শিখা-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। এঁদের মুখপত্র ছিল 'শিখা' নামে একখানা পত্রিকা।

ঢাকার শিখা-সম্প্রদায় আর কোলকাতার সওগাতী-দলের মধ্যে আদর্শগত ঐক্য থাকলেও মতবাদ ছিল কিছুটা পার্থক্য। সমাজ সংস্কার করতে গিয়ে এঁরা যে মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন, তাতে রক্ষণশীলদের ভেতরে উষ্মাচাঞ্চল্য দেখা দিল। এঁদের কেউ কেউ এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে লাগলেন। কিন্তু তরুণ-বাঙলার ভাবোচ্ছ্বাসে সেদিন তাঁদের কণ্ঠ কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল, সে-কথা কেউ বলতে পারে না।

পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছবি-ছাপা, যন্ত্র ও সংগীত-চর্চা, শিক্ষার ব্যর্থতা, স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী-প্রগতি প্রভৃতি নিয়ে তরুণ-দল যে শাণিত কলম চালাচ্ছিলেন, রক্ষণশীলরা তা' চাপা দিতে গিয়ে তাঁদের শেষ অস্ত্র 'কাফের' ও 'বিবি-তালাকের ফতোয়া' নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো তখন চলছে তরুণের অগ্রগতি, সে-গতি রোধ করে, এ-সাধ্য কারুর কি তখন ছিল?

পরে দেখা গেলো, যাঁরা ছিলেন এই অগ্রগতির ঘোর বিরোধী, তাঁরাই চুপে চুপে স্ত্রী আর যুবতী-কন্যা নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে ইডেন-গার্ডেন অথবা গড়ের মাঠের ধারে ধারে হাত ধরাধরি করে ঘুরে

বেড়াচ্ছেন। নিজেদের পত্রিকায় ছবি ছাপতে উৎসাহবোধ করছেন, আর নিজেদের একান্ত অজ্ঞাতে তরুণদলের মত ও পথগুলি ধীরে ধীরে মেনে নিচ্ছেন।

ইংরাজী ১৯২৬ সাল। 'সওগাতে'র তখন জমজমাট সংসার। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বসতো 'সওগাত' অফিসে সাহিত্যিকদের আসর। বিভিন্ন কাগজে এঁরা কাজ করতেন। দিবসের কর্মক্লান্তির পর সবাই গিয়ে জুটতেন 'সওগাত'-অফিসে। আমি তখন ছিলাম 'সত্যাগ্রহী' নামে সাপ্তাহিক-পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট। সন্ধ্যা হতেই যেন মাতালের মতো ছুটতাম 'সওগাত' অফিসের দিকে।

এই আসরে নিয়মিতভাবে সওগাত-কর্তৃপক্ষ জুগিয়ে যেতেন চায়ের পেয়ালা। পেয়ালায় তুফান উঠ্‌তো, আর মুখে তুবড়ি ছুটতো সকলের। বসে বসে রাজা-উজীর মারা হতো। কিন্তু এই সকল হালকা আলাপ-আলোচনা আর উৎকট রসিকতার ভেতর থেকেই জন্মলাভ করতো উচ্চচিন্তা আর উচ্চভাব। আর তা' ছড়িয়ে পড়তো পত্রিকার পাতায় পাতায়।

একদিন এমনি বসে বসে আলাপ চলছে, এমন সময় একজন প্রস্তাব করলেন, 'বার্ষিক-সওগাত' বার করা হোক্। প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে উহা সমর্থিত ও গৃহীত হয়ে গেলো।

'বার্ষিক-সওগাত' বার করা মুখের কথা নয়। ব্যয়সাপেক্ষ একটা বিরাট ব্যাপার।

যদিও অর্থাভাবে তখন মাসিক-সওগাত-ই নিয়মিত বার হতে পারছে না। সাহিত্যিকদের সকলকে টাকা দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না সওগাত-কর্তৃপক্ষের। তা' হলেও বার্ষিক-সওগাতের কাজ এগিয়ে চললো।

'বার্ষিক-সওগাত'কে সুষ্ঠুভাবে সাজাবার প্রচুর উপাদান সংগৃহীত ছিল। লেখা-সংগ্রহের দায়িত্ব কেউ কেউ নিলেন। নজরুলের কাছ থেকে লেখা আদায়ের পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হলো আমার উপর। সানন্দে

আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায় করা কি সোজা কথা?

নজরুল ইসলামের জীবন—আইন-না-মানা উচ্ছৃংখল জীবন। কিন্তু এই জীবনেও দেখেছি স্বভাব-সুন্দর কোমলতা। তাতে দেখেছি ধ্যানী-দরবেশের রূপ। সেখানে কোনো উচ্ছৃংখলতা ছিল না। ছিল না সেখানে উদ্দামতা। তাঁর এই মোহনীয় আর কমনীয় রূপের কাছেই আমরা সকলে বাঁধা পড়েছিলাম। শুধু আমাদের মতো ভক্তের দলের কথাই বলছি না। অনেকে নজরুল ইসলামকে হিংসে করতেন, আড়ালে-আবডালে নিন্দে করতেন, সামনে গেলে তাঁদেরও মুখ বন্ধ হয়ে যেতো। ষাঁড়ের মতো মোটা গলা বলে অনেকে গায়ক-মহলে তাঁকে কোণ-ঠাসা করবার চেষ্টা করতেন, সামনে গেলে তাঁরাই আনন্দে চীৎকার করে উঠতেন, তাঁর গান শুনে।

এর কারণ ছিল। যদিও কণ্ঠ তাঁর মোটা ছিল, তবুও যখন তিনি গাইতেন, একান্ত দরদ দিয়ে গাইতেন। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যে-সুর তাঁর ধ্বনিত হতো, তা' শ্রোতার অন্তরে গিয়ে আঘাত করতো। ফলে উৎসাহে আবেগে আনন্দ-ধ্বনি করতে তাঁরা বাধ্য হতেন।

গানে যেমন তিনি ফাঁকি দিতেন না, তেমনি লেখার বেলাও তাঁর কোনো ফাঁকি ছিল না। ফাঁকি দিয়েছেন তিনি সভার উদ্যোক্তাদের। সভাস্থল লোকে লোকারণ্য। ওঁর জন্য সবাই আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু নজরুলের দেখা নেই। এরূপ ঘটনা ঘটেছে একবার নয়, বহুবার।

লেখার বেলায় কিন্তু এরূপ ব্যাপার কখনো ঘটেনি। কোনোমতে তাঁর সামনে এক টুক্রো কাগজ এগিয়ে দিয়ে হাতে কলম গুঁজে দিলেই হলো। সুড় সুড় করে কোথা থেকে যে লেখা বেরিয়ে আসতো—ভেবে সবাই অবাক হয়ে যেতাম। যখন তিনি লিখতে বসতেন, তাঁর মুখে তখন ফুটে উঠতো ধ্যানী-দরবেশের রূপ। শত গোলমাল, হৈ-হুল্লোড়, চীৎকার আর দাপাদাপি তাঁর সে-ধ্যান ভাঙাতে

পারতো না। বড় বড় লেখাগুলো তাঁর কাছ থেকে আদায় করতে গিয়ে অনেক সময় কামরায় কাগজ-কলম আর চায়ের পেয়ালা দিয়ে তালা বন্ধ করতে হতো। কিন্তু ছোট ছোট লেখার জন্য কোনো আয়োজনই করতে হতো না।

'বার্ষিক-সওগাতে'র লেখার জন্য কয়েক দিন কোলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর যাতায়াত করলাম। তাঁকে সাধ্য-সাধনা করে নিরিবিলি বসানো কি সম্ভব? আজ সভা, কাল সমিতি, পরশু গানের মজলিস, তার পরের দিন দাবা খেলতে বসেছেন। তার পরের দিন কোথায় কোন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে আড্ডায় বসেছেন, একাদিক্রমে তিন দিন ধরে আড্ডাই চলছে। শেষে একদিন তিনি 'বার্ষিক-সওগাত' এই নামে একটি কবিতা দিলেন। কবিতাটি ভারী সুন্দর। রসে একেবারে টস্ টস্ করছে:

"বন্ধু গো সাকী আনিয়াছ নাকি বরষের সওগাত,—
দীর্ঘ দিনের বিরহের পরে প্রিয়-মিলনের রাত।
রঙ্গীন রাখী, শিরীন শারাব, মুরলী, রোবাব্, বীণ্,
গুলিস্তানের বুলবুল্ পাখী, সোনালি রূপালী দিন।
লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল্ নার্গিস-ফুলী আঁখ্,
ইস্পাহানীর হেনা-মাখা হাত, পাত্‌লি পাত্‌লি কাঁখ্!
নৈশাপুরের গুল্‌বদনীর চিবুক গালের টোল্,
রাঙা-লেড়কির ভাঙা ভাঙা হাসি, শিরীন্ শিরীন্ বোল।
সুর্মা-কাজল, স্তাম্বুলী চোখ্, বসোরা গুলের লালী,
নব বোগ্‌দাদী আলিফ-লায়লা শা'জাদী জুল্‌ফ্-ওয়ালী।....
আশা-ভরা মুখ, তাজা তাজা বুক, নৌ-জোয়ানীর গান,
দুঃসাহসীর মরণ-সাধনা, জেহাদের অভিযান।
আরবের প্রাণ, ফারেশের গান, বাজু নৌ-তুর্কীর,
দারাজ-দিলীর আফগানী দিল্, মূরের জখমী শির।

নীল দরিয়ায় মেসেরের আঁসু, ইরাকের টুটা তখ্‌ত্‌।
বন্দীশামের জিন্দান-খানা, হিন্দের বদ্‌বখ্‌ত্‌।—
তাঞ্জাম-ভরা আঞ্জাম এ যে কিছুই রাখনি বাকী,
পুরানো দিনের হাতে বাঁধিয়াছ নতুন দিনের রাখী।....
চোখের পানির ঝালর-ঝুলানো হাসির খাঞ্চাপোশ,
—যেন অশ্রুর গড়খাই-ঘেরা দিল্‌খোশ্‌ ফেরদৌস্‌—
ঢাকিও বন্ধু, তব সওগাতী-রেকাবী তাহাই দিয়ে,
দিবসের জ্বালা ভুলে যেয়ে চাই, রাতের শিশির পিয়ে!
বেদনার বানে সয়লাব্‌ সব, পাইনে সাথীর হাত,
আনগো বন্ধু নূহের কিশ্‌তি—"বার্ষিকী-সওগাত!"

যে-দিন এই লেখা নিয়ে হাজির হলাম 'সওগাত' অফিসে, সেদিন সবাই যেন উৎসাহে আবেগে নেচে উঠলেন। সান্ধ্য-আসরে ঘটা করে কবিতাটি পড়া হলো। চা যে এ-দিন কত কাপ উড়লো, তার লেখাজোখা নেই!

বন্ধুদের সবাই যেন শিশুর মতো লোভী হয়ে উঠলেন। এমন সুন্দর কবিতা পেয়ে আরও একটি পাবার জন্য সবাই লালায়িত। বললেন: "আরো একটা কবিতা আদায় করে আনতে হবে ভাই।"

মনে মনে আমিও খুব আনন্দবোধ করছিলাম। উৎসাহবোধ করছিলাম। রাজী হয়ে আবার একদিন গিয়ে হাজির হলাম কৃষ্ণনগরে।

মাসীমা আর ভাবী সাহেবার আদর-আপ্যায়নে মুগ্ধ-বিমুগ্ধ হয়ে কবির কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলাম। এ-কি চেহারা হয়েছে তাঁর? কিছু দিন থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগে কবির চেহারা হয়ে গেছে ফ্যাকাসে। এই কয়েক দিন আগে এসে 'বার্ষিক-সওগাত' কবিতাটি নিয়ে গেছি। তখন কবির চেহারা এত খারাপ দেখিনি।

একখানা বেতের চেয়ারে অবশ-অলস দেহ এলিয়ে চুপ করে বসে আছেন কবি। এ-অবস্থায় লেখার কথা তাঁকে কি করে বলি?

অথচ ঐ দিনই সন্ধ্যার ট্রেনে কোলকাতায় না ফিরলে নানা রকমের অসুবিধা। প্রথমতঃ 'বার্ষিক-সওগাতে'র ছাপার আয়োজন সম্পূর্ণ-প্রায়। লেখার জন্য আর দেরি করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ কবির বাড়ীতে পা দিয়েই তাঁর ঘরের আর্থিক অবস্থা আঁচ করেছি। এমন অবস্থায় কবির ওখানে এক বেলার বেশী আমার থাকাও চলে না। আমি যত তাড়াতাড়ি কোলকাতা ফিরতে পারবো, তত তাড়াতাড়ি কবিকে পাঠাবার জন্য কিছু টাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

কবির একান্ত আগ্রহে এবার কৃষ্ণনগরে আগমনের কারণ তাঁকে জানালাম। খানিকক্ষণ তিনি কি ভাবলেন। তারপর কাগজ আর কলম নিয়ে বসলেন। এক লাইন দু'লাইন করে লেখা তাঁর এগিয়ে চললো। দশ বারো লাইন পর্যন্ত লিখেছিলেন। তারপর কলম আর এগোয় না। ঠায় বসে আছি। দেখছি, কবি কাঁপছেন। থর্ থর্ থর্ কাঁপুনি। ভীষণভাবে জ্বর এলো তাঁর।

পাশের ঘর থেকে মাসীমাকে ডেকে নিয়ে এলাম। তিনি এসে কবিকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। তারপর একসঙ্গে দুটো লেপচাপা দিলেন। আর মুখে যা' বকুনি! বললেন: "দেখতো কি কাণ্ডো। এই ভীষণ জ্বর যাচ্ছে প্রতিদিন, তার ওপোর আবার লেখা! তোমরা যা' হয় করো বাপু, আমি ও-ঘরে গিয়ে বসি।"

অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে রইলাম আমি। কবি অতি কষ্টে মুখে মৃদু হাসি টেনে চুপ করে রইলেন।

কবিকে চেপে ধরে বসেছিলাম। হঠাৎ তিনি লেপের ভেতর থেকে মুখ বার করলেন। বললেন: "ঐ কাগজ আর কলমটা নিয়ে আয়।"

বিস্মিত হয়ে বললাম: "কি হবে কাগজ-কলম দিয়ে?"

বললেন: "লেখাটা এখন ভালো উৎরাবে।"

বললাম: "থাক এখন লেখা। জ্বর ছেড়ে যাক্—তখন না হয় চেষ্টা করবেন।"

কবি শুনলেন না।

অগত্যা কাগজ আর কলম এনে দিলাম পাশের টেবিলে থেকে। কলম তিনি ধরতে পারছেন না। হাত কাঁপছে তাঁর। নিরুপায় হয়ে কলমটা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন : "লেখ।"

অক্ষম অপুট হাত—ভয়ে আমি কেঁপে উঠলাম। বললাম : "কি করতে হবে বলুন।"

বললেন : "লেখ তুই, আমি বলে যাচ্ছি।"

কবির হুকুম তামিল করতে কোনো দিনই অস্বীকার করিনি। কবি বলে চললেন, আর আমি লিখে চললাম। ঘণ্টাখানেক পর জন্ম নিলো কবির বিখ্যাত কবিতা—"খালেদ"। এর মধ্যে দু' তিনবার এসে মাসীমা উঁকি মেরে গেছেন। কিন্তু কিছু বলেননি। লেখার সময় তিনি কোনো গোলমাল করেন না। এর মধ্যে দু'তিনবার পানিও খাইয়েছি কবিকে।

লেখাটা শেষ করে কবি যেন একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর লেপের তলায় চুপ করে পড়ে রইলো।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি, কবির ঘাম দিয়ে দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেছে। তিনি নির্জীব হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। পাশে পড়ে আছে—"খালেদ'। তার দিকে তৃষিত নয়নে চেয়ে আছেন কবি।

এর মধ্যে ভাবী সাহেবা এলেন—মাসীমা এলেন। খুশীতে সবারই মুখ ভরে উঠলো।

কি পরিস্থিতির ভেতর কি সুন্দর কবিতার জন্ম হলো! 'বার্ষিক-সওগাতে' যখন লেখাটা ছাপা হলো, সারা বাঙলা দেশে সেদিন অপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। এর পাণ্ডুলিপিখানা বহুদিন সযত্নে রক্ষা করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিনি।

এই 'খালেদ' কবিতা পেয়ে আমার বন্ধুরা খুশী হয়েছিলেন। বার্ষিক-সওগাতের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমি সেদিন গৌরব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলাম, আজও করি। কিন্তু মাসীমার কাছে

আমি ছোট হয়ে গেলাম। তাঁর ধারণা হলো: আমি অত্যন্ত খোদগরজ লোক—একান্ত স্বার্থপর।

কবি একদিন আড়ালে ডেকে আমাকে তাঁর এ-ধারণার কথা বলেছিলেন।

আমি বলেছিলাম: "মাসীমার চেয়ে আপনিই কি আমার মনের পরিচয় বেশী জানেন না—বেশী চেনেন না আপনি তাঁর চেয়ে আমাকে?"

তিনি হেসে বলেছিলেন: "জানি রে জানি। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাই জ্বরের মধ্যেও অমন কবিতা আমার কাছ থেকে তুই আদায় করেছিস, তাই তাঁর ওরূপ ধারণা হয়েছে। তাঁর ও-ধারণায় কি এসে যায়?"

আমার ওপর মাসীমার সেদিনের সে-ধারণা যে কত ভুল, তা' তিনি পরে অবিশ্যি বুঝেছিলেন। কারণ বারবার তিনি প্রমাণ পেয়েছিলেন, আমি নিজের জন্য, নিজের স্বার্থের জন্য কিছুই করি না। অন্য লোকের গরজে হয়তো কবির কাছে কোনো কাজে গিয়েছি। তার মধ্যে অবিশ্যি থাকে কবির নিজের স্বার্থই বেশী পরিমাণে জড়িয়ে।

আমি নিজে অর্থশালী লোক নই। অপরের মাধ্যমে যদি কবির অর্থকষ্টের কিছুটা লাঘব করা যায়, এটাই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য, আর আত্মতৃপ্তি।

যাক্ সে-সব কথা। কবির এই বিখ্যাত দুইটি কবিতা মহাআড়ম্বরে 'বার্ষিক-সওগাতে' বার হলো। তার ওপর সোনায় সোহাগা! ছবিতে ছবিতে বার্ষিক-সওগাত ভরে দেওয়া হয়েছিল। এতে প্রকাশ হলো: কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ মিলিয়ে মোট চব্বিশটি। ত্রিবর্ণ চিত্র দেয়া হলো পাঁচটি। আর একবর্ণ চিত্র দেয়া হলো এক শত চব্বিশটি। ব্যঙ্গ রেখা-চিত্র দেয়া হলো নয়টি।

"বার্ষিক-সওগাত" যেদিন বার হলো, সেদিন দেশের প্রত্যেকটি নর-নারী আনন্দিত হয়েছিল।

ইংরাজী ১৩ই জানুয়ারী ১৯২৭ তারিখে 'বার্ষিক-সওগাত'কে উপলক্ষ্য করে সওগাত-কর্তৃপক্ষ এক প্রীতি-সম্মেলনে সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী সবাইকে ডাকলেন। কলকাতায় অবস্থিত প্রায় গুণীলোকই সেদিন এই সম্মেলনে এসেছিলেন সওগাত-অফিসে।

কবি নজরুল অসুস্থ থাকায়, এই সম্মেলনে যোগ দিতে পারেননি। তাঁর 'বার্ষিক-সওগাত' ও 'খালেদ' কবিতা সম্মেলনে খুব ঘটা করে পড়া হলো।

এই সম্মেলনে এ-কথা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে তরুণ-দলের জয়যাত্রা বেশ সার্থকতার সাথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। কারণ দলমতনির্বিশেষে সবাই এই আনন্দ-মিলনে যোগ দিয়ে নিজেদের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন।

নজরুলের অর্থ-সংকটে বন্ধুরা

আমাদের কারুরই অবস্থা ভালো ছিল না। 'নিত্য ভিক্ষা তনুরক্ষা' অবস্থা। আমরা নজরুল ইসলামের কথা ভাবতাম— তাঁর আর্থিক দুর্গতির কথা ভাবতাম। কি করে তাঁর আর্থিক-সমস্যার সমাধান করা যায়, এই নিয়ে গবেষণা করতাম।

একবার খবর পেলাম নজরুলের আর্থিক দুর্গতি এমন চরম সীমায় এসে পৌঁছেছে যে, দিন আর চলে না। স্ত্রী নিয়ে তিনি কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) থাকেন, কোনো কোনো দিন তাঁর উপোস অবস্থা!

'সওগাতে'র আড্ডায় আমাদের কনফারেন্স বসলো, কি করা যায়। এই প্রতিভাকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের মতো অর্থহীন মানুষেরা কি করতে পারে? অনেক বিচার-বিবেচনা, অনেক গবেষণা করে আমরা ঠিক করলাম: এলবার্ট হল বা আর কোথাও একটা Variety entertinment এর আয়োজন করে এককালীন কিছু আর্থিক সাহায্য আমরা তাঁকে করতে পারি। নামকরা গাইয়ে, নাচিয়েদের অনেকেই নজরুল-ভক্ত। বিনা পারিশ্রমিকে অনেকেই হয়তো এতে যোগ দিতে পারেন। যথা প্রস্তাব—তথা কাজ। এর প্রাথমিক আয়োজনের খরচের টাকা আমরা নিজেদের ভেতর থেকে চাঁদা তুলে মেটাবো বলে ঠিক করলাম।

কিন্তু দিন শুধু পিছিয়ে যেতে লাগলো। কারণ যাঁরা এ-ব্যাপারে অতি আগ্রহশীল—তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত।

সকল কাজ ফেলে শুধু এই এই ব্যাপারে সময় দিতে পারে, এমন লোক কোথায়? এমনি সময় নজরুল আমাকে নিচের চিঠিখানা লিখলেন:

খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন
'সত্যাগ্রহী অফিস'
১০-৩, মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা। কৃষ্ণনগর
১০-২-২৭

স্নেহভাজনেষু,

মঈন! বহুদিন তোকে আর পত্র দিতে পারিনি। আবার জ্বরে পড়েছিলাম। কাল জ্বরশয্যা ছেড়ে উঠেছি। আজও "গাজী আঃ করিম" কবিতাটা শেষ করতে পারিনি জ্বরের জন্য। আজ কিম্বা কাল শেষ করবো ইচ্ছা আছে। জ্বরে আমার শরীর ও মনের ক্ষতি-ই করলে না শুধু, কাব্যেরও বড় ক্ষতি করলে। নাসিরউদ্দীন সাহেব না জানি কী মনে করেছেন। তুই বুঝিয়ে বলিস তাঁকে, তাঁকে আলাদা চিঠি দিলাম না। একেবারে কবিতার সাথে চিঠি দেবো বলে অপেক্ষা করছি। তিনি এতদিন বোধ হয় বাড়ী হতে ফিরেছেন। ফাল্‌গুনের সওগাতের কত দূর? এখানে আর সব ভাল। হ্যাঁ, variety entertainment-এর কত দূর করলি, জানাবি। যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল আমার পক্ষে। কেন না আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে। আর সপ্তাহ খানিকের মধ্যে কি পারবিনে? নাসির সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে জানাস। আমি সেইরূপভাবে প্রস্তুত হব। আশা করি ভাল আছিস। অন্যান্য খবর দিস। স্নেহাশীষ নে। —ইতি

শুভার্থী
নজরুল

এ-চিঠিখানা 'সওগাতে' গিয়ে বন্ধুদের সবাইকে দেখলাম। সবার মনেই যেন নবচেতনার সঞ্চার হলো। তাই তো! বেচারীকে সময়ে

সাহায্য করতে না পারলে, সে সাহায্যের দাম থাকবে কোথায়? নিজেদের কাজের ক্ষতি করেও সবাই উৎসবের আয়োজনে মেতে উঠলাম। হ্যাণ্ডবিল ছাপানো হলো, পোস্টার ছাপানো হলো, রসিদ বই ছাপানো হলো। সে কী উৎসাহ, সে কী উদ্যম! প্রাণের প্রাচুর্যে আমরা যেন এখন ফেটে পড়ছি!

এরিয়া ভাগ করে এক-এক জনাকে এক-একখানা রসিদ বই দেয়া হলো। বলা হলো: এর ভেতরে যার যা' সংগ্রহ হবে, সব নাসিরউদ্দীন সাহেবের হাতে এনে দিতে হবে। কিন্তু রসিদ বই আর পরবর্তী সংগ্রহের টাকা উৎসবের দিন বেলা পাঁচটার আগে এলবার্ট হলে জনাব নাসিরউদ্দীন সাহেবের কাছে দাখিল করতে হবে— without fail.

সমস্ত হল লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের স্থান নেই। বন্ধুদের অনেকে ডায়াসের ওপর নজরুলকে আর অন্যান্য আর্টিস্টদের ঘিরে বসে আছেন। সবারই চোখে-মুখে আনন্দের দীপ্তি। একটু পরেই নজরুলের গান আরম্ভ হবে।

নাসিরউদ্দীন সাহেব একান্তে আমাকে হলের এক কোণে ডাকলেন। বললেন: "একটা কাজ যে বড় খারাপ হয়ে গেলো!"

চিন্তিত চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। বললাম: "কি ব্যাপার?"

নাসিরউদ্দীন সাহেব বললেন: "সবাই তো টাকা আর রসিদ-বই ফেরত দিয়ে গেলেন। কিন্তু ঢাকার সে ভদ্রলোক কোথায়? তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না। রসিদ-বই পাবার পর তিনি আর আমার সাথে দেখা করেননি।"

চমকে চেঁচিয়ে উঠলাম: "তাই নাকি? দাঁড়ান, যেখানে থাক, ওঁকে খুঁজে বার করতেই হবে।"

নাসিরউদ্দীন সাহেব মুখে আমার হাতচাপা দিলেন। বললেন: "চুপ চুপ—আস্তে। এখন এ-কথা প্রকাশ হয়ে গেলে সব আয়োজনই

পঙ্গু হয়ে যাবে। সবারই তাজা রক্ত—হৈ চৈ করে একটা কাণ্ডই বাধিয়ে ফেলবে। উৎসব শেষে ওঁকে খুঁজে বার করতে হবে। আর এ ভার আপনাকেই নিতে হবে।"

মনটা বড় দমে গেলো। কোনো কাজেই আর উৎসাহ দেখাতে পারছিলাম না। বিষণ্ণচিত্তে যখন ডায়াসের এক কোণে গিয়ে চুপ করে বসলাম, বন্ধুরা অবাক হয়ে গেলো। হয় তো ভাবলো: এই উৎসাহী হাস্যচঞ্চল লোকটি এমন মুষড়ে পড়লো কেন? অতিরিক্ত খাটুনিতে, না, অন্য কিছু? অনেকে এ-কথা জিজ্ঞাসাও করলেন। কিন্তু কাকেও কিছু না বলে চুপ করেই রইলাম।

আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে ভালোভাবেই উৎসব শেষ হয়ে গেলো। যে-টাকা উঠেছিল, পরিমাণে তা খুব বেশী বলা চলে না। নজরুলকে সব টাকা দিয়ে দেয়া হলো।

সেই রাত্রেই ঐ ভদ্রলোকের খোঁজে বার হলাম। কোথায় তিনি? তিনি কয়েক দিনের জন্য ঢাকা থেকে কোলকাতায় গিয়েছিলেন বেড়াতে। নজরুল-ভক্ত বলে নিজেকে প্রচার করেছিলেন। অনেক উৎসাহ-উদ্যমের কথা বলেছিলেন। এ জন্য তাঁকে বিশ্বাস করে রসিদ বই দেয়া হয়েছিল। নতুবা আমাদের কারো সাথেই তাঁর তখন তেমন মাখামাখি পরিচয় ছিল না। কোথায় খুঁজে পাবো তাঁকে? যে-বাসায় গিয়ে তিনি উঠেছিলেন, সেখানে তিনি নেই। সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় খোঁজ নেয়া হলো কিন্তু কোন পাত্তা তাঁর পাওয়া গেলো না।

তিন দিন পর। তালতলার এক গলি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে আরও দুটি বন্ধু। বেলা প্রায় আটটা। কারা ছিলেন, এখন ঠিক মনে পড়ছে না। দেখলাম: একটি লোক একটা বাড়ীর খোলা রোয়াকে পড়ে ঘুমুচ্ছেন। অত্যন্ত জীর্ণ দশা, একখানা মলিন ধুতিমাত্র পরিধানে। তার এক অংশ গায়ে দিয়ে তিনি অকাতরে ঘুমিয়ে আছেন। সন্দেহ হলো। ভাবলাম: সেই ভদ্রলোক নয় তো? এগিয়ে যেতেই দেখলাম—যা' ভেবেছি তা-ই।

বাঘের মত গর্জে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। বললাম: "কোথায় পালাবে দোস্ত! এক্ষুণি তোমাকে সওগাত অফিসে যেতে হবে।"

জেগে উঠে লোকটি আমাদের দেখে ঘাবড়ে গেলো। দেখলাম: তার খালি গা, খালি পা, উস্কো-খুস্কো চুল, চোখ দুটি জবা ফুলের মতো লাল।

বললাম: "ব্যাপার কি? এ অবস্থায় কেন?"

তিনি যা' কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করলেন, তা শোনার ধৈর্য আমাদের ছিল না।

বললাম: "চলুন, সওগাত অফিসে—সব শোনা যাবে।"

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন: "না ভাই, আমার সেখানে যাওয়া হবে না।" —তারপরেই তিনি দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। আমরা পিছু ধাওয়া করেছিলাম কিন্তু ধরতে পারি নি।"

তারপর থেকে তাঁর সাথে আর আমার দেখা হয়নি। দেখলে তাঁকে এখন চিনতে পারবো কিনা তা-ও জানি না। হয়তো এখন তিনি বেশ স্বচ্ছন্দে আছেন।

এই সময় ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজের 'বার্ষিক-সম্মেলন' আহূত হয়। আর তাতে কৃষ্ণনগর থেকে নজরুলকে নিয়ে যাওয়া হয়। সাহিত্য-সমাজের এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তাসাদ্দুক আহমদ সাহেব। নজরুল এর জন্য উদ্বোধন সংগীত লিখেছিলেন। লিখেছিলেন তিনি ঢাকা যাওয়ার পথে পদ্মাবক্ষে, ষ্টীমারে বসে, ইংরাজী ২৭-২-১৯২৭ তারিখে। এই গানটি যখন সভায় তিনি গাইলেন, তখন সেখানে এক নব-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। সে উদ্দীপনার ধাক্কা এসে লেগেছিল সওগাত অফিসে, আমাদের সান্ধ্য-আসরে, আর কোলকাতার অলিতে-গলিতে। গানটি এই:

'খোশ্ আমদেদ'

"আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি।
ও-চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি॥

দখিণের হাল্‌কা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতী।
শবে'রাত আজ উজালা গো আঙ্গিনায় জ্বলল দীপালি॥
তালিবন ঝুম্‌কি বাজায়, গায় "মোবারক-বাদ" কোয়েলা।
উলসি উপ্‌চে প'ল পলাশ অশোক ডালের ঐ ডালি।
প্রাচীন ঐ বটের ঝুরির দোল্‌নাতে হায় দুলিছে শিশু॥
ভাঙ্গা ঐ দেউল-চূড়ে উঠল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি॥
এল কি অলখ্‌-আকাশ বেয়ে তরুণ হারুণ-আল্‌-রাশীদ।
এল কি আল্‌বেরুণী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী॥...
....খুশীর এ বুল্‌বুলিস্তানে মিলেছে ফরহাদ ও শিরিঁ।
লাল এ লায়লি-লোকে মজনু হর্দম চালায় পেয়ালী॥
বাসিফুল কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলি রে ফুল-মালি।
নবীনের আসার পথে উজাড় ক'রে দে ফুল ডালি॥"

অধ্যক্ষ সাহেবের পত্র

১৯২৭ সালের শেষের দিকে একদিন আমরা সওগাত অফিসে মজলিস করে বসে আছি। আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এবং আরো কয়েকজন ছিলেন সে মজলিসে। মধ্য-মণি হয়ে বসে আছেন নজরুল। কথায় কথায় হঠাৎ কবি বললেন: "করটিয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ সাহেব আমাকে একখানা পত্র লিখেছিলেন অনেক দিন আগে। দীর্ঘ পত্র। এ-পর্যন্ত তার জওয়াব দেয়া হয়নি।"

আড্ডার মোড় ঘুরে গেলো। নতুন আলাপের সন্ধান পেয়ে সবাই যেন ক্ষেপে উঠলেন। বললেন: "কৈ চিঠি? কোথায় সে চিঠি?"

কবি বললেন: "চিঠিখানা আমি খুব যত্ন করে রেখেছি। আপনাদের দেখাবো বলে আজ সঙ্গেই এনেছি।"

তিনি চিঠিখানা পকেট থেকে বের করে সবার সামনে ধরলেন। সবাই যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ওর ওপর। টানাটানি করতে গিয়ে ওর একটা কোণ বোধহয় ছিঁড়েও গিয়েছিল।

পত্রখানা কবিই পড়লেন। এতে ভাগ্যহীন মুসলমান সমাজের অগ্রগতিকে জোরালো করবার জন্য কবিকে নিশানবরদার হতে আহ্বান করা হয়েছিল।

সবাই প্রায় একযোগে বলে উঠলেন: "এ-চিঠিখানা সওগাতে প্রকাশ করা হোক।"

কিছু দিন থেকেই রক্ষণশীলদল—বিশেষ করে ধর্মান্ধ মুসলমানদের

তরফ থেকে নজরুলের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল। এই সময় প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পত্রখানা নজরুল-সমর্থনের যে সুর বহন করে নিয়ে এলো, তা' ঐ আন্দোলনকে ব্যাহত করতে হয়তো কিছুটা সাহায্য করতে পারে। বিশেষ করে তিনি এই পত্রে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, তাতে মনে হলো, সারা মুসলিম-তরুণের মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন তিনি।

তাই অনেকে পত্রখানা সাধারণ্যে প্রকাশ করতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। কিন্তু এক দিকের মনোভাব জানলে তো শুধু চলবে না। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের বক্তব্য সম্বন্ধে কবির মনোভাব কি, তা-ও জানা দরকার। শুধু মৌখিক আলোচনায় এ-সব হয় না। তাই আসরের কেউ কেউ বললেন: প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পত্রখানার জওয়াব কবির লেখা উচিত। আর তা-ও এই সঙ্গে প্রকাশ করা উচিত। সবাই হর্ষধ্বনি করে এ-কথার সমর্থন করলেন।

এরপর প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পত্রখানা উত্তরসহ যথাসময়ে 'সওগাতে' প্রকাশিত হলো। এই দু'খানা পত্র সেদিন সারা বাঙলা দেশে একটা বিরাট আলোচনার সৃষ্টি করেছিল। রক্ষণশীলদের নেতৃবৃন্দ 'উল্টো বুঝলি রামে'র দশায় সম্ভবতঃ পড়েছিলেন। তাই উভয়কেই সেদিন তাঁদের বিষ দৃষ্টিতে নতুন ক'রে পড়তে হয়েছিল। পত্র দু'খানার একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে বিবেচনা করে নিচে তা' হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের পত্রখানা এই:

ভাই নজরুল ইসলাম,

তোমায় কখনো দেখিনি। অনেকবার দেখা করার সুযোগ খুঁজেছি, সে সুযোগ ঘটে ওঠে নাই,— দূর হতে শুধু তোমার লেখা পড়েছি মুগ্ধ হয়েছি, অন্তরের অন্তস্থল হতে ঐ প্রতিভার কাছে বার বার মস্তক নত করেছি, আর আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছি, "প্রভো, এ কাঙ্গাল বাঙ্গালা মুসলিম-সমাজকে যদি একটি রত্ন দিয়েছ একে রক্ষা

ক'রো—সমাজকে দিয়ে ওর কদর করে নিও।" তোমায় এত আপন ভাবি, এত কদর বলেই আজ অকুণ্ঠীতচিত্তে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছি। তোমার গুণমুগ্ধ, তোমার প্রীতি-আকাঙ্ক্ষী, তোমার ভক্ত ভাই-এর এ আবদার তুমি রক্ষা করবে তা-ও জানি।

আজ তোমার কয়টি কথা বলব,—গুরুরূপে নয়, ভাইরূপে, ভক্তরূপে। এ-কথাগুলি বলব বলে অনেকবার তোমার সাক্ষাৎ খুঁজেছি, পাই নাই; কিন্তু কথাগুলিও বুকের তলে অনুদিন তোলপাড় করছে, তাই পত্র মারফতেই বলতে চেষ্টা করছি।

আমি আগেই বলেছি বাঙ্গলার মুসলমান সমাজ কাঙ্গাল; শুধু ধনে নয়, মনেও। তাই বাঙ্গলার অ-মুসলমানরা তোমার যে-কদর করেছেন, মুসলিমরা তা' করেন নাই, করতে শেখেন নাই। এ-কথা ভেবে অনেক সময় লজ্জায় মাথা নত করেছি, সমাজকে নিন্দা করেছি, বন্ধু-মহলে রোষ প্রকাশ করেছি। কিন্তু সে শুধু-নিন্দায় ফায়দা কি? শুধু-আস্ফালনে ফল কি? সমাজ যে পতিত, দয়ার পাত্র, তাই সেই ভাবে তাকে কখনও স্নেহের হাত বুলিয়ে, কখনও জোরে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে, পথে আনতে হবে। আর তাদের কাছে ত আমার সে আবদারের অধিকার নাই, যে-আবদার তোমার কাছে আমি করতে পারি; তাই এবার সমাজকে ছেড়ে তোমার দিকে ফিরছি। সমাজ মরতে বসেছে। তাকে বাঁচাতে হলে চাই সঞ্জীবনী-সুধা;—কে সেই সুধার পাত্র হাতে এনে এই মরণোন্মুখ সমাজের সামনে দাঁড়াবে, কোন সু-সন্তান আপন তপোবলে গঙ্গা আনয়ন ক'রে এ-অগণ্য সগর-গোষ্ঠীকে পুনর্জীবন দান করবে, কাঙাল সমাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে করুণ নয়নে সেই প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। কে জানি না; কিন্তু মনে হয়, তোমায় বুঝি খোদা সে সুধাভাণ্ডের কিঞ্চিৎ দান করেছেন, অন্তরের অন্তরালে বুঝি সে-সাধনার বীজ জমা আছে। হাত বাড়াবে কি? একবার সাহসে বুক বেঁধে সে তপশ্চারণে মনোনিবেশ করবে কি?

সুদূর অতীত ইতিহাসের প্রান্তসীমার ওপার হ'তে যে অস্পষ্ট,

অর্ধশ্রুত মায়াধ্বনি ভেসে আসে, সে কবির কণ্ঠস্বর!—কবি যে যুগে যুগে সত্যের গীতি, কল্যাণের গীতি, বিরাট অনন্ত মহাজীবনের নিগূঢ় ভিত্তি কর্মের উদ্বোধন-গীতি গেয়ে এসেছে। স্নেহ-বাৎসল্য-ভরপুর মাতৃ-ক্রোড়ে আধনিমিলীত আঁখি শিশুর শয্যাপার্শ্বে, নবীন-নবীনার মিলন-তীর্থ বিবাহ-বাসরে, ধর্মযাজকের উন্নত বেদীতে, কর্মবীরের উলঙ্গ অসি-বর্শার রঙ্গ-ভূমি যুদ্ধক্ষেত্রে, সমর-শেষে বিজয়ের উল্লাস নিনাদে, শহিদের শোকে, নিহতের কল্যাণ-কামনায়, মহাযাত্রীর সমাধি-ধারে কবির লীলায়িত বাণী-ধ্বনি যুগে যুগে ঝঙ্কৃত হয়েছে; মহামানবের মনোজ্ঞ ক'রে যখনই তিনি যে বাণী প্রচার করতে চেয়েছেন, তিনি যত বড় মহাসত্যই প্রচার করুন না, তিনি কবির লালিত্যে মধুর করে তা' বলতে চেয়েছেন—বলেছেন। কারণ বিশিষ্ট শক্তি-স্ফুরিত স্বল্প-সংখ্যক বিশেষজ্ঞ রসশূন্য নির্মম বাণীর মর্যাদারক্ষা করতে পারেন, কিন্তু বিশ্বমানবের চিত্ত স্পর্শ করতে হলে সেই ভাব-উদ্বেল-চঞ্চল-তরঙ্গায়িত বচন-প্রবাহেই করতে হবে, যাকে ধরবার জন্য খোদাতা'লার স্থাপিত রাজধানীর দুই পার্শ্বের বেতার স্টেশন দুইটি অনুদিন এত উদ্‌গ্রীব এবং যার মৃদু আঘাতে প্রাণের বীণার নীরব তারে সহসা আকুল রাগিণীঝঙ্কার জেগে উঠে মানবদেহের স্নায়ুর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে উন্মাদনার তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়ে দেয়। তুমি সেই কবিদের একজন, তোমার কণ্ঠে সেই সঞ্জীবনী-সুধার উন্মাদনা আছে।

কিন্তু ভাই, তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, কোন্ ব্রতে তোমার সে কণ্ঠস্বর তুমি নিয়োজিত করেছ? তোমার প্রতিভা অদ্ভুত, কিন্তু তার চেয়ে গুরুতর তোমার দায়িত্ব! কড়ির মালিক যে, তার নিকাশ না নিলেও বড় আসে যায় না, কিন্তু মাণিকের মালিকের নিকাশ দিতেই হবে, তোমার প্রতিভাকে ত তোমায় সার্থক করতেই হবে।

কোন্ পথে সে-সার্থকতার অন্বেষণ করবে? বিদ্রোহে? উত্তম, কিন্তু বিদ্রোহকেও সুনিশ্চিত উদ্দেশ্যযুক্ত করতে হবে,—শুধু তোমার 'যখন চাহে এ মন যা' 'উন্মাদ' ঝঞ্ঝার মত চললে তোমার জীবনের

সার্থকতার নৈকট্য কোথায়? তৈমুরের বিরাট দুর্বার অভিযানের দিকে আমরা বিস্ময়ে চেয়ে থাকি, তারপর ক্লান্ত চোখ ফিরিয়ে নিই, তারপর তার কথা ভুলে যাই; কিন্তু বাবরের ক্ষুদ্রতর অভিযানের কথা ভুলতে পারি না।—তাঁর অভিযান আমাদিগকে দিয়েছে—দিল্লী, আগ্রা, ময়ুরাসন, সর্বোপরি দিয়েছে তাজমহল। তোমার কাছে আমার চাই বাবরের অভিযান, যে অভিযানের দক্ষিণে, বামে, অগ্রে পশ্চাতে নবসৃষ্টির সৌধ গড়ে ওঠে।

বাঙ্গলার মুসলিমরা তোমার সম্যক কদর করে নাই, কিন্তু তাই কি তাদের তুমি ছেড়ে যাবে? তোমার ক্ষেত্র মুসলিম-সাহিত্যে—বাঙ্গালী মুসলিম চেয়ে আছে তোমার কণ্ঠ দিয়ে ইসলামের প্রাণবাণী পুনঃ প্রতিধ্বনিত হবে, ইসরাফীলের শিঙ্গার মত সেই প্রতিধ্বনি এই নিদ্রিত সমাজকে মহা আহ্বানে জাগ্রত করবে। বাঙ্গলার আর দশজন কবির মত যদি তুমি কবিতা লেখ, তবে তোমার প্রতিভা আছে, স্থায়ী আসন তুমি পাবে, কিন্তু সে-আসন মাত্র, সিংহাসন নয়, আজ বাঙ্গলার মুসলমান সাহিত্যরাজ্যে সিংহাসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি শুধু দখল করলেই হয়। মধুসূদন যদি শুধু ইংরাজী কাব্যই লিখতেন, তবে হয়ত একজন বায়রণ হতে পারতেন, কিন্তু মধু-চক্র রচয়িতা হতে পারতেন না। কিন্তু আমি শুধু যশের, শুধু প্রতিষ্ঠার দিক দিয়া এ-প্রশ্নের বিচার করছি না। আমার বক্তব্য এই, যেখানে দশটা অভাব আছে, সেখানে যদি সব অভাবগুলি একসঙ্গে দূর না করা যায়, তবে যেটি সবচেয়ে বড় অভাব, সেইটি আগে দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

এখন বিচার করতে হয়, তুমি বাঙ্গালী, তুমি কবি, তুমি মুসলমান, বাঙ্গলার কোন্ কল্যাণসাধনে তোমার আগে অগ্রসর হওয়া দরকার।

বাঙ্গালীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ, সবচেয়ে বেশী আত্মভোলা তোমারই ভাই এই মুসলিমগণ। আর বাঙ্গলা সাহিত্যে সবচেয়ে কলঙ্কিত, সবচেয়ে নিন্দিত, কু-লিখিত বিষয় ইসলাম। যিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে ইসলামের সত্যসনাতন নিষ্কলঙ্ক চিত্র দান করবেন, যিনি "এই

সব মূক ম্লান মুখে" ভাষা দিবেন, "এই সব ভগ্ন শুষ্ক শ্রান্ত বুকে" আশা ধ্বনিয়ে তুলবেন, যিনি ইসলামের সত্যস্বরূপ দেশের সম্মুখে ধরে মুসলিমের বুকে বল দেবেন, অ-মুসলিমের বুক হতে ইসলাম-অশ্রদ্ধা দূর করতঃ হিন্দু-মুসলমান মিলনের সত্য ভিত্তির পত্তন করবেন, তিনিই হবেন বর্তমানে শ্রেষ্ঠতম দেশ-হিতৈষী, তিনিই হবেন বাঙ্গালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূত। তুমি চেষ্টা করলে তাই হতে পার, তুমি সেই মহা গৌরবের আসন দখল করতে পার। তুমি এইরূপে তোমার কবি-প্রতিভাকে, তোমার জীবনকে, তোমার মানবতাকে সহজতমরূপে সার্থক করতে পার।

আরো এক কথা। এই বাঙ্গালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূতরূপে যে তুমি আসবে, সে কোন্ পথে? বিদ্রোহের পথে? আমার মনে হয়, না, তা নয়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, Line of least resistance বা লঘুতম বাধার পথে অগ্রসর হওয়া সমীচীন। ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কিছু নাই, ইসলাম আধুনিকতম উন্নততম ধর্ম, তবে যে বাঙ্গলার মুসলিমরা অনেক কুসংস্কারে পড়েছে, সে ইসলামের দোষ নয়, এই হতভাগারা ইসলামের সাথে ঐ কুসংস্কারগুলি পোষণ করছে। এখন এই কুসংস্কারগুলি দূর করতেই হবে কিন্তু সেগুলি যে ইসলামের অনুশাসন নয় বরং ইসলামের বিরুদ্ধ মত, এই বলে সেগুলির নিন্দা করতে হবে—ইসলামকে, ইসলামের কোন অনুষ্ঠানকে নিন্দা করে নয়। কারণ যারা কুসংস্কারে ডুবে ইসলামের পবিত্র নামে হয়ত অজ্ঞাতে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করছে, তারাও ইসলামের নিন্দা সইতে পারে না, সুতরাং ইসলামের নিন্দার নামে খুব ভালো কথা বললেও তারা শুনবে না, যাদের শুনবার জন্য বলা, তারাই যদি না শুনে, তবে সে-বলায় লাভ কি? কিন্তু মুসলিমদের একটা গুণ আছে, সে ধর্মের নামে পাগল হয়; তাই সে হাফিজ-রুমীকে সত্য-সাধক বলে বরণ করে নিয়েছে; তাই সে শেখ সাদীকে দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজে আদর্শ করেছে। তোমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা

'বিদ্রোহী' হয়েছিলেন, তাঁদেরই একজন তোমার 'সুবেহ উম্মিদ' পড়ে আনন্দে গর্বে লাফিয়ে উঠেছিলেন,—আর নাচতে নাচতে এসে আমায় বলেছিলেন, নজরুল যদি এমনি ধারা লিখত, তবে বাঙ্গলার আলিমরা যে তাকে মাথায় করে রাখত (যিনি বলেছিলেন, তিনি একজন আলিম)। এ-কথা কয়টি তোমায় ভেবে দেখতে বলি। বাঙ্গলার মৌলানা রুমীর আসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি তাই দখল করে ধন্য হও, বাঙ্গলার মুসলিমকে, বাঙ্গলার সাহিত্যকে ধন্য কর।

তাই আজ বড় আশায়, বড় ভরসায়, বড় সাহসে, বড় মিনতির স্বরে তোমায় বলছি,—ভাই কাঙাল মুসলিমের বড় আদরের ধন তুমি, তুমি এই দিকে পতিত মুসলিম-সমাজের দিকে, এই অবহেলিত ইসলামের দিকে একবার চাও ; তাদের ব্যথিতচিত্তের করুণ রাগিণী—তোমার কণ্ঠে ভাষা লাভ করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলুক, তাদের সুপ্ত প্রাণের জড়তা তোমার আকুল আহ্বানের উন্মাদনায় চেতনাময়ী হউক, ইসলামের মহান উদার উচ্চ আদর্শ তোমার কবিতায় মূর্তি লাভ করুক, তোমার কাব্য-সাধনা ইসলামের মহানীতিতে চরম সার্থকতায় ধন্য হোক। আমীন!

অনেক কথা বলে ফেললাম ভাই—মাফ করো। ভাইয়ের কাছে ভাই যদি এমন প্রাণ খুলে কথা না বলবে, তবে বলবে কোথায় ?"

নজরুল ইসলাম পত্রখানার উত্তর দেন এভাবে ঃ

শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপ্যাল ইবরাহিম খান সাহেব!

আমাদের আশি বছরে নাকি স্রষ্টা ব্রহ্মার একদিন। আমি অত বড় স্রষ্টা না হলেও স্রষ্টা তো বটে, তা আমার সে-সৃষ্টির পরিসর যত ক্ষুদ্র পরিধিই হোক। কাজেই আমারও একটা দিন অন্ততঃ তিনটে বছরের কম যে নয়, তা' অন্য কেউ বিশ্বাস করুক চাই না করুক, আপনি নিশ্চয়ই করবেন।

আপনার ১৯২৫ সালের লেখা চিঠির উত্তর দিচ্ছি ১৯২৭ সালের আয়ু যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন। এমনও হতে পারে ১৯২৭-এর সাথে

সাথে হয়ত বা আমারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে তাই আমি আমারও অজ্ঞাতে কোনো অনির্দেশের ইঙ্গিতে আমার শেষ বলা বলে যাচ্ছি আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার সুযোগে। কেন না আমি এই তিন বছরের মধ্যে কারুর চিঠির উত্তর দিয়েছি, এত বড় বদনাম আমার শত্রুতেও দিতে পারবে না—বন্ধুরা তো নয়ই। অবশ্য আয়ু আমার ফুরিয়ে এসেছে—এ সুসংবাদটা উপভোগ করবার মত সৎসাহস আমার নেই, বিশ্বাসও হয়ত করিনে; কিন্তু আমারই স্বজাতি অর্থাৎ কবি জাতীয় অনেকেই এ-বিশ্বাস করেন এবং আমিও যাতে বিশ্বাস করি—তার জন্যে অর্থ ও সামর্থ ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণেই করছেন। কিন্তু আমার শরীরের দিকে তাকিয়ে, তাঁরা যে নিঃশ্বাস মোচন করেন, তা হ্রস্ব নয় এবং সে নিঃশ্বাস বিশ্বাসীরও নয়। হতভাগা আমি, তাঁদের এই আমার প্রতি অতি মনোযোগ নাকি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনে—মন্দলোকে এমন অভিযোগও করেছে তাঁদের দরবারে।

লোকে বললেও আমি মনে করতে ব্যথা পাই যে তাঁরা আমার শত্রু! কারণ, একদিন তাঁরাই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আজ যদি তারা সত্যি সত্যিই আমার মৃত্যু কামনা করেন, তবে তা আমার মঙ্গলের জন্যই, এ আমি আমার সকল হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি। আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি—তাদের হাতের আঘাত যত বড় এবং যতই বেশীই পাই। মানুষের মুখ উল্টে গেলে ভূত হয়, বা ভূত হলে তার মুখ উল্টে যায়, কিন্তু মানুষের হৃদয় উল্টে গেলে সে যে ভূতের চেয়েও কত ভীষণ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র হয়ে ওঠে তা-ও আমি ভাল করেই জানি। তবু আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি—ভালবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি, কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধূলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করবে, চির-রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধূলোর নীচে স্বর্গ টেনে আনবে এ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রুজলে আমি আমাকে অনুভব করি, এ আমি

একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, এই ব্যথিতের অশ্রুজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি নাই পারি, ওদের সাথে প্রাণভরে যেন কাঁদতে পাই!

কিন্তু এ ত আপনার চিঠির উত্তর হচ্ছে না। দেখুন, চিঠি না লিখতে লিখতে চিঠি লেখার কায়দাটা গেছি ভুলে। তাতে করে কিন্তু লাভ হয়েছে অনেক। যদিও চোখ-কান বুজে উত্তর দিয়ে ফেলি কারুর চিঠির, সে উত্তর পড়ে তাঁর প্রত্যুত্তর দেবার মত উৎসাহ বা প্রবৃত্তির ইতি ঐখানেই হয়ে যায়। কেন না সেটা তাঁর চিঠির উত্তর ছাড়া আর সব কিছুই হয়। এ-বিষয়ে ভুক্তভোগীর সাক্ষ্য নিতে পারেন। সুতরাং এটাও যদি আপনার চিঠির উত্তর না হয়ে আর কিছুই হয়, তবে সেটা আপনার অদৃষ্টের দোষ নয়, আমার হাতের অখ্যাতি।

আমাদের দেখা না হলেও শোনার ত্রুটি কোনো পক্ষ থেকেই ঘটেনি দেখছি। আপনাকে চিনি, আপনি আমায় যতটুকু চেনেন তার চেয়েও বেশী করে; কিন্তু জানতে যে আজও পারলাম না, তার জন্য অভিযোগ আমার অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাকে করব বলুন। এতদিন ধরে বাঙলার এত জায়গা ঘুরেও যখন আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল না, তখন আর যে হবে সে আশা রাখিনে। বিশেষ ক'রে—আজ যখন ক্রমেই নিজেকে জানাশোনার আড়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এ ভালই হয়েছে—অন্ততঃ আপনার দিক থেকে। আমার দিকের ক্ষতিটাকে আমি সইতে পারব এই আনন্দে যে, আপনার এত শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয়েছে বলে দুঃখ করবার সুযোগ আপনাকে দিলাম না। এ আমার বিনয় নয়, আমি নিজে অনুভব করেছি যে, আমায় শুনে যাঁরা শ্রদ্ধা করেছেন, দেখে তাঁরা তাঁদের সে শ্রদ্ধা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তাই আমি আজ অন্তরে অন্তরে প্রার্থনা করছি, কাছে থেকে যাঁদের কেবল ব্যথাই দিলাম, দূরে গিয়ে অন্ততঃ তাঁদের সে দুঃখ ভুলবার অবসর যদি না দিই, তবে মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা সত্য নয়।

তা ছাড়া নৈকট্যের একটা নিষ্ঠুরতা আছে। চাঁদের জ্যোৎস্নায় কলঙ্ক নেই, কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক আছে। দূরে থেকে চাঁদ চক্ষু জুড়ায়, কিন্তু মৃত চন্দ্রলোকে গিয়ে কেউ খুশী হয়ে উঠবেন বলে মনে হয় না। বাতায়ন দিয়ে যে-সূর্যালোক ঘরে আসে তা আলো দেয়, কিন্তু চোখে দেখার সূর্য দগ্ধ করে। চন্দ্র-সূর্যকে আমি নমস্কার করি, কিন্তু তাঁদের পৃথিবী-দর্শনের কথা শুনলে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। ভালোই হয়েছে ভাই, কাছে গেলে হয়ত আমার কলঙ্কটাই বড় হয়ে দেখা দিত।

তারপর শ্রদ্ধার কথা। ওদিক দিয়ে আপনার জিতে যাবার কোন আশা নেই বন্ধু। শ্রদ্ধা যদি ওজন করা যেত, তা' হলে আমাদের দেশের একজন প্রবীণ সম্পাদক—যিনি মানুষের দোষগুণ বানিয়ার মত ক'রে কড়ায়-গণ্ডায় ওজন করতে সিদ্ধহস্ত, তাঁর কাছে গিয়েই এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যেত! গ্রহের ফেরে তাঁর কাঁটি-পাকি ওজনের ফের আমার পক্ষে কোনদিনই অনুকূল নয়; তা সত্ত্বে আপনিই হারতেন, এ আমি জোর ক'রে বলতে পারি।

হঠাৎ মুদির প্রসঙ্গটা এসে পড়বার কারণ আছে, বন্ধু। জানেনই ত, আমরা কানাকড়ির খরিদ্দার। কাজেই ওজনে এতটুকু কম হতে দেখলে প্রাণটা ছ্যাঁক ক'রে ওঠে। মুদিওয়ালার ওতে লাভ কতটুক জানিনে, কিন্তু আমাদের ক্ষতির পরিমাণ আমরা ছাড়া কেউ বুঝবে না;—মুদিওয়ালা ত নয়ই। তবু মুদিওয়ালাকে ভুল দাঁড়ি ধরতে দেখলে একটু ভরসা হয় যে, চোখের সামনে অতটা ঠকাতে তাব বাঁধবে, কিন্তু তার পাঁচসিকে মাইনের নোংরা চাকরগুলো যখন দাঁড়ি-পাল্লার মালিক হয়ে বসে, তখন আর কোন আশা থাকে না। আগেই বলেছি, আমরা দরিদ্র খরিদ্দার। থাকত বড় বড় মিঞাদের মত সহায়-সম্বল, তা' হলে এ অভিযোগ করতাম না।

পায়াভারী লোকের ভারী সুবিধে। তা' সে পায়াভারী পায়ে ফাইলেরিয়া-গোদ হয়েই হোক, বা ভার গুণেই হোক। এঁদের তুলতে হয় কাঁধে করে, আর কাছে যেতে হয় মাথাটা ভুঁই-সমান নীচু ক'রে।

ব্যবসা যারা বোঝে, তারা অন্য দোকানীর বড় খদ্দেরকে হিংসা ও তজ্জনিত ঘৃণা যতই করুক, তাঁকে নিজের দোকানে ভিড়োতে—তার দোকানের সবটুকু তেল তার ভারীপায়ে খরচ করতে তার এতটুকু বাধে না। দরকার হলে তার পুত্র ছোটে তেলের টিন ঘাড়ে করে, সাঁতরে পার হয় রূপনারায়ণ নদ, তাঁর ভারীপায়ে ঢালে তৈল,—তা সে পা যতই কেন ঘানি-গাছের মত অবিচলিত থাক। সাথে সে ভাঁড় ও স্তুতি-গাইয়ে নিয়ে যেতেও ভুলে না।

যাক এখন এ সব বাজে কথা। অনেক কথার উত্তর দিতে হবে।

আমি আপনার মত অসঙ্কোচে 'তুমি' বলতে পারলাম না ব'লে ক্ষুণ্ণ হবেন না যেন। আমি একে পাড়াগেঁয়ে স্কুল-পালানো ছেলে, তার ওপর পেটে ডুবুরি নামিয়ে দিলেও 'ক' অক্ষর খুঁজে পাওয়া যাবে না (পেটে বোমা মারার উপমাটা দিলাম না স্পেশাল ট্রিবিউনালের ভয়ে)। যদি বা 'খাজা' বা ইবরাহিম খানকে 'তুমি' বলতে পারতাম, কিন্তু কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের নাম শুনেই আমার হাত-পা একেবারে পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছে! আরে বাপ্! স্কুলের হেডমাস্টারের চেহারা মনে করতেই আমার আজও জলতেষ্টা পেয়ে যায়, আর কলেজের প্রিন্সিপাল, সে না জানি আরও কত ভীষণ! আমার স্কুল-জীবনে আমি কখনও ক্লাসে বসে পড়েছি, এত বড় অপবাদ আমার চেয়ে এক নম্বর কম পেয়ে যে "লাষ্ট বয়" হয়ে যেত—সেও দিতে পারবে না। হাই বেঞ্চের উচ্চাসন হতে আমার চরণ কোনদিনই টলেনি, ওর সাথে আমার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেছিল। তাই হয়ত আজও বক্তৃতামঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলে মনে হয়, মাষ্টার মশাই হাইবেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন!

যার রক্তে রক্তে এত শিক্ষক-ভীতি তাকে আপনি সাধ্যসাধনা ক'রেও "তুমি" বলাতে পারবেন না, এ স্থির নিশ্চিত।

এইবার পালা শুরু।

বাঙলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙাল কি না জানিনে, কিন্তু মনে যে কাঙাল এবং অতি মাত্রায় কাঙাল, তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব করে আসছি বহুদিন হতে। আমায় মুসলমান সমাজ 'কাফের' খেতাবের যে শিরোপা দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। একে আমি অবিচার বলে কোনোদিন অভিযোগ করেছি ব'লে ত মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের-আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড় ত আমি হইনি। অথচ হাফেজ খৈয়াম-মনস্থর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে কাফেরের পংক্তিতে উঠে গেলাম!

হিন্দুরা লেখক-অলেখক জন-সাধারণ মিলে যে-স্নেহে যে নিবিড় প্রীতি ভালবাসা দিয়ে আমায় এত বড় ক'রে তুলেছেন, তাঁদের সে ঋণকে অস্বীকার যদি আজ করি, তা'হলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কয়েকজন নোংরা হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে আমায় কিছুদিন হ'তে ইতর ভাষায় গালাগালি করছেন, এবং কয়েকজন গোঁড়া 'হিন্দুসভাওয়ালা' আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনাও করে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এঁদের আঙ্গুল দিয়ে গোণা যায়। এঁদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত। এঁদের অবিচারের জন্য সমস্ত হিন্দুসমাজকে দোষ দিই নাই এবং দিবও না। তা'ছাড়া, আজকার সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে আমি যে মুসলমান এইটেই হয়ে পড়েছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধ —আমি যত বেশী অসাম্প্রদায়িক হই না কেন।

প্রথম গালাগালির ঝড়টা আমার ঘরের দিক অর্থাৎ মুসলমানের দিক থেকেই এসেছিল—এটা অস্বীকার করিনে, কিন্তু তাই বলে মুসলমানেরা যে আমায় কদর করেননি, এটাও ঠিক নয়। যারা দেশের সত্যিকার প্রাণ, সেই তরুণ মুসলিম-বন্ধুরা আমায় যে-ভালোবাসা, যে প্রীতি দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন, তাতে নিন্দার কাঁটা বহু নিচে ঢাকা পড়ে গেছে। প্রবীণদের আশীর্বাদ—মাথার মণি হয়ত পাইনি,

কিন্তু তরুণদের ভালোবাসা, বুকের মালা আমি পেয়েছি। আমার ক্ষতির ক্ষেতে ফুলের ফসল ফলেছে।

এই তরুণদেরই নেতা ইব্রাহিম খান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর, ওয়াজেদ আলি, আবুল হোসেন। আর এই বন্ধুরাই ত আমায় বড় করেছেন, এই তরুণদের বুকে আমার জন্য আসন পেতে দিয়েছেন—প্রীতির আসন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুর যারা তাদের গলার মালা দিয়ে আমায় বরণ করল, তারা এই তরুণেরই দল। অবশ্য, এ তরুণের জাত ছিল না। এরা ছিল সকল জাতির।

সকলকে জাগাবার কাজে আমায় আহ্বান করেছেন। আমার মনে হয়, আপনাদের আহ্বানের আগেই আমার ক্ষুদ্র শক্তির সবটুকু দিয়ে এদের জাগাবার চেষ্টা করেছি—শুধু যে লিখে তা নয়,—আমার জীবনী ও কর্মশক্তি দিয়েও।

আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে আমি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি—লিখেছি, বলেছি, চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নাই, কিন্তু সামর্থ্য যেটুকু আছে, তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত কোনদিন হয়েছি, এ-বদনাম আর যেই দিক, আপনি দেবেন না বোধহয়। আমার এই দেশ-সেবার সমাজ-সেবার 'অপরাধের' জন্য শ্রীমৎ সরকার বাবাজীর আমার উপর দৃষ্টি অতি মাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমার সবচেয়ে চল্‌তি বইগুলোই গেল বাজেয়াফ্‌ত হয়ে। এই সে-দিনো পুলিশ আবার আমায় জানিয়ে দিয়েছে, আমার নব-প্রকাশিত 'রুদ্র-মঙ্গল' আর বিক্রি করলে আমাকে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করা হবে। আমি যদি পাশ্চাত্ত্য ঋষি হুইটম্যানের সুরে সুর মিলিয়ে বলি:

"Behold, I do not give a little charity,
when I give, I give myself."

তা হ'লে সেটাকে অহঙ্কার বলে ভুল করবেন না।—

আপনি সমাজকে "পতিত, দয়ার পাত্র" বলেছেন। আমিও সমাজকে পতিত demoralized মনে করি—কিন্তু দয়ার পাত্র মনে করতে পারিনে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি আমার সমাজকে মনে করি ভয়ের পাত্র। এ-সমাজ সর্বদাই আছে লাঠি উঁচিয়ে; এর দোষ-ত্রুটির আলোচনা করতে গেলে নিজের মাথা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আপনি হয়ত হাসছেন, কিন্তু আমি ত জানি আমার শির লক্ষ্য করে কত ইট-পাটকেলই না নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানেন? স্নেহের হাত বুলিয়ে এ পচা সমাজের কিছু ভালো করা যাবে না। যদি সে রকম 'সাইকিক-কিওর'-এর শক্তি কারুর থাকে, তিনি হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। ফোঁড়া যখন পেকে পচে ওঠে, তখন রোগী সবচেয়ে ভয় করে অস্ত্র-চিকিৎসককে। হাতুড়ে ডাক্তার হয়ত তখনো আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়েই ঐ গলিত ঘা সারিয়ে দেবে এবং তা শুনে রোগীরও খুশী হয়ে উঠারই কথা। কিন্তু বেচারী 'অবিশ্বাসী' অস্ত্র-চিকিৎসক তা বিশ্বাস করে না। সে বেশ করে তার ধারালো ছুরি চালায় সে-ঘায়ে অস্ত্র; রোগী চেঁচায়, হাত পা ছেঁাড়ে, গালি দেয়। সার্জন তার কর্তব্য ক'রে যায়। কারণ সে জানে, আজ রোগী গালি দিচ্ছে, ছু'দিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা করে আসবে।

আপনি কি বলেন? আমি কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসার পক্ষপাতী। সমাজ তো হাত-পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে; তা সইবার মত শক্ত চামড়া যাঁদের নেই, তাঁদের দিয়ে সমাজসেবা হয়ত চলবে না।। এই জন্যই আমি বারে বারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ ব্রতীদলকে। এ-সংস্কার সম্ভব হবে শুধু তাঁদের দিয়েই। এরা যশের কাঙাল নয়, মানের ভিখারী নয়। দারিদ্র্য সইবার মত পেট, আর মার সইবার মত পিঠ যদি কারুর থাকে, ত এই তরুণদেরই আছে। এরাই সৃষ্টি করবে নূতন সাহিত্য, এরাই আনবে নূতন ভাবধারা, এরাই গাইবে 'তাজা বতাজা'র গান।

আপনি হয়ত আমায় এদেরই অগ্রনায়ক হতে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু আপনার মত আমিও ভাবি, আজও ভাবি যে, কে সে ভাগ্যবান এদের অগ্রনায়ক। আমার মনে হয়, সে ভাগ্যবান আজও আসেনি। আমি অনেকবার বলেছি, আজও বলছি—সে ভাগ্যবানকে আমি দেখিনি, কিন্তু দেখলে চিনতে পারব। আমার বাণী—তাঁরই আগমনী-গান। আমি তারই অগ্রপথিক তূর্যবাদক। আমার মনে হয় সে ভাগ্যবান পুরুষেরই ইঙ্গিতে আমি শুধু গান গেয়ে গেয়ে চলেছি—জাগরণী গান। আঘাত, নিন্দা, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা দশদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে আমার ওপর, তবু আমি তার দেওয়া তূর্য বাজিয়ে চলেছি। এ বিশ্বাস কোথা হ'তে কি ক'রে যে আমার মাঝে এল, তা আমি নিজেই জানিনে। আমার শুধু মনে হয় কার যেন আদেশ—কার যেন ইঙ্গিত আমার বেদনার রন্ধ্রপথে নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তাঁর আসার পদধ্বনি আমি নিরন্তর শুনছি আমার হৃৎপিণ্ডের তালে তালে, আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি আক্ষেপে।

তবে, এও আমি বিশ্বাস করি, সেই অনাগত পুরুষের, আমাদের যে-কারুর মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করা বিচিত্র নয়।

আমি এত দিন তাঁকে খুঁজেছি আমারও উর্ধ্বে। তাঁকে আমারই মাঝে খুঁজতেও হয়ত চেয়েছি। দেখা তাঁর পেয়েছি এমন কথা বলব না, তবে এ-কথা বলতেও আমার আজ দ্বিধা নেই যে, আমি ক্রমেই তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করছি। এমনো মনে হয়েছে কতদিন, যেন আর একটু হাত বাড়ালেই তাকে ধরতে পারি।

আপনার "হাত বাড়াবে কি?" কথাটা আমায় সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। তাই আমি খুঁজে ফিরছি নিরাশ-হতাশ্বাসে সে নিশ্চিন্ত শান্তি—যার ধ্যানলোকে বসে আমি তপস্যা-প্রোজ্জ্বলনেত্রে আমার অবহেলিত আমাকে খুঁজে দেখবার অবকাশ পাব। এ-শান্তি আমার এ-জীবনে পাব কি না জানি না; যদি পাই—আপনার জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর দিয়ে যাব সে-দিন।

আপনার কয়েকটি মৃদু অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব এইবার।

আপনি আমার যে-দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন, সে-দায়িত্ব আমার সত্যিকার কাব্য-সৃষ্টির, না সমাজ-সংস্কারের? আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জানলেও মানিনে।

"এই সৃষ্টি করলে আর্টের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে, এই সৃষ্টি করলে আর্ট ঠুঁটো হয়ে পড়ে"—এমনিতর কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বলগা ক'সে ক'সে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবার গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলেই আর্টের চরম সুন্দর নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হ'ল—এ-কথা মানতে আর্টিষ্টের হয়ত কষ্টই হয়, প্রাণ তার হাঁপিয়ে ওঠে। জানি, ক্লাসিকের কেশো রোগীরা এতে উঠবেন হাড়ে হাড়ে চ'টে, তাঁদের কলম হয়ে উঠবে বাঁশ। এরই মধ্যে হয়েও উঠেছে তাই। তবু আজ এ-কথা জোর গলায় বলতে হবে নবীনপন্থীদের। এই সমালোচকদের নিষেধের বেড়া যাঁরাই ডিঙিয়েছেন, তাঁদেরই এঁদের গোদা পায়ের লাথি খেতে হয়েছে, প্রথম শ্রেণী হতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নেমে যেতে হয়েছে।

বেদনা-সুন্দরের পূজা যাঁরাই করেছেন, তাঁদের চিরকাল একদল লোক হুজুগে ব'লে নিন্দা করেছে। আর, এরাই দলে ভারী। এরা মানুষের ক্রন্দনের মাঝেও সুরতাললয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে হল্লা করে যে, ও-কান্না হাততালি দেবার মত কান্না হল না বাপু, একটু আর্টিষ্টিকভাবে নেচে নেচে কাঁদ! সকল সমালোচনার ওপরে যে-বেদনা, তাকে নিয়েও আর্টশালারক্ষী—এই প্রাণহীন আনন্দ-গুণ্ডার কুশ্রী চীৎকারে হুইটম্যানের মত ঋষিকেও অ-কবির দলে পড়তে হয়েছিল।

আমার হয়েছে সাপের ছুঁচো-গেলা অবস্থা। 'সর্বহারা' লিখলে বলে—কাব্য হ'ল না, 'দোলন-চাঁপা' 'ছায়ানট' লিখলে বলে—ও হল ন্যাকামী! ও নিরর্থক শব্দ-ঝঙ্কার দিয়ে লাভ হবে কী? ও না লিখলে কা'র কি ক্ষতি হ'ত?

'লিরিক' নাকি 'লভ' এবং 'ওয়ার' নিয়ে। আমাদের দেশে যুদ্ধ নাই (হিন্দু-মুসলমান যুদ্ধ ছাড়া); কাজেই মানুষের নির্যাতন দেখে তার সেই মর্মব্যথার গান গাইলে এখানে হয় তা 'বীভৎস বিদ্রোহ রস'। ওটা দিয়ে নাকি মানুষের প্রশংসা সহজ-লভ্য হয় বলেই আজকালকার লেখকরা রসের চর্চা করে।

"আমার লেখা কাব্য হচ্ছে না, আমি কবি নই"—এ বদনাম সহ্য করতে হয়ত কোনো কবিই পারে না। কাজেই যারা করছিল মানুষের বেদনার পূজা, তারা এখন করতে চাচ্ছে প্রাণহীন সৌন্দর্য সৃষ্টি। এমন একটা যুগ ছিল—সে সত্যযুগই হবে হয়ত—যখন মানুষের দুঃখ আজকের মত এত বিপুল হয়ে ওঠেনি। তখন মানুষ নিশ্চিন্ত নির্ভরতার সঙ্গে ধ্যানের তপোবনে শান্ত সামগান গাইবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র মানুষ নিপীড়িত হতে লাগল, অমনি সৃষ্টি হল বেদনার মহাকাব্য,—রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড প্রভৃতি। আর তাতে সমাজের আজকালকার বেঁড়ে-ওস্তাদ সমালোচকদের তথাকথিত "বীভৎস বিদ্রোহ বা রুদ্র রসের" প্রাধান্য থাকলেও—তা কাব্য হয়নি, এমন কথা কেউ বলবে না।

এই বেদনার গান গেয়েই আমাদের নবীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের জন্য নূতন সিংহাসন গড়ে তুলতে হবে। তারা যদি কালিদাস, ইয়েটস, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি রূপস্রষ্টাদের পাশে বসে বসতে নাই পায়,—পুশকিন, দস্তয়ভস্‌কি, হুইটম্যান, গর্কি, যোহান বোয়ারের পাশে ধূলির আসনে বসবার অধিকার তারা পাবেই। এই ধূলির আসনই একদিন সোনার সিংহাসনকে লজ্জা দেবে, এই ত আমাদের সাধনা।

দুঃখী বেদনাতুর হতভাগাদের একজন হয়েই আমি বেদনার গান গেয়েছি—সে-গানে হয় ত রূপ-রং ফুটে ওঠেনি আমি ভাল রংরেজ নই বলে, কিন্তু সেই বেদনার সুরকে অশ্রদ্ধা করবার মত নীচতা মানুষের কেমন করে আসে! অথচ এই সব গালাগালির বিপক্ষে কোনো প্রতিবাদও ত হ'তে দেখিনি।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে শত্রুর নিক্ষিপ্ত বাণে এতটা বিচলিত হওয়া আমার উচিত হয়নি। আমার দিনের সূর্য ওদের শরনিক্ষেপে মুহূর্তের তরে আড়াল পড়লেও চিরদিনেব জন্য ঢাকা পড়বে না—আমার এ বিশ্বাস থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এর জন্য দুঃখও করিনে। অন্ততঃ আমি ত জানি আমার এই ত চলার আরম্ভ, আমার সাহিত্যিক জীবনের এই ত সবেমাত্র সেদিন শুরু। আজ-ই আমি আমার পথের দাবী ছাড়ব কেন? ওদের রাজপথে ওরা চলতে যদি না-ই দেয়, কাঁটার পথেই চলব সমস্ত মারকে সহ্য ক'রে। অন্ততঃ পথের মাঝ পর্যন্ত ত যাই। আমার বনের রাখাল ভাইরা যে মালা দিয়ে আমায় সাজাল, সে-মালার অবমাননাই বা করব কেমন করে? ঠিক বলেছ বন্ধু, এবার তপস্যাই করব—পথে চলার তপস্যা।

'বিদ্রোহীর' জয়-তিলক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে গেল আমার তরুণ বন্ধুদের ভালোবাসায়। একে অনেকেই কলঙ্ক-তিলক বলে ভুল করেছে, কিন্তু আমি করিনি। বেদনা-সুন্দরের গান গেয়েছি বলেই কি আমি সত্য-সুন্দরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি? আমি বিদ্রোহ করেছি—বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে,—যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন পচা সেই মিথ্যা-সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংকারের বিরুদ্ধে। হয়ত আমি সব কথা মোলায়েম করে বলতে পারিনি, তলোয়ার লুকিয়ে তার রূপার খাপের ঝকমকানিটাকে দেখাইনি—এই ত আমার অপরাধ। এরই জন্য ত আমি বিদ্রোহী। আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, সমাজের সকল কিছু কুসংস্কারের বিধি-নিষেধের বেড়া অকুতোভয়ে ডিঙিয়ে গেছি, এর দরকার ছিল মনে ক'রেই।

যাক। আগেই বলেছি, এ কুম্ভকর্ণমার্কা সমাজকে জাগাতে হলে আঘাত দিয়েই জাগাতে হবে। একদল প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহীর উদ্ভব না হলে এর চেতনা আসবে না। কুম্ভকর্ণের পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে বা চিমটি কেটে এর ঘুম ভাঙাবার যে-সব পালিসির উল্লেখ আছে

তা একেবারে মোলায়েম নয়। সেই পলিসিই একবার একটু পরখ করে দেখুকই না ছেলেরা! এতে কি আর এমন হবে! আপনি বলবেন কুম্ভকর্ণ না হয় জাগল ভায়া, কিন্তু জেগে সে যে রকম 'হা' টা করবে, সে 'হা' ত সঙ্কীর্ণ নয়, তখন! আমি বলি কি, তখন কুম্ভকর্ণ তাদেরই ধরে 'জলপানি' করবে, যারা তাঁর ঘুম ভাঙাতে গিয়েছিল।

এতই ত মরেছে, না হয় আরো দু'দশটা মরবে! আপনি বলবেন ভয় ত ঐখানেই, বন্ধু, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে এগোয় কে? আমি বলি, সে দুঃসাহস যদি আমাদের কারুর না থাকে, তা'হলে নিশ্চিন্ত হয়ে নাকে সর্ষের তেল দিয়ে সকলে 'আস্‌হাব কাহাফে'র মত রোজ কিয়ামত তক ঘুমোতে পারেন। সমাজকে জাগাবার আশা একেবারেই ছেড়ে দিন! কারুর পান থেকে এতটুকু চুন খসবে না, গায়ে আঁচড়টি লাগবে না, তেল কুচকুচে নাদুস-নুদুস ভুঁড়িও বাড়াবে এবং সমাজও সাথে সাথে জাগতে থাকবে—এ আশা আলেম সমাজ করতে পারেন, আমরা অবিশ্বাসীর দল করিনে।

আমার কথাগুলো 'মরিয়া হইয়া'র মত শুনাবে, কিন্তু বড় দুঃখে দেখে-শুনে তেতোবিরক্ত হয়ে এ-সব বলতে হচ্ছে। তাই ত বলি যে, 'বাবা'! তোকে রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। মরতে হয় ত এদেরই একজনের হাতে মর বেশ একটু হাতাহাতি করে, তাতে সুনাম আছে। কিন্তু ঐ হনুমানের হাতে মরিস কেন? হনুমানের হাতে মরার চেয়ে বরং কুম্ভকর্ণকে জাগাতে গিয়ে মরা ঢের ভালো। কথাগুলো যখন বলি, তখন লোকে হাততালি দেয়, 'আল্লাহু আকবর' 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিও করে, কিন্তু তারপর আর তাদের খবর পাইনে।

আমিও মানি, গড়ে তুলতে হলে একটা শৃঙ্খলার দরকার। কিন্তু ভাঙার কোনো শৃঙ্খলা বা সাবধানতার প্রয়োজন আছে মনে করিনে। নূতন করে গড়তে চাই বলেই ত ভাঙি—শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আর ঐ নূতন করে গড়ার আশাতেই ত যত শীঘ্র

পারি ভাঙি—আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা-পুরাতনকে পাতিত করি। আমিও জানি, তৈমুর, নাদির সংস্কারপ্রয়াসী হয়ে ভাঙতে আসেনি, ওদের কাছে নূতন-পুরাতনের ভেদ ছিল না। ওরা ভেঙেছিল সেরেফ ভাঙার জন্যই। কিন্তু বাবর ভেঙে ছিল দিল্লী-আগ্রা ময়ূরাসন-তাজমহল গড়ে তোলার জন্য। আমার বিদ্রোহও 'যখন চাহে এ মন যা'র বিদ্রোহ নয়, ও আনন্দের অভিব্যক্তি সর্ববন্ধন মুক্তের—পূর্ণতম স্রষ্টার।

আপনার 'মুসলিম-সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান সাহিত্যিকই কথা তুলবেন হয় ত। ওর মানে কি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য, না মুসলিম ভাবাপন্ন সাহিত্য? যদি সত্যিকার সাহিত্য হয়, তবে তা সকল জাতিরই হবে। তবে তার বাইরের একটা ধর্ম থাকবে নিশ্চয়। ইসলাম ধর্মের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পারে, কিন্তু তার শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, কোনো ধর্মেরই শাস্ত্র নিয়ে কাব্য লেখা চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যকার প্রাণ-শক্তি, গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি ত স্বীকার করিই, যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন, তাঁরাও স্বীকার করেন। ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে কাব্য কেন, মহা-কাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমা গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে-গানের সুর। উঠতে পারেও না। তাহলে তা কাব্য হবে না। আমার বিশ্বাস, কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়। আপনি কি চান, তা আমি বুঝতে পারি—কিন্তু সমাজ যা চায়, তা সৃষ্টি করতে আমি অপারগ। তার কাছে এখনও—

আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবী কর সার
মাজা দুলিয়ে পারিয়ে যাব ভবনদীর পার।"

রীতিমত কাব্য। বুঝবার কোনো কষ্ট হয় না, আল্লা বলতে এবং

নবীকে সার করতে উপদেশও দেওয়া হল, মাজাও তুলল এবং ভবনদী পারও হওয়া গেল ! যাক বাঁচা গেল !—কিন্তু বাঁচল না কেবল কাব্য। সে বেচারী ভবনদীর এ পারেই রইল পড়ে। ঝগড়ার উৎপত্তি এইখানেই। কাব্যের অমৃত যারা পান করেছে, তারা বলে—মাজা যদি তুলাতেই হয় দাদা, তবে, ছন্দ রেখে তুলাও, পারে যদি যেতেই হয়, তবে তরী একেবারে কমল বনের ঘাটে ভিড়াও। অমৃত যারা পান করেনি—আর এরাই শতকরা নিরানব্বইজন—তারা বলে, কমল বন, টমল বন জানিনে বাবা, সে যদি বাঁশবন হয়, সে-ওভি আচ্ছা—কিন্তু একেবারে ভবনদীর পার-ঘাটায় লাগাও নৌকা। এ-অবস্থায় কি করব বলতে পারেন ? আমি হুজ্জতুল ইসলাম লিখব, না সত্যিকার কাব্য লিখব ?

'বিদ্রূপ আমি করছিনে, বন্ধু, এ আমার চোখের জল-জমানো হাসির শিলাবৃষ্টি।'

সত্য সত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনা সঞ্চার হয়, তা হ'লে তার মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্যের আদর্শকেও না হয় খাটো করতে রাজী আছি, কিন্তু আমার এ-ভালোবাসার আঘাতকে এরা সহ্য করবে কি না, সেইটাই বড় প্রশ্ন। হিন্দু-লেখকগণ তাঁদের সমাজের গলদ ত্রুটি-কুসংস্কার নিয়ে কি না কশাঘাত করেছেন সমাজকে ;—তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারাননি। কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানদের দোষ-ত্রুটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নেই। সংস্কার ত দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ করে নিয়ে লেখককে হয়ত ছুরিই মেরে বসবে। আজ হিন্দুজাতি যে এক নবতম বীর্যবান জাতিতে পরিণত হতে চলেছে, তার কারণ তাদের অসমসাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী।

আমি জানি যে, বাঙলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সব চেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্ম-জাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ !

হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ. আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ-অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে। কিন্তু ইসলামের 'সভ্যতা-শাস্ত্র-ইতিহাস' এ-সমস্তকে কাব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা দুরূহ ব্যাপার নয় কি ?

আমার মনে হয়, আমাদের নূতন সাহিত্যব্রতী দল এর এক-একটা দিক নিয়ে রিসার্চ ও আলোচনার দায়িত্ব নিলে ভালো হয়। আগেই বলেছি, নিশ্চিত জীবনযাত্রায় পূর্ণ শান্তি কোনোদিন পাইনি। যদি পাই, সেদিন আপনার এই উপদেশ বা অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা যেন করতে পারি—তা-ই প্রার্থনা করছি আজ।

আবার বলি যাঁরা মনে করেন—আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি; তাঁরা অনর্থক এ-ভুল করেন। ইসলামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে—তাকে ইসলাম বলে না-মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান ? এ-ভুল যাঁরা কবেন, তাঁরা যেন আমার লেখাগুলো মন দিয়ে পড়েন দয়া কবে—এ ছাড়া আমাব আব কি বলবার থাকতে পারে ?

আমার 'বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা আমার উপর বিদ্রোহী হয়ে উঠেন, তাঁরা যে হাফেজ-রুমীকে শ্রদ্ধা করেন—এ-ও আমার মনে হয় না। আমি ত আমার চেয়েও বিদ্রোহী মনে করি তাঁদের। এঁরা কি মনে করেন, হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিলেই সে কাফের হয়ে যাবে ? তা হ'লে মুসলমান কবি দিয়ে বাংলা-সাহিত্য সৃষ্টি কোনো কালেই সম্ভব হবে না—জৈগুণ বিবির পুঁথি ছাড়া।

বাঙলা-সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ও বাদ দিলে বাঙলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরাজী-সাহিত্য হতে গ্রীক পুরাণের ভাব বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাঙলা-সাহিত্য, হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে

হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুর তেমনি মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি; বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।

কিন্তু বন্ধু, এ-কর্তব্য কি একা আমারই? আমার শক্তি সম্বন্ধে আপনার যেমন বিশ্বাস, আপনার ওপরও আমার সেই একই বিশ্বাস—একই শ্রদ্ধা। আপনিও 'কামাল পাশা' না লিখে এই হতভাগ্য মুসলমানদের জীবন নিয়ে নাটক লিখতে আরম্ভ করুন না। কেন আমার মনে হয়, ওদিকে আপনার জুড়ি নেই অন্ততঃ আমাদের মধ্যে কেউ। 'কামাল পাশা'র দরকার আছে জানি, কিন্তু তার চেয়েও দরকার—আমাদের চোখের সামনে আমাদেরই জীবনের এই ট্রাজেডি তুলে ধরা। কবিতা ও প্রবন্ধ-লেখকের আমাদের অভাব নেই। নাটক-লিখিয়ের অভাবও আপনাকে দিয়ে পূরণ হতে পারে। আমাদের সবচেয়ে বড় অভাব—কথা-সাহিত্যিকের। এর ত কোনো আশা-ভরসাও দেখছিনে কারুর মধ্যে। অথচ কথা-সাহিত্য ছাড়া শুধু কাব্যের মধ্যে আমাদের জীবন, আমাদের আদর্শকে ফুটিয়ে তুলতে কেউ পারবেন না। অনুবাদের দিক দিয়েও আমরা সবচেয়ে পিছনে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, অভিনয় ইত্যাদি ফাইন আর্টের কথা না-ই বললাম।

এত অভাবের কোন অভাব পূর্ণ করব আমি একা, বন্ধু। অবশ্য একাই হাত দিয়েছি অনেকগুলি কাজেই—তাতে করে হয়ত কোনোটাই ভালো করে হ'চ্ছে না।

জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক, আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাব আমি, দিয়ে যাব আমি নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে

বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকব আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত, এই আমার সাধনা, এই আমার তপস্যা।

আপনার এত সুন্দর, এমন সুলিখিত চিঠির কি বিশ্রী করেই না উত্তর দিলাম। ব্যথা যদি দিয়ে থাকি, আমার গুছিয়ে বলতে না পারার দরুন, তা হ'লে আমি ক্ষমা না চাইলেও আপনি ক্ষমা করবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।

আপনার বিরাট আশা, ক্ষুদ্র আমার মাঝে পূর্ণ যদি না-ই হয়, তবে তা' আমাদেরই কারুর মাঝে পূর্ণত্ব লাভ করুক, আমি কায়মনে এই প্রার্থনা করি।"

চট্টগ্রামে নজরুল

নজরুলের সাথে পরিচয়ের পর থেকেই বন্ধু বাহারের ইচ্ছা ছিল, নজরুলকে একবার সে চট্টগ্রামে নিয়ে যাবে। আর চট্টগ্রামের পাহাড়, নদী, সমুদ্র, ঝরনা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দেবে কবির। প্রস্তাবটি লোভনীয়। কবিকে বললে তিনি হয়তো আনন্দে লাফিয়ে উঠবেন। আমার সাথে বাহার প্রায়ই এ-সম্বন্ধে আলাপ করতো। কিন্তু আমরা উভয়েই এ-কথা কবিকে বহুদিন পর্যন্ত বলিনি। কারণ নজরুল সম্বন্ধে এক শ্রেণীর লোকের যেরূপ বিরূপ ধারণা, এ-অবস্থায় ইসলামাবাদ-চট্টগ্রামে যাওয়ার কথা বলতে আমরা সংকোচ বোধ করেছি। আমাদের মনে হয়েছে, হয়তো সেখানে এই উগ্রপন্থী কবিকে উপযুক্ত সম্মান দেখানো হবে না। বাহার এক-একদিন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠতো। একদিন 'মরিয়া' হয়ে বললো: "না হে, আমি ওঁকে চাটগাঁয়ে নিয়ে যাবই, যা' থাকে কপালে।

কিন্তু নিয়ে যাবার সুযোগ আর আসে না।

বাহার তখন আই-এস-সি পাস করে কোলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে ডাক্তারী পড়বে বলে। কিন্তু সাহিত্যের ঝোঁক অত্যন্ত বেশি। তাই আমাকে নিয়ে দু' দু' বার হুগলী গিয়ে নজরুলের সাথে আলাপ করেছিল আর তাঁকে চট্টগ্রামে নিয়ে যেতে অতি মাত্রায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল।

একদিন সুযোগ এলো। আর নজরুলকে বাহার চট্টগ্রামে নিয়ে গেলো। নিয়ে তুললো সে তাদের বাড়ী—তামাকুমণ্ডীতে। তখন

বাহারদের বাড়ীতে নেমে এসেছিল একটা বিষাদের কালো মেঘ। কারণ তার নানা খান বাহাদুর আবদুল আজীজ সাহেব ওর কিছু দিন আগেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী, সমাজ সংস্কারক এবং সারা পূর্ব-বাঙলায় একজন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি; আর বাহারদের পরিবারের প্রধান।

এই পরিস্থিতিতে নজরুল সেখানে গিয়ে পৌঁছলেও তাঁর আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি হয়নি। বরং নজরুল হাস্যে লাস্যে গানে-গজলে, কবিতা লিখে, আবৃত্তি করে সারা পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন। উপরন্তু সারা চট্টগ্রাম শহরকেও যেন মাতিয়ে তুলেছিলেন। কথাশিল্পী মাহবুব-উল-আলম, আবুল ফজল প্রমুখ প্রগতিশীল সাহিত্য-সেবীদের নিয়ে সেখানে যেন আনন্দের হাট বসিয়েছিলেন। এখানে তিনি 'বাঙলার আজীজ' নামে কবিতাটি লেখেন। কবি নবীনচন্দ্র সেনকে নিয়েও তিনি একটি কবিতা লেখেন। তার ভাবটি সম্ভবতঃ এই ছিল যে—'অজয়ের' তীবের কবি 'কর্ণফুলীব' তীরেব কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন।

বাহারের বোন বেগম শামসুন্নাহার তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে বসে আছেন। চট্টগ্রাম কলেজে ছাত্রদের সাথে একত্র বসে পড়তে হবে বলে তাঁর মা আব নানী আম্মা এখানেই পড়াশুনার ইতি হবে বলে ভয় করছেন। শামসুন্নাহাব ছটফট কবেছেন উচ্চতর শিক্ষার আকুল পিপাসায়। অথচ সে যুগে তাঁর এই অসম সাহসিক ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করার কোনো দুঃসাহসী পুরুষ অভিভাবক নেই। এ সময় নজরুলের উৎসাহবাণী এই পরিবারে বেশ কার্যকরী হয়েছিল। কবি বলেছিলেন: এঁকে উচ্চতর শিক্ষা দিতে হবে—নিশ্চয়ই দিতে হবে। প্রয়োজন হলে এমন একটি ছেলের সাথে এর বিয়ে দিতে হবে, যে এর উচ্চশিক্ষার দ্বার মুক্ত করে দেবে একান্ত আগ্রহে। কোলকাতায় নিয়ে একে ভর্তি করবে বেথুন কলেজে।

নজরুলের এ ইচ্ছাকে বাহারদের পরিবার রূপ দিয়েছিল ক্রমে ক্রমে। এ বোধ হয় ১৯২৬ সালের শেষের দিকের কথা।

এরপর ১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসের দিকে একদিন বাহার নজরুলকে চট্টগ্রামে আবার নিয়ে গেলো। ওরা যখন ফিরে এলো, সঙ্গে নিয়ে এলো অনেকগুলি লেখা আর অনেকগুলি ফটো। ফটো-গুলি দেখে মনে হলো, এবারও চট্টগ্রামে কবি বিপুলভাবে আদর-আপ্যায়ন পেয়ে এসেছেন। এর কোনো ছবি ঝরনার ধারে বসে তোলা, কোনোটা কবির সমুদ্র-স্নানরত অবস্থায় তোলা। কয়েক দিনে তিনি যেন চট্টগ্রাম শহরকে মাতাল করে দিয়ে এসেছেন। এ-সব তাঁদের কথাবার্তায় বেশ বোঝা গেলো।

অনেকগুলো সভায় বক্তৃতাও দিতে হয়েছে কবিকে। মজার কথা: প্রত্যেক সভায়ই কবি আচকান-পাজামা পরে আর মাথায় পাগড়ি বেঁধে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কবির সেই সময়ের একটি ছবি এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

চট্টগ্রামে এবারও তিনি ছিলেন বাহারদের বাড়ীতে। এবারও সেখানে তিনি অনেকগুলি কবিতা লেখেন। এখানে তিনি লেখেন: সিন্ধু (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরংগ), অনামিকা, গোপন প্রিয়া, বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি, প্রভৃতি। এগুলো পরে তিনি তাঁর সিন্ধু-হিন্দোল, চক্রবাক, প্রভৃতি বইয়ে গ্রন্থিত করেন।

নজরুলকে জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা

হঠাৎ উল্কার মতো বাঙলা-সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেই নজরুল গতানুগতিকতাকে ভেঙে চুরমার করে দিলেন, দিলেন এতে প্রাণশক্তি ; যোজনা করলেন নতুন সুর। নতুনের জয়গান গেয়ে চারণের বেশে বেড়াতে লাগলেন তিনি। তাঁর খ্যাতি খুব অল্প দিনের ভেতরেই ছড়িয়ে পড়ল দেশের আনাচে-কানাচে। এতে রক্ষণশীলদের একদল যেমন তাঁর ওপর বিরূপ হয়ে উঠলেন, নিন্দা প্রচার করতে লাগলেন তাঁর, মুসলমানদের কেউ কেউ যেমন 'কাফের' ফতোয়া দিয়ে তাঁকে পর্যুদস্ত করবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তেমনি হিন্দুদের ভেতরেও অনেকে ঈর্ষাতুর হয়ে তাঁকে দেশের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লাগলেন।

'সওগাতে'র আসরে বসে নজরুল-ভক্তরা ভাবতে লাগলেন, এর প্রতিকার করা দরকার। অনেক ভেবে ঠিক করা হলো : নজরুলকে বিরাট আড়ম্বরে জাতীয়-সংবর্ধনা দেয়া হোক। এতে জানা যাবে নজরুলের প্রতি জাতির মনোভাব। নজরুল ভক্ত এবং প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীদের অনেকে এতে মৃদু আপত্তি তুললেন। তাঁরা বললেন : একেবারে তরুণ বয়স—এই বয়সে জাতীয়-সংবর্ধনা পেলে হয়তো নজরুলের লেখার ক্ষতি হতে পারে। নিচে নেমে যেতে পারে তাঁর লেখার মান। তাঁদের এ আপত্তি টেঁকেনি। স্থির হলো : নজরুলকে জাতীয়-সংবর্ধনা দেয়া হবে।

১৯২৯ সালের ৯ই অক্টোবর সাড়ে ছয়টায় মুসলিম-ইনষ্টিটিউট

হলে অভ্যর্থনা কমিটি গঠন উদ্দেশ্যে সাধারণ-সভা ডাকা হলো। তৃতীয় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট এস. ওয়াজেদ আলী সাহেব এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন। আমরা 'সওগাত' অফিসে বসে তোড়জোড় করতে লাগলাম। বিপুল ভোটাধিক্যে আমাদের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতেই হবে।

সাড়ে ছয়টার সময় সভা আরম্ভ হবার কথা। আমরা তিনটের সময় গিয়ে সবাই 'সওগাত' অফিসে জড় হলাম। কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা! সময় যেন আর কাটতে চায় না। প্রতিটি মুহূর্ত যেন একটি ঘণ্টা বলে মনে হতে লাগল। নজরুলও এ-দিন 'সওগাত' অফিসে উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য এ-ব্যাপারে তাঁর করণীয় কাজ কিছুই ছিল না। কেউ কেউ তাঁর এই সভায় উপস্থিত থাকা উচিত বলে মত প্রকাশ করতে লাগলেন; কেউ কেউ বিরোধিতা করলেন। বললেন: এ-সভায় নজরুলের উপস্থিত থাকা অশোভন। শেষে ঠিক হলো: নজরুল এ-সভায় উপস্থিত থাকবেন না।

সাড়ে তিনটের সময় সবাই আমাকে একপ্রকার জোর করে মুসলিম ইন্ষ্টিটিউট হল-এ পাঠালেন। বললেন: যাও, দেখে এসো চেয়ার টেবিলগুলো ঠিকভাবে সাজানো হযেছে কি না, আর সভায় লোকজন আসবার সম্ভাবনা আছে কি না।

তখন মুসলিম-ইনষ্টিটিউট হল ছিল কোলকাতা মাদ্রাসার পশ্চিম-উত্তর কোণে—আজকালের মতো এত বড় হল নয়। 'সওগাত' অফিস থেকে কয়েক মিনিটের পথ।

হলের কাছে গিয়ে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ! লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের স্থান নেই। বাইরেও এক বিরাট জনতা। ভেতরে কে যেন উত্তেজিতকণ্ঠে বক্তৃতা করছেন। আর জনতা বিপুল উল্লাসে চীৎকার করছে: "না—না—না।"

ব্যাপার কি?

উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপছে। কাঁপছে বুক। তারপর কি

করে যে সেই বিরাট জনতা ভেদ করে আমি ভেতরে প্রবেশ করেছিলাম, ডায়াসে গিয়ে উঠেছিলাম—আমি বলতে পারবো না।

দেখলাম : মওলানা নজীর আহমদ চৌধুরী সাহেব (আজ তিনি মরহুম—আল্লাহ তাঁর বেহেশ্‌ত-নসীব করুন) দাঁড়িয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করছেন। তাঁর হাতে নজরুলের বিখ্যাত বই 'অগ্নিবীণা'। তিনি 'অগ্নিবীণা' থেকে উদ্ধৃত করছেন :

"আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে
এঁকে দিই পদচিহ্ন।..."

আর বলছেন : "যে-কবি ভগবান বুকে পদচিহ্ন এঁকে দিতে দুঃসাহস প্রকাশ করেন, আপনারা কি চান তাঁকে জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হোক?"

জনতা চীৎকার করে বলছেন : "না—না—না—।"

উত্তেজনা চেপে খানিকক্ষণ বোধহয় আমি চুপ করে ছিলাম। কিন্তু আর পারিনি। আমার অক্ষমতা—অপটুতা, সবচেয়ে বেশী ছিল বয়ঃকনিষ্ঠতা আর অনভিজ্ঞতা। এ-সব আমি ভুলে গেলাম। ভুলে গেলাম বিরাট বিরূপ জনতাব অস্তিত্ব। ভুলে গেলাম প্রতিষ্ঠাশালী সাহিত্যসেবী বয়োঃজ্যেষ্ঠ আব 'মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মওলানা নজীর আহমদ চৌধুবী সাহেবের কথা।

তাঁর বক্তৃতায় আমি বাধা দিলাম। বললাম : কবির 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার পাশা', 'খেয়াপারের তরণী' আবৃত্তি করুন। আবৃত্তি করুন তাঁর 'শাতিল আবব', 'কোরবানী' আর 'মোহররম'। আস্বাদ করুন তাঁর 'পূজারিণী'র রস।

সামনের চেয়ারগুলি দখল করে বসেছিল ইলিয়ট হোস্টেলের ছেলেরা। এরা মাদ্‌রাসায় পড়ে, আর রক্ষণশীলদের দলে। প্রগতিশীল ছাত্রেরা থাকতো ওর পাশেই বেকার হোস্টেলে। ওঁদের অল্পসংখ্যক ছেলে পেছনের দিকের চেয়ারগুলো দখল করে বসেছিল।

এদের সবারই তরুণ মন। নজীর আহমদ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে সবাই একযোগে "না—না" ধ্বনি করছিল।

আমার বাধা পেয়ে সবাই একযোগে মার মার করে চীৎকার করে উঠলো।

নজীর আহমদ সাহেবের কণ্ঠ থেকে উত্তেজনার মুহূর্তে ইংরেজী বেরিয়ে এলো। তিনি আমার দুর্বলতা জানতেন। বললেন: "who are you?"

সে কী চীৎকার, যেন মেঘের গর্জন!

আমিও তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। তাঁর চেয়ে বেশী জোরে আমি চীৎকার করে উঠলাম: "I am Moinuddin!"

সভা স্তব্ধ হয়ে গেলো। পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে তাকিয়ে দেখি আমাদের একজনও কেউ কাছে নেই। একটু নার্ভাস হয়ে পড়লাম। এমন সময় ফজলুর রহমান এগিয়ে এলেন।

এখন তিনি খ্যাতিমান কবি। 'দীওয়ান-ই-জেবুন্নিসা'র অনুবাদক। কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত উকীল। কিন্তু তখন তিনি বেকার হোস্টেলে থাকেন। একজন সাধারণ ছাত্র। উত্তেজনায় তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন বেরিয়ে আসছে। তিনি আমাকে সমর্থন করে চীৎকার করছেন। সভায় তখন বিরাট হট্টগোল চলছে। একদল বলছে: মওলানা বক্তৃতা করতে থাকুন—আর একদল বলছে ঐ ছেলেটি (আমি) কি বলতে চায় তা' আমরা শুনবো। সে এক বিরাট হট্টগোল। সবাই চুপ চুপ করছে, কিন্তু চুপ করছে না কেউ। ফলে গোলমাল আরো পেকে উঠতে লাগল।

এর মধ্যে কে একজন গিয়ে 'সওগাত' অফিসে এই গোলমালের খবর দিতেই আমাদের যাঁরা যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, দৌড়ে এলেন। আল্লার অপার মহিমা। এমন সময় এসে পড়লেন সভার নির্দিষ্ট সভাপতি, খান বাহাদুর আসাদুজ্জমান সাহেব ও জনাব জালালুদ্দীন হাশেমী সাহেব। হাশেমী সাহেব সাহিত্যসেবী নন,

সাহিত্যরসিক। তিনি করেন রাজনীতির চর্চা। তিনি নজরুলভক্ত। সেদিন মাঠে কি একটা ভালো ফুটবল খেলা ছিল। আমাদের ছাত্র-সমর্থক প্রায়ই গিয়েছিল মাঠে খেলা দেখতে। খেলা শেষে তারাও এসে সভায় ঢুকে পড়লো। এদের পেয়ে আমরা সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যথারীতি সভায় কাজ আরম্ভ হলো। একটু আগে যে একটা বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, এখন তার অবসান হয়ে গেছে। অতএব আর বেশী বক্তৃতা করার প্রযোজনবোধ না করে সরাসরি "জাতির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হোক" বলে প্রস্তাব উত্থাপিত হলো। হাশেমী সাহেব মিনিট পনেরো মাত্র বক্তৃতা করলেন। মাঝে মাঝে নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। খান বাহাদুর সাহেবও নজরুলকে সমর্থন করে বক্তৃতা করলেন।

সভা শান্ত সমাহিত। সভাপতি সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন: "এই প্রস্তাবের বিরোধী কেউ আছেন; হাত তুলুন।"

কেউ হাত তুললেন না।

তিনি আবার বললেন: "পক্ষে যারা আছেন, হাত তুলুন।"

এবার সবাই একযোগে হাত তুললেন। উত্তেজনায় কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়লেন। আর নিজের সমর্থন বেশী করে জানাবার জন্য দু'হাত তুললেন।

মওলানা নজীর আহমদ সাহেব কোণের একখানা চেয়ারে বসেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিলেন। আর কয়েকজন ধরে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিচ্ছিলেন। সভা ভঙ্গ হলে জনতার হাত থেকে রক্ষা করে নাসিরউদ্দীন সাহেব তাঁকে 'মোহম্মদী' অফিসের নিকটে নামিয়ে দেবার জন্য ওয়াজেদ আলী সাহেবের গাড়ীতে তুলে দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ও-গাড়ীতে তিনি যাননি।

এই সভায়ই সংবর্ধনার নির্দিষ্ট দিন ঠিক করা হলো। বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে মূল-সভার সভাপতি নির্বাচিত করা হলো।

অভ্যর্থনা সভার সভাপতি হলেন মিঃ এস. ওয়াজেদ আলী আর সম্পাদক নির্বাচিত হলেন কল্লোল-সম্পাদক শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ ও সওগাত-সম্পাদক এম, নাসিরউদ্দীন সাহেব।

পূর্ণ উদ্যমে সংবর্ধনা সভার-প্রস্তুতি চলতে লাগল। সারা বাঙলা দেশের বিভিন্ন কোণ থেকে দিনের পর দিন আসতে লাগল উৎসাহসূচক বাণী। কিন্তু রক্ষণশীলদের কেউ কেউ গুজব ছড়ালেন: সংবর্ধনা সভায় ভীষণ হট্টগোল হবে, অতএব কেউ যেন সভায় না যায়।"

কিন্তু তাঁদের এ-গুজব কোথায় তলিয়ে গেলো। নির্দিষ্ট দিনে সারা কলকাতার লোক যেন ভেঙে পড়লো গিয়ে এলবার্ট হলে। ওপরে, নিচে, সিঁড়িতে, রাস্তায় লোক আর ধরে না। স্থানাভাবে কত লোক যে ফিরে গেলো তা' বলে শেষ করা যায় না।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষণ

সেদিন ছিল ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৯ সাল। রবিবার। বেলা ঠিক দু'টোর সময় আগাগোড়া ফুল দিয়ে সাজিয়ে এক বিরাট মোটরে করে কবিকে এলবার্ট হলে নিয়ে যাওয়া হলো। সমবেত জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো।

সভা আরম্ভ হলে প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য, এম-এ নজরুলের বিখ্যাত গানটি গাইলেন:

"চল চল চল
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণদল
চলরে চলরে চল—।" ইত্যাদি।

মূল সভাপতি স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় একটি চমৎকার অভিভাষণ দিলেন। তিনি বললেন: "আজ বাঙলার কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের যাদুকরী প্রতিভায় বাঙলা দেশ সম্মোহিত হয়ে আছে। তাই অন্যের প্রতিভা তেমন করে ধরা পড়ছে না। আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমার সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন। আজ আমি এই ভেবে

বিপুল আনন্দ অনুভব করছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খ্রীস্টান ছিলেন। কিন্তু বাঙালী জাতি তাঁকে শুধু বাঙালীরূপেই পেয়েছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবিরা সাধারণতঃ কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তা' নন। কারাগারের শৃংখল প'রে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা' লিখেছেন, তা' বাঙালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।"

এরপর মিঃ এস. ওয়াজেদ আলী জাতির পক্ষ থেকে নিচের অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন ঃ

কবি নজরুল ইসলাম

করকমলেষু

কবি,

তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙালীকে চির-ঋণী করিয়াছ তুমি। আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতা-সিক্ত সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।

তোমার কবিতা বিচার-বিস্ময়ের ঊর্ধ্বে—সে আপনার পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাগলা-ঝোরার জলধারার মতো। সে স্রোতধারায় বাঙালী যুগ-সম্ভাবনার বিচিত্র লীলা-বিম্ব দেখিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের বিস্ময়-মুগ্ধ কণ্ঠের অভিনন্দন লও।

বাঙলার সরস কাব্যকুঞ্জ তোমার প্রাণের রঙে সবুজ মহিমায় রাঙিয়া উঠিয়াছে। তাহার ছায়া বাঙালীর পলকহারা নীল নয়নে নিবিড় স্নেহ-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের মুগ্ধ নয়নের নির্বাক-বন্দনা গ্রহণ কর।

তুমি বাঙালীর ক্ষীণকণ্ঠে তেজ দিয়াছ, মূর্চ্ছাতুর প্রাণে অমৃত-ধারা সিঞ্চন করিয়াছ। আজ অরুণ ঊষার তোরণ-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারা তোমার মরণ-জিগীষু কণ্ঠের জয়-ইঙ্গিত নতমস্তকে বরণ করিতেছে,—

তাহাদের হাতের পতাকা তোমার মহিমার উদ্দেশ্যে অবনমিত হইয়াছে। জাতির এ-অভিবাদনে তুমি নয়নপাত কর!

তুমি বাঙলার মধুবনের শ্যামা-কোয়েলার কণ্ঠে ইরানের গুল-বাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ, রসালের কণ্ঠে সহকার-সাথে আঙুর-লতিকার বাহু-বন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালীর শ্যামশান্তকণ্ঠে ইরানী-সাকীর লাল সিরাজীর আবেশ-বিহ্বলতা দান করিয়াছ। আজ তোমার আসন প্রান্তে হাতের বাঁশী রাখিয়া তাহারা তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তুমি তাহাদের শ্রদ্ধা-সুন্দর চিত্ত-নিবেদন গ্রহণ কর।

ধূলার আসনে বসিয়া মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে-গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়নসায়রে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। মানুষের ব্যথাবিষে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, চিরঞ্জীব মনীষী তুমি, তোমাকে আজ আমাদের সবাকার মানুষের নমস্কার।

গুণমুগ্ধ বাঙালীর পক্ষে

নজরুল-সংবর্ধনা-সমিতির সভ্যবৃন্দ।

কলিকাতা, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৯।

এরপর সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জনতার বিপুল করতালি-ধ্বনির মধ্যে সোনার দোয়াত-কলম ও একটি রূপার চোঙায় (Casket) ভরে অভিনন্দন-পত্র কবির হাতে দেন।

এরপর একটি আবাহন-সঙ্গীত গান করেন শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য আর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। গানটি তাঁরা এ জন্যই লিখেছিলেন। গানটি এই:

ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সরসীতে তুমি
সুন্দর সিত শতদল।

সঞ্চরে শ্যাম-সুষমাতে তব
অন্তরে সুধা-পরিমল ॥
দুর্যোগে ভরা তমসার রাত,
তোমার প্রকাশে লভিল প্রভাত,
অরুণের রাগে পরাগে পরাগে ;
রক্তিম তব হিয়াতল ॥
অনুদিন তট-বন্ধন-হারা
গভীর জীবনে যাপিয়া,
প্রতিভা-প্রভায় উঠিয়াছ তুমি
জীবনের প'রে ছাপিয়া,
ঝঞ্ঝা যখন বহিল অধীর ;—
তুমি অশান্ত, তুমি অথির ;
কণ্টক যবে বিঁধেছে তোমারে
স'য়েছ নীরবে অচপল ॥
অন্তবিহীন কান্ত রবি সে,—
নাহিক তোমারো অবসান,
বিকচ তোমার সুরভির সুরে
বিচিত্র তব অবদান ;
তোমারে সবার সম অধিকার ;
ভারতীয় তুমি শুভ উপচার,
সখ্যে তোমার কত না মরাল
পক্ষে ঢাকিল কালো জল।
হে শুচিস্মিত, শুভ্র-কোমল,
সুরভি-স্নিগ্ধ শতদল ॥

কবি নজরুল ইসলাম এইবার অভিনন্দন-পত্রের জওয়াব দিতে ওঠেন। জনতা এমন জয়োল্লাস আর আনন্দ-ধ্বনি করতে থাকে যে,

প্রাব প্রায় ১৫ মিনিট কাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর তিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে অভিনন্দনের জওয়াব দেন: তাঁর জওয়াবটি এই:

"বন্ধুগণ!

আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে দিলেন, আমি তা' মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটি মাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।

এক-বন ফুল মাথা পেতে নেবার মত হয়ত মাথায় আমার চুলের অভাব নেই, কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কি দিয়ে? আমার হৃদয়-ঘট যে ভরে উঠলো! নদীর জল মঙ্গল-অভিষেকের ঘটে বন্দী হয়ে তার ভাষা হারিয়েছে। আজ যদি আমি কিছু বলতে না পারি আপনারা আমার সে অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন। আমি যে-নদীর জলধারা সেই নদীকূলে যাবেন আপনারা, তবে না চাইতেই আমার ভাষা, আমার গান সেখানে শুনতে পাবেন।

আজ বলবার দিন আপনাদের, আমার নয়। তা ছাড়া, আপনাদের ভালোবাসার অতিশয়োক্তিকে অন্তত: আজকের দিন যে হারিয়ে দিতে পারব, সে ভরসা আমার নেই। আজ আমার ভাষা শুভ-দৃষ্টির বধূর মত লাজকুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা। সে যদি নাচুনে মেয়েই হয়, অন্তত: আজকের দিনে তাকে নাচতে বলবেন না।

আজ হয়ত সত্যি-সত্যিই আমার অভিনন্দন হয়ে গেল। এ শুধু আপনাদের—যাঁরা এ-সভায় এসেছেন ফুলের সওগাত নিয়ে, তাঁদের বলছিনে। আমি নেপথ্যের সেই বড় বন্ধুদের কথা বলছি, যাঁরা এখানে না এলেও আমার কথা ভুলতে পারছেন না এবং হয়ত একটু বেশী করেই স্মরণ করছেন,—ফুল ফোটানোর চেয়ে হুল-ফোটানোতেই যাঁদের আনন্দ!

ও-দিক দিয়ে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যিই একটু বেশী রকমের

প্রসন্ন। যাঁরা আমার বন্ধু, তাঁরা যেমন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায় ভালোবাসেন, যাঁরা বন্ধুর উল্টো, তাঁরা তেমনি চুটিয়ে বিপক্ষতা করেন। ওতে আমি সত্যি-সত্যিই আনন্দ উপভোগ করি। পানসে বন্ধুত্বের চেয়ে চুটিয়ে শত্রুতা ঢের ভালো। বড় বন্ধুত্ব আর বড় শত্রুতা বেশ বাগসই ক'রে জড়িয়ে ধরতে না পারলে হয় না। যিনি আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি থাকেন, তিনি আমার নিশ্চয়ই পরম অথবা চরম আত্মীয়। আজকের দিনে তাঁদেরও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা-নমস্কার নিবেদন করছি।

আমার বন্ধুবা যেমন পাল্লার একধারে প্রশংসার পর প্রশংসার ফুলপাতা চড়িয়েছেন, অন্য পাল্লায় অ-বন্ধুরদল তেমনি নিন্দার পর নিন্দার ধূলো-বালি-কাদা-মাটি চড়িয়েছেন এবং ঐ দুই তরফের সুবিবেচনার ফলে দুই ধারের পাল্লা, এমন সমভার হয়ে উঠেছে যে, মাঝে থেকে আমি ঠিক থেকে গেছি, এতটুকু টলতে হয়নি।

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেই দিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই 'ভালো লেগেছে' টাকে ভালো করে বলতে পারার এই উৎসবে আমার একটি মাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিতমুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ করে মুক্তি দিন। আমাকে বড়-বলার বড়-বলি করবেন না। সভার যূপকাষ্ঠে বলি হবার ভয়েই আমি সভার এবং সবার অন্তরালে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পলাতক বলেই যদি আমায় ধরে এনে শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধরে এনে তাকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন।....

শুধু লেখা দিয়ে নয়, আমায় দিয়ে যাঁরা আমায় চেনেন, অন্ততঃ তাঁরা জানেন যে, সত্যি-সত্যিই আমি ভালো-মানুষ। কোনো অনাসিষ্টি করতে আসিনি আমি। আমি যেখানে ঘা দিয়েছি, সেখানে ঘা খাবার প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল।

পড়-পড় বাড়ীটাকে কর্পোরেশনের যে-কর্মচারী এসে ভেঙ্গে দেয়, অন্যায় তার নয়, অন্যায় তার, যে ঐ পড়-পড় বাড়ীটাকে পুষে রেখে আরো দশজনের প্রাণনাশের ব্যবস্থা ক'রে রাখে।

আমাকে 'বিদ্রোহী' ব'লে খামখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনো দিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে! আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

এ-কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজও উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীটসের মত আমারও মন্ত্র—"Beauty is Truth, Truth is Beauty."

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে, কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজও দিতে পারিনি; আমার দেবার ক্ষুধা আজও মেটেনি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতকা সাগর-সন্ধানী জলস্রোত আমি; সেই গিরি-শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি! যেন মরু-পথে পথ না হারাই! —এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ-শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান-সেনাদলের তূর্য বাদকের একজন আমি —এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথ-যাত্রার পাকে পাকে, বাঁকে-বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ প্রখর-দশন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি! এবং তাদের নখর-দশনের ক্ষত আজও আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।

ঈশান-কোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষার-ঘন প্রশান্তি দেখে, নির্লিপ্ততা দেখে। ঝড়ের বাঁশী যেদিন বাজবে, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে

আসবে তার পূর্ব-পরিচয় নিয়ে। নব-বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন, তাঁদের মত হলুম না বলে, —তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের ক'রে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের-ধ্যান তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি ব'লেই কবি। বনের পাখী নীড়ের ঊর্ধ্বে উঠে গান করে ব'লে বন তাকে কোনোদিন অনুযোগ করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড়া করে ব'লে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউই হয়ত সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেটুকুই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন। আমগাছকে চৌ-মাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠেঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পারবে না। উল্টো এ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে।...

যৌবনের শক্ত-শিখ মশাল ধরে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বরযাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই ব'লে যাঁরা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না আমিও আছি তাঁদের দলে; তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে। ফুল-মেলার নওরোজে আমায় খরিদ্দাররূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেরও বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যান-মূর্তি আজও পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেদিন উঠবে, সেদিন আমিও আসব ঐ মেলায় শাহজাদা খুর্‌রমের মতই আমার চোখে তাজের স্বপন নিয়ে।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে,

তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ ক'রে দেখার স্তব-স্তুতি।

কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি ও-দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত-মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে; তা হলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁট-ছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোন বেগ পেতে হবে না। কেন না, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।....

বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে ধূলো-বালি, এত ধোঁওয়া, এত কোলাহল উঠেছে যে, ওর মাঝে সামান্য দীপ-বর্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভবে, আমিও মবব।

কিন্তু এ যদি বেদনা-সাগর-মন্থনের হলাহলই হয়, তা হলে ঐ সমুদ্র মন্থনের সব দোষ অসুরদেরই নয়, অর্ধেক দোষ এর দেবতাদের। তাঁদের সাহায্য ছাড়া ত এ সমুদ্র-মন্থন ব্যাপার সহজ হ'ত না। তবু তাঁদের বলি, আজকের হলাহলটাই সত্য নয়, অসহিষ্ণু হবেন না দেবতা—রসে খান, অমৃত আছে; সে উঠল বলে।

আমি আবার আপনাদের আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি-নমস্কার জানাচ্ছি।

আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হতে এসেছি আজ। আপনাদের আমার অজস্র ধন্যবাদ।"

কবির জওয়াব শেষ হবার পর আরও কয়েকটি গান হয়। এরপর মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর স্বভাবসুলভ আনন্দমুখরকণ্ঠে কবি নজরুলের বাণীকে রূপ দেন। তিনি বলেন:

"স্বাধীন দেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নেই। দেশ পরাধীন বলে এদেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুলে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানা দিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব। কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা কম—অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে নজরুল একটা জীয়ন্ত মানুষ।

কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা হ'ত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয় এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা' স্পষ্টই বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাব—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের "দুর্গম গিরি কান্তার মরু"র মত প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।"

সভা শেষ হবার আগে সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আবার উঠে দাঁড়ান। বলেন: "আমরা আগামী সংগ্রামে কবি নজরুলের সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে শ্রীমান সুভাষচন্দ্রের মতো তরুণ-নেতাদের অনুসরণ করব। ফরাসী-বিপ্লবের সময়কার কথা একখানি বইয়ে সেদিন পড়ছিলাম। তাতে লেখা দেখলাম: সে-সময় প্রত্যেক মানুষ অতিমানুষে পরিণত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক-একটি অতিমানুষে পরিণত হবে।"

এরপর সভাপতি, সুভাষচন্দ্র এবং সমবেত জনমণ্ডলীর অনুরোধে কবি তাঁর নিজের লেখা দুটি গান করেন। একটি 'বীরদল চল সমরে' অপরটি 'দুর্গম গিরি, কান্তার মরু'।

এ-দিনের এই উৎসব শেষ হলে নজরুলের বন্ধুদের কয়েকজন তাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। ফিস ফিস করে কি কথা হলো। তারপর তাঁরা এলবার্ট হলের পেছনে রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের একটা বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে চললেন। আমরা ছায়ার মতো লেগে থাকতাম নজরুলের পেছনে। তাই আমি ও বাহার (মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার) ওঁদের পিছু পিছু গিয়ে উঠলাম ঐ বাড়ীর দরওয়াজায়।

সংখ্যায় ওঁরা কুড়ি-পঁচিশজন ছিলেন। সবাই ঢুকে পড়েছিলেন একটা হল কামরায়। আমরা দরওয়াজায় গিয়ে দাঁড়াতেই দু'তিনজন এসে অবরোধ সৃষ্টি করলেন। বললেন: প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আমরা শুনবো কেন? নজরুল যেখানে গেছেন, সেখানে যাওয়ার অধিকার আমাদের আছে—জোর করে আমরা বললাম এ-কথা। আমাদের সাথে তাঁরা ঝগড়া করতে পারেন না। তাতে ব্যাপারটা অন্যরূপ দাঁড়ায়। তাই তাঁরা বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন: এখানে একটা গোপনসভা হবে। নজরুলের খুব অন্তরংগ যাঁরা, একমাত্র তাঁদেরই এ সভায় প্রবেশাধিকার। আমরা বললাম: তাঁর সাথে আমাদের অন্তরংগতার অভাব নেই। তখন বলা হলো: অন্ততঃ পনের বছরের উর্ধ্বকাল ধরে যাঁরা নজরুলের সাথে পরিচিত নন, তাঁদের এ-সভায় ঢুকতে দেয়া হবে না। আমরা

এ-কথা না মেনে জোর করে ঢুকে পড়লাম। আর কামরার এককোণে চুপ করে বসে পড়লাম। ওঁদের সহযোগিতা বা কাজে বাধা দেবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না। এ জন্য আমরা নীরবে বসে রইলাম।

মেঝের উপর সতরঞ্চ পাতা ছিল। ওঁরা সবাই নজরুলকে নিয়ে মাঝখানে বসালেন। আর নিজেরা এক প্রবল ব্যূহ রচনা করে চারদিকে ঘিরে বসলেন। একজন একছড়া ফুলের মালা এনে নজরুলের গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর অপেক্ষাকৃত নিম্ন-কণ্ঠে একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করলেন। তার ভাষায় জোর ছিল, বর্ণনাভংগি অনিন্দ্যনীয়, কিন্তু অশ্লীল !

বুঝলাম ঃ এ জন্যই এঁরা আমাদেরকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। আর বুঝলাম ঃ আমরা উপস্থিত থাকায় এঁদের আমোদ ভালো করে জমলো না !

"কাব্য-সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান"

নজরুল ইসলামের আবির্ভাবকালে তাঁর সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যকে আপামর জনসাধারণ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সবাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করতে থাকেন। এঁরা সবাই ভেবেছিলেন: নজরুল একজন সাধারণ শক্তিমান কবি মাত্র। অতএব সস্তা প্রশংসায় বিশেষ ক্ষতি নেই। কিন্তু ক্রমে নজরুল-কাব্যে দেখা দিল বিরাট অসাধারণত্ব। নজরুল-প্রভাবে সমগ্র বাঙলা-সাহিত্যের ভিত্তিমূল নড়ে উঠলো। মোড় ফিবে গেলো সমগ্র বাঙলা-সাহিত্যের। বৈষ্ণব প্রভাবিত প্রেমের বান-ডাকা যে-সাহিত্য ঘুমপাড়ানী গানের মতো সকলকে মোহাচ্ছন্ন করে বেখেছিল, নজরুলেব আবির্ভাবে তা' বলিষ্ঠ আর সবল হয়ে উঠলো। এলো তাতে ঝড, বিদ্যুৎ আর বিপ্লব। ভীরু বাঙালীর কলমে যে এত জোর থাকতে পারে, নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বে তা' কেউ ভাবতেই পারেনি। সমগ্র দেশ চমকে উঠলো। আগুন ধরে গেলো সকলের রগে রগে—রেশায় রেশায়। তাই একদল লোকের মন হিংসায় আর বিদ্বেষে আর্তনাদ করে উঠলো। তাঁরা নজরুল-নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠলেন। নানা অজুহাত সৃষ্টি করে তাঁর লেখা অসার বলে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগলেন। যে-পরিমান প্রশংসা তিনি পেলেন, নিন্দার আবর্জনার স্তূপ তাঁর চারপাশে জমলো তারচেয়ে কম নয়। কিন্তু নজরুলের লেখার প্রবহমান গতি তাঁরা রোধ করতে পারেন নি। উচ্ছল বেগবান ঝরনাধারায় যেন সে নিন্দা-গ্লানি কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলো; ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেলো সকল বাধার অর্গল।

মুসলমানদের ভেতরে যাঁরা নিন্দা-প্রচারে ব্রতী হলেন, তাঁরা ছিলেন সংকীর্ণ গণ্ডির ভেতরে আবদ্ধ। প্রশ্ন তুললেন: "নজরুল-কাব্যে ইসলামী ভাবধারা নেই—প্রায় লেখাই তাঁর হিন্দু-ঘেঁষা।"

আর মুষ্টিমেয় হিন্দুদের ভেতর থেকে যে প্রতিবাদ উঠলো, তাতে যথেষ্ট মুনশীয়ানার পরিচয় পাওয়া গেলো। তাঁরা আওয়াজ তুললেন: "নজরুল-কাব্যের বিশ্ব-সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্যতা নেই।"

এই সময় জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'সওগাতে' "কাব্য-সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান" নামে এক ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখছিলেন। তিনি এই আলোচনা-প্রসংগে আধুনিক বাঙলার কাব্য-সাহিত্যকে তিনটি যুগে ভাগ করেন। মাইকেলী-যুগ, রবীন্দ্র-যুগ, আর নজরুল-যুগ। বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি প্রমাণ করেন: মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন এক-একটি যুগের ধারক ও বাহক, তেমনি নজরুলও একটি নূতন যুগের স্রষ্টা। অতএব তিনি একজন 'যুগ-প্রবর্তক' কবি।

"ইসলামী ভাবধারা নেই" বলে যাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাঁদের তিনি নজরুল-কাব্য উদ্ধৃত ক'রে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির ভাবধারা বিশদ আলোচনা করে দেখান।

তিনি বলেন: "নজরুল ইসলামের সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে যে, তাঁহার কাব্য-রচনার ভিতর ইসলামী প্রকাশ-ভংগি নাই, পরন্তু হিন্দুয়ানীর প্রকাশ-ভঙ্গির ছাপে তাঁহার রচনা পরিপূর্ণ। এই অভিযোগ সম্বন্ধে মনোযোগ দিবার পূর্বে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, নজরুল ইসলাম কোন ভাবের ভাবুক....নজরুল ইসলাম বেদনার কবি।...তিনি নিজের মাতৃভূমি বাঙলা দেশকে কেন্দ্র করিয়াই নিপীড়িত মানবতার বেদনার গান গাহিতেছেন। কিন্তু বাঙলাদেশ তো শুধু মুসলমানের নহে, ইহা হিন্দুরও দেশ বটে। কাজেই বাঙালী-জীবনের বেদনার গান গাহিতে গিয়া যদি তাঁহার রচনার প্রকাশ-ভংগির কোন কোন স্থানে হিন্দুয়ানীর ছাপ পড়ে, তাহা তো কিছুতেই অস্বাভাবিক

বিবেচিত হইতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দেই। "সর্বহারা"-কাব্যে 'মানুষ' শীর্ষক কবিতায় চাষীর প্রতি মানুষের ঘৃণা দেখিয়া মানুষকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন:

"চাষা ব'লে কর ঘৃণা—
দেখ চাষারূপে লুকায়ে জনক-বলরাম এলো কি না!
যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তাঁরাও ধরিল হাল,
তাঁরাই আনিল অমর বাণী—যা আছে, রবে চিরকাল।"

এখানে নিপীড়িত চাষীদের বেদনাই কবির লক্ষ্য। জনক-বলরাম বা নবীদের গুণকীর্তন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। বাঙলার চাষীশ্রেণীতে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আছে। বাঙালী হিন্দুদের জন্য জনক-বলরামের কথা এবং বাঙালী মুসলমানদের জন্য নবীদের উদাহরণ কবি এখানে আনিয়াছেন। ইহাতে চাষীর বেদনা বাঙালীর মনে যে সত্য সহানুভূতির সঞ্চার করিয়াছে, কবির প্রকাশ-ভংগি একদেশদর্শী হইলে তাহা নিশ্চয়ই করিতে পারিত না। সুতরাং যিনি জনক-বলরামের নাম শুনিয়াই কবির অনৈসলামিক প্রকাশ-ভংগিতে বিমুখ হইয়া উঠিবেন, কাব্য উপভোগের ক্ষেত্রে তিনি যে হাস্যাস্পদ হইবেন, তাহাতে আমদের সন্দেহ নাই।

"নজরুল ইসলামের রচনায় ইসলামী প্রকাশ-ভংগি নাই" বলিয়া যাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের কথা যে সত্য নহে, ইহা যাঁহারা নজরুলের 'কামালপাশা,' 'আনোয়ারপাশা,' 'শাতিল আরব,' 'কোরবাণী,' 'মোহর্‌রম,' 'সুব্‌হ্‌ উম্মিদ,' ফাতেহা-ই-দুয়াজদাহাম' প্রভৃতি কবিতা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। এমন ইসলামী প্রকাশ-ভংগিযুক্ত চমৎকার রচনা বাঙলা সাহিতে আর নাই।

"মোরা দিলাবার খাঁড়া তালোয়ার হাতে আমাদেরি শোভা পায়!
তারা খিঞ্জির যারা জিঞ্জির-গলে ভূমি চুমি মূরছায়।
আরে দূর দূর
যত কুক্কুর

আসি   শের-ববরে লাথি মারে ছি ছি ছাতি চড়ে !
ঐ   হাতি ঘাল হতে ফেরু ঘায় ?
ঝনন্ ননন রণ, ঝনঝন্ ঝঞ্জনা শোনা যায়।"

এমন ইসলামী জোশ, এমন মুসলমানী শৌর্য-বীর্যের প্রকাশ বাঙলার আর কোন কাব্যে আছে ? ভীরু বাঙালীর কলমে যে এত তেজ ছিল, তাহা নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আর কে কল্পনা করিতে পারিযাছিল ?... নজরুল ইসলাম বাঙলার জাতীয় কবি। জাতীয় বেদনার কথাই তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দু এবং মুসলমান লইয়া বাঙালী জাতি। সুতরাং এ-জাতির বেদনার কথা প্রকাশ কবিতে হইলে, রচনায় ইসলামী এবং হিন্দুয়ানী উভয় জাতীয় প্রকাশ-ভংগিব ছাপই দিতে হইবে, নতুবা রচনা সহজ ও সুন্দর হইবে না।" (সওগাত—পৌষ, ১৩৩৩)

এর ফলে মুসলমান প্রতিবাদকারীদের কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসে। হিন্দুদের প্রতিবাদের জওয়াব দিতে গিয়ে আবুলকালাম শামসুদ্দীন নজরুল কাব্য দিয়েই প্রমাণ করেন এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, নজরুল বেদনার কবি। তাঁর কাব্যে বিশ্বমানবাত্মার করুণ বেদনার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন ঃ

"নজরুল ইসলাম বেদনার কবি। তাঁহার প্রায় সমস্ত রচনাই বেদনার সুরে ভরপুর। আর্ত-ব্যথিত-উৎপীড়িত মানব-মনের ব্যথাকেই তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া তিনি ফুটাইয়া তুলিতেছেন। বেদনা ব্যক্তিগত মনের অভিব্যক্তি হইলেও ইহার অনুভূতি বিশ্ববাসীর মনেই খেলা করে। সুতরাং বেদনা একটা বিশ্বজনীন অনুভূতি। একজনের ব্যথা দেখিয়া যে অপর একজন লোকও হৃদয়ে বেদনা অনুভব করে, তাহার ব্যথার-ব্যথী হয়, বেদনার বিশ্বজনীনতাই ইহার কারণ। সুতরাং মানবমনের যে অনুভূতি সমগ্র বিশ্ব-মনের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করে, তাহা যে, বিশ্বজনীন কাব্য-রচনার উপযোগী সামগ্রী, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কাব্যকার যখন ব্যক্তিগত বেদনার কথা তুলিয়া বিশ্ববাসীর মনে একটা সহানুভূতির তরঙ্গ তুলিতে পারেন, তাঁহার রচনার ইন্দ্রজালে যখন মানুষ নিজের ব্যক্তিগত বেদনার কথা ভুলিয়া সমগ্র বিশ্ব-মনের বেদনাবোধের সহিত নিজ মনের যোগসাধন করিতে পারে, তখনি কাব্যকারের রচনা সফল হয়—তখনি তাঁহার রচনা, বিশ্বসাহিত্যে স্থানলাভের যোগ্য হয়। নজরুলের কাব্যে বেদনার এই বিশ্বরূপ আছে বলিয়াই তাঁহার কাব্যকে আমরা বিশ্ব-সাহিত্য বলিয়া অভিনন্দন করি। বিশ্ব-মানবের বেদনাব অনুভূতিকে তাঁহার অন্তরের বেদনানুভূতির সহিত যোগ-সাধন করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাব রচনাব ভিতর দিয়া বিশ্ব-সৃষ্টিব প্রতি একটা অপূর্ব সাম্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাব্যে আমবা উৎপীড়িত আর্তজীবের প্রতি যে একটা অভূতপূর্ব সহানুভূতি দেখিতে পাই,—যাহাতে পাপী-তাপী, কুলি-মজুব, চোর-ডাকাত, মিথ্যাবাদী, বারাঙ্গনা প্রভৃতিব হৃদয়ের দুঃখ-বেদনার ইতিহাস ফুটিযা উঠিয়াছে—তাহার কারণই হইতেছে কবির মনের এই সর্বজীবে সাম্যভাব। সর্বজীবে সাম্যভাব যাঁহার কাব্যের মূল কথা, কার সাধ্য তাঁহাব রচনাকে বিশ্ব-সাহিত্য হইতে নামাইয়া দেয়?" (সওগাত—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)।

এরপরও এই নিন্দুকের দল নিরস্ত হননি। নজরুল ইসলাম ছিলেন এ-সকল গালাগালি আর নিন্দা-প্রশংসার অতীত। তাই তিনি এঁদের উপেক্ষা করে নিজের নবরচনাপথ কেটে চলতে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ বলে নজরুল যখন নিজেকে ভেবেছেন, তখন তাঁর মন হয়তো কোনো কোনো সময় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই তিনি জাতির পক্ষ থেকে, তাঁকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয, তার উত্তর দিতে গিয়ে এঁদের কথাও দু-চারটে বলেছেন। 'কল্লোলে' লিখেছেন 'সাবধানী ঘণ্টা'। (কল্লোল,—কার্তিক, ১৩৩১) আর "আমার কৈফিয়ত" কবিতায় জোরালো কণ্ঠে এদের উত্তর দিয়েছেন। পরাধীনতার বেদনা তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। তাই তিনি

কৈফিয়ত দিতে গিয়ে শেষ পংক্তিতে এই বেদনার কথা, এই দুঃখের কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। বলেছেন ঃ

"পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায়, তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।"

'সওগাতে' আবুলকালাম শামসুদ্দীনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় বিশেষ করে নজরুলকে 'যুগপ্রবর্তক' ও 'জাতীয় কবি' বলে আখ্যাত করায়, এই নিন্দুকের দল যেন আরো ক্ষেপে গেলেন। সে যে কী ভীষণ গালাগালি বর্ষিত হতে লাগলো, তা' ভাবতে গিয়ে আজও লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যায়। এরপর তাঁদের মনেও যে অনুশোচনা জাগেনি তা' নয়। পরবর্তীকালে কিন্তু তাঁরা নজরুলের প্রতি, নজরুল-সাহিত্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন।

মুসলমানদের সমস্যা ছিল তখন নানা রকমের। তার ভেতরে ধর্মের গোঁড়ামী ছিল প্রবল, আর সমাজ-জীবনে ছিল চেতনার অভাব। সওগাত-গোষ্ঠী বা সওগাতী দল এই সকল সমস্যার সমাধানে ছিল অকুতোভয়। নজরুলের মাধ্যমে কোলকাতায় এক বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রে এঁরা মুসলিম-বাঙলার সংস্কার-সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন, পরবর্তী-কালে বহুলাংশে জয়ী হয়েছিলেন এঁরা শত গালাগালি খেয়েও।

কোলকাতায় হিন্দুদের ভেতরেও এই সময় একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-বিপ্লবীদল মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, 'কল্লোল' নামে ছোট একখানা মাসিক-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। ১৩৩০ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় 'কল্লোল' দুটি মাত্র তরুণের রক্তাক্ত স্বাক্ষর নিয়ে। এঁদের একজন হচ্ছেন শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ আর একজন শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ। এঁরা অর্থশালী লোক ছিলেন না। দিনের পর দিন অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে এঁদের এক-একটি পা ফেলতে হয়েছে। কিন্তু মনের দিক দিয়ে এঁরা ছিলেন বিপুল ঐশ্বর্যশালী। এঁদের বিপ্লবী-মনের সন্ধান পেয়ে তরুণ-সমাজ নেচে উঠেছিল। ক্ষেপে উঠেছিল। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে তারা ১০।২ পটলডাঙ্গা লেনে—কল্লোলের অফিসে। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল একটা 'কল্লোল-গোষ্ঠী'।

নজরুলের দুটি চোখ। একটি হিন্দু আর একটি মুসলমান। তাই দেখা যায়, কল্লোল-গোষ্ঠীর মধ্যমণি হয়েও এই সময় বসে আছেন নজরুল ইসলাম একখানা বিরাট চেয়ার দখল করে। সাহিত্যক্ষেত্রে

অজাত-শত্রু—সকলের পরমাত্মীয় শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ই এই যোগাযোগ ঘটিয়ে ছিলেন। নজরুলের টানে আমাদের মতো উঠ্‌তি তরুণেরাও অর্থাৎ মুসলিম-তরুণেরাও যেতো 'কল্লোল' অফিসে। সবাই যে লেখা দিতো এমন নয়, তবু তাঁরা হতে পেরেছিলেন কল্লোল-গোষ্ঠীর বন্ধু। এই সময় কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন: দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুল নাগ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, নলিনীকান্ত সরকার, শৈলজা মুখার্জি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, মনীষ ঘটক এবং আরো অনেকে।

সওগাত-গোষ্ঠী বা সওগাতী দলের সম্মুখে যে-সকল সমস্যা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, কলোল-গোষ্ঠীকে সে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাই এককভাবে মনোপ্রাণ ঢেলে দিয়ে এঁরা করতে পেরে-ছিলেন সাহিত্যের চর্চা। নিজেদের উপবাসী রেখে এঁরা যুগিয়ে ছিলেন মানুষের মনের খোরাক। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাঙলা-সাহিত্য গণ-সংযোগ হারিয়ে তখন প্রায় অভিজাত মহলের বিলাসকুঞ্জ অথবা মজলিসী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শরৎচন্দ্র একধাপ নিচে নেমে জনতার দিকে মাত্র হাত মেলে ধরেছিলেন। কিন্তু 'কল্লোল গোষ্ঠী' একেবারে জনতার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কাদা লাগিয়েছিলেন পায়ে। এ জন্য সবাই ভাবতে পেরেছিলেন এ আমার জিনিস। এ আমার মনের কথা। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে স্তিমিত করে তাই এ-সময় একটা নূতন যুগের সৃষ্টি হয়েছিল। গল্পের মাধ্যমে এঁরা এই নতুন যুগের আবাহন সঙ্গীত গেয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম গেয়েছিলেন গান ও কবিতার মাধ্যমে—বলিষ্ঠ কণ্ঠে। নজরুল সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে সে-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় 'মানিকগঞ্জ সাহিত্য-সভায়' (১৯৩৫) তাই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন: "এঁর কবিতার সাথে পরিচিত হয়ে দেখলাম,—এ-তো কম নয়। এ খাঁটি মাটি থেকে উঠে এসেছে। আগেকার কবি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দোতলা প্রাসাদে থেকে কবিতা

লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ দোতলা থেকে নামেননি। কর্দমময় পিচ্ছিল পথের উপর পা পড়লে কেবল তিনি নন, দ্বারকানাথ ঠাকুর পর্যন্ত শিউরে উঠতেন। নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মেছেন জানি না; কিন্তু তাঁর কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশে যে নূতন ভাব জন্মেছে তাঁর সুর তা-ই। তাতে পালিশ বেশী নেই, আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান।—মানুষের একাত্মসাধন। এ অতি অল্প লোকেই করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম নূতন যুগের কবি।—শরৎবাবু ও নজরুল ইসলাম ছাড়া গত দশ বছরের মধ্যে কোনো ভাবুক লেখকের উদয় হয়নি।—জাতির প্রাণে লাঙ্গল এসেছে, নূতন ডিমোক্র্যাট নজরুলের বীণার ঝঙ্কারে তা পাই।" (কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬)

'মোহাম্মদীর' রক্ষণশীল দল যেমন সওগাতী দলকে ঘায়েল করতে চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপ করছিল, তেমনি কল্লোল গোষ্ঠীর ওপরেও রক্ষণশীল 'প্রবাসীর' দল ছুঁড়ে মারছিল বজ্র-শেল। এঁদের কাণাচোখে এঁরা শুধু কল্লোলের গল্প আর কবিতার ভেতরে বস্তির নোংরামি আর অশ্লীল দিকটাই দেখতে পেয়েছিলেন। এঁদের সৃষ্টিতে যে বেদনার অনুভূতি দরিদ্রের প্রতি মমতাবোধ আর ক্ষুধিতের আর্তনাদ মর্মর ধ্বনি তুলেছিল, সে দিকে এঁদের চোখ পড়েনি। অথবা পড়লেও সে চোখ ইচ্ছে করেই বন্ধ করে রেখেছিলেন।

প্রগতিশীল দলগুলিকে নিয়ে উলঙ্গ রসিকতা আর গালাগালি দিতে এঁরা 'প্রবাসী' অফিস থেকে 'শনিবারের চিঠি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেছিলেন। এর উল্লেখ আগে করেছি। এঁদের রসিকতার দুটি নমুনা:

নজরুলের গান:

"কে বিদেশী, মন উদাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,

সুর সোহাগে, তন্দ্রা লাগে
কুসুম বাগের গুল বদনে।" ইত্যাদি

এই গানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অভিজাত মহল থেকে আরম্ভ করে মাঠের রাখালের কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরছিল। শনিবারের চিঠি এই গানের একটি প্যারডি প্রকাশ করে:

"কে বিদেশী বন্-গাঁ বাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,
সুর সোহাগে ভিরমী লাগে
বর ভুলে যায় বিয়ের ক'নে।
ঘুমিয়ে হাসে দুষ্টু খোকা,
বেরিয়ে আসে দাঁতের পোকা,
শিশু-চাঁদে লাগলে ধোকা
সুরমা আঁকা গুল-বদনে।" ইত্যাদি

'কল্লোলে'-প্রকাশিত অচিন্ত্য সেনগুপ্তের একটি কবিতার দুটি লাইন:

"ময়ূর-পঙ্খী তনু—
ময়ূরের মতো পেখম মেলেছে
দেখিয়া উতলা হনু।"

এই তিনটি চমৎকার লাইনকে ব্যংগ করে এঁরা একটি কার্টুন প্রকাশ করেন। তার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: একটি তরুণী মেয়ে ময়ূরের মতো পেখম মেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার ময়ূরপুচ্ছ ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের দিকে। মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি। আর মোটা চশমা-চোখে একটি তরুণ কবি তার দিকে উতলা হয়ে তাকিয়ে আছেন। তরুণ কবির আকৃতি প্রায় হনু—অর্থাৎ হনুমানের মতো।

'শনিবারের চিঠি'র ঈর্ষাতুর আর নোংরা মনের পরিচয়ই পাওয়া গিয়েছিল এতে।

'কল্লোল-গোষ্ঠী'র প্রচেষ্টায় কয়েকটি ভালো বিদেশী বইয়ের তর্জমা বেরিয়ে বাঙলা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছিল। যথা—পবিত্র গাঙ্গুলী তর্জমা করেছিলেন: ন্যুট হামসুনের Hunger—বুভুক্ষা, নৃপেন চ্যাটার্জীর তর্জমা: ম্যাক্সিম গর্কীর Mother—মা, আর গোকুল নাগের তর্জমা: রেঁমা রোলার 'জঁ্যা ক্রিস্তফ'—শেষের বইখানার অনুবাদ শেষ হয়েছিল কি না আমার জানা নেই। গল্প-সাহিত্যে সে যুগে 'কল্লোল-গোষ্ঠী'র দান তুলনাহীন।

'কল্লোলে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সহকারী সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগ দার্জিলিং-এ মারা যান। দুরন্ত যক্ষ্মা হয়েছিল তাঁর। এঁর মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন নজরুল। আর তা ছাপা হয়েছিল কল্লোলে। এই কবিতা পরে নজরুলের 'সর্বহারা' বইয়ে গ্রথিত করা হয়েছে।

'কল্লোলে'র একটি পুস্তক-প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান ছিল কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। হঠাৎ সেখানে একদিন পুলিসে হানা দিয়ে বসে। অপরাধ: ওঁরা নজরুলের 'বিষের বাঁশী' বইখানা রেখেছিলেন বিক্রয়ের জন্য। এ-ব্যাপারে নির্বিবাদী তরুণ-সাহিত্য-সেবীদের ভেতরে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময়ই 'বিষের-বাঁশী' বাজেয়াফ্‌ত্‌ হয়। (ইং ১৯২৪, বাংলা ১৩৩১)।

'বিষের বাঁশী' বাজেয়াফত্‌ হলে হবে কি? এতে তার বিক্রি ব্যাহত হয়নি। ১৯২৫ সালে ফরিদপুরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হয়। এতে মহাত্মা গান্ধী যোগ দিয়েছিলেন। এখানেই গান্ধীজীর সাথে নজরুলের প্রথম পরিচয় ঘটে। এই সম্মেলনে নজরুল তাঁর 'চরকার গান' গেয়ে গান্ধীজীর বিশেষ স্নেহলাভ করেন। লোকচক্ষুর আড়ালে এই সম্মেলনে বিষের বাঁশীর শত শত কপি বিক্রি হয়েছিল। এর গোপনতা রক্ষার জন্য 'বিষের বাঁশীর' নাম দেয়া হয়েছিল—'বড়বই'। এ-ভাবে যে-টাকা পাওয়া গিয়েছিল, তাতে নজরুলের বিশেষ ফায়দা হয়নি। বার ভূতেই এ-টাকা লুটে খেয়েছিল।

কোলকাতা থেকে 'কালি-কলম' ও প্রবাসী বাঙালীদের মুখপত্র 'উত্তরা' বার হতো তখন কাশীধাম থেকে। ঢাকা থেকে বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় বের হতো 'প্রগতি'। আধুনিক বাঙলা-সাহিত্য প্রচার ও প্রসারে এঁদের দানও কম নয়, বিশেষ করে কথা-সাহিত্যে। এঁদের সবারই সুর ছিল প্রায় 'কল্লোলের'ই সুর। বোধহয় তারই প্রতিধ্বনি করতেন এঁরা।

নজরুলের একটি গান

রবীন্দ্র-সংগীতে তখন বাংলার মাঠ-ঘাট প্লাবিত। এই সময় নজরুল ইসলাম গান রচনায় মনোনিবেশ করলেন। সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাব যে তিনি কাটিয়ে উঠেছেন, তার বৈশিষ্ট্য, তার স্বকীয়তা আগেই ধরা পড়েছিল। কিন্তু গানের রাজ্যের অবিসম্বাদিত নেতা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটানো ছিল এক কল্পনাতীত ব্যাপার। কারণ তখন গান যাঁদের দ্বারা গীত হচ্ছিল, যাঁরা লালন করছিলেন রবীন্দ্র-সংগীত, তাঁরা ছিলেন অনেকেই অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। রবীন্দ্রনাথের স্বগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এঁরাই রবীন্দ্র সংগীতের রূপ দিচ্ছিলেন আর সৃষ্টি করছিলেন এক অপরূপ পরিবেশ। এই পরিবেশের ব্যূহ ভেদ করে অন্যের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।

নজরুল-প্রতিভা নজরুলের একান্ত অজ্ঞাতসারে এই ব্যূহকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। সংগীতে আনলেন তিনি অপূর্ব বলিষ্ঠতা। যার ফলে সমগ্র বাঙলা দেশের তরুণ-তরুণীর মনে নিয়ে এলো এক পুলক-চাঞ্চল্য। নজরুল-সংগীত নওযোয়ানের রক্তে রক্তে জাগালো নয়া যামানার স্পন্দন। এ জন্য খুব অল্প সময়ের মধ্যে নজরুল-সংগীত জনগণের সমর্থন পেলো। মাঠের রাখালের কণ্ঠ থেকে অভিজাত-আসর পর্যন্ত সমানভাবে নজরুল-গীতি ছড়িয়ে পড়লো। রক্ষণশীলদল যে এতে রীতিমতো শংকিত হয়ে উঠেছিলেন, আর প্রাচীর তুলে দিয়ে এই নতুন প্লাবন নিরোধের চেষ্টা করেছিলেন, ওয়াকিফহাল মহলের দৃষ্টি তা' এড়ায়নি।

বাঙলা আর বাঙালীর গানে নজরুল আনলেন নতুন সুর, নতুন দৃষ্টিভংগী। অনেকগুলি নতুন সুর তার নিজেরই সৃষ্টি। এ ছাড়া বিদেশী অনেক সুর তিনি বাঙালী চিত্তের উপযোগী করে পরিবেশিত করেন। এ-সকল সুরের মধ্যে গজল-গানই সমধিক প্রসিদ্ধ। 'কে বিদেশী, মন উদাসী, বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।' অথবা 'চেয়ো না সু-নয়না, আর চেয়ো না এ-নয়ন পানে' প্রভৃতি গান অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাঙলার মাঠে-ঘাটে, শস্য-শ্যামল প্রান্তরে, এক প্রাণ চঞ্চল সুরের সংঘাত গিয়ে দোলা দেয়।

আমার মনে পড়ে প্রসিদ্ধ সুরশিল্পী শ্রীনলিনীকান্ত সরকার এক সময় বলেছিলেন "এই সকল নতুন সুর সংগ্রহের জন্য নজরুল ইসলাম অনেক সময় হিন্দুস্তানী সংগীতজ্ঞ হইতে রাস্তার ভিক্ষাজীবী সংগীত-কারীদিগের পর্যন্ত সাহায্য গ্রহণ করেন।"—এ কথা আমরা অস্বীকার করি না।

সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যকলাপটিয়সী মিস্ ফরিদা এক সময় কোলকাতায় এসেছিলেন তাঁর নৃত্যকলা প্রদর্শনের জন্য। তিনি এসেছিলেন মিশর থেকে। বিশাল জনতার বিরাট একটা অংশ অল্পদিনেই তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়ে। তাই তাঁর নাচ দেখার জন্য আগ্রহ ও ভিড় বাড়তে থাকে। শোনা গেলো, অ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে মিস্ ফরিদার নাচ দেখাবার এক বিপুল আয়োজন করা হয়েছে। তখন নজরুল ও আমি সওগাতের সংগে সংশ্লিষ্ট। নজরুল বললেন: "যাবি, ফরিদার নাচ দেখতে?"

একজন উঠতি তরুণের পক্ষে এ-প্রলোভন ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। বললাম: "নিশ্চয়ই।"

আর সকলকে না জানিয়ে ওয়েলেসলী থেকে কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সন্নিকটে অ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে গিয়ে হাজির হলাম। আমাদের সংগে সওগাত-সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী জনাব নাসিরউদ্দীন সাহেবও ছিলেন।

চিত্র-বিচিত্র আলোকমালায় প্রেক্ষাগৃহ শ্রীমণ্ডিত। অপূর্ব বিস্ময়ে

আমরা নির্দিষ্ট আসনে বসে যবনিকার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছি। ধীরে ধীরে যবনিকা অপসারিত হলো। মৃদু পদক্ষেপে মঞ্চের ওপর এগিয়ে এলেন মিস ফরিদা। সারা গৃহে তখন নিস্তব্ধ নীরবতা। মিস ফরিদার দেহ তাঁর দেশের উপযোগীভাবে গঠিত। স্বাভাবিকভাবে স্থূল। নৃত্যের একান্ত অনুপযোগী বলে আমাদের মনে হলো। কিন্তু এই দেহকে তিনি লীলায়িত গতিভংগীমায় চঞ্চল করে তুললেন। কী বিরাট সাধনা ছিল এর পেছনে। ভাবতে গিয়ে এখনো হতবাক হয়ে যাই। মানুষ অকারণে তাঁর নৃত্যানুরাগী হয়নি। ঘণ্টাখানেক তিনি সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন। তারপর আরম্ভ হলো তার গানের সংগে নৃত্য। কয়েকটি মিশরী-গানকে নাচ দিয়ে রূপায়িত করলেন। ওর একটা লাইন মনে আছে। তা হচ্ছে :

"ইশারিনা ফুস্—উসারিনা ফুস্—ফুস্—ফুস্—ফুস্।"

এর মানে তখনো বুঝিনি, এখনো জানি না। কিন্তু তাঁর নৃত্যভংগিমায় আমাদের সামনে তা' জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। তাই আজও তার কথা মনে আছে।

এরপর তিনি দেখালেন : প্রদীপ নৃত্য। তিনটি থালায় প্রদীপ সাজিয়ে দু'হাতে দুটি ও মাথায় একটি নিয়ে তিনি তাঁর নৃত্যভংগী দেখালেন। প্রদীপগুলো একটু কাঁপলো না, একটাও নিভলো না। সারা মঞ্চ তাঁর চটুল পদক্ষেপে কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠতে লাগলো। মাঝে মাঝে তিনি মঞ্চের ওপর এমনভাবে নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগলেন, তাঁর গতি দেখে দর্শকের মনে হতে লাগলো, সম্ভবতঃ তাঁর শরীরে শুধু মাংসপিণ্ড ছাড়া হাড়ের লেশমাত্র নেই।

এর পর তিনি শুরু করলেন নৃত্য সহযোগে একটা উর্দু গজল। এই গজলটি মিস ফরিদা এ দেশে এসে শিখেছিলেন। আর উর্দু গজল তিনি ঐ একটি-ই জানতেন বলে পরে শুনেছিলাম। গজলটির প্রথম দু'লাইন :

"কিস্‌কি খায়রো ম্যাঁয় নাজনে, কবরো মেঁ দিল হিলা দিয়া,
চায়নো-সে সো রাহাথা ম্যাঁয়, কিসনে মুঝে জাগা দিয়া।"

তাঁর মিশরী-যবানে উর্দু'র উচ্চারণ হাস্যোদ্রেক করার কথা। হে, শিন আর খে'র উচ্চারণ-প্রাবল্যই ছিল তাতে বেশী। কিন্তু সাফল্যজনক সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে এবং চমক লাগানো নৃত্যের আবেষ্টনে উচ্চারণ-দোষকে তিনি ঢেকে ফেলেছিলেন। তাই আমাদেরকে তিনি মুগ্ধ আর বিভ্রান্ত করে ফেললেন। নজরুলের মনে এ-গান কোন্ ভাবের সৃষ্টি করেছিল, তা' আমাদের বুঝবার উপায় ছিল না। একটা পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে আমরা প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করলাম।

এর পরবর্তী সংখ্যা সওগাতে (পৌষ, ১৩৩৩) নজরুলের "আসে বসন্ত ফুল বনে, সাজে বনভূমি সুন্দরী" গানটি বার হলো। এ-গানটি রচিত হয়েছিল মিস ফরিদার কাছ থেকে শোনা উক্ত উর্দু গজলেরই সুরে। পুরা গানটি এখানে উদ্ধৃত করে দিয়ে আমরা পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করছি। গানটি তিনি পাঠিয়েছিলেন কৃষ্ণনগর থেকে। গানটি এই :

"আসে বসন্ত ফুলবনে
        সাজে বনভূমি সুন্দরী।
চরণে পায়েলা রুমুঝুমু
        মধুপ উঠিছে গুঞ্জরী॥

ফুলরেণু-মাখা দখিণা বায়
বাতাস করিছে বন-বালায়,
বন-করবী—নিকুঞ্জ ছায়
        মুকুলিকা ওঠে মুঞ্জরী॥

কুহু আজি ডাকে মুহুমুহু,
"পিউ কাহাঁ" কাঁদে "উহুউহু",
পাখায় পাখায় দোঁহে দুঁহু
        বাঁধে চঞ্চর চঞ্চরী॥

দুলে আলো-ছায়া বন-দুকূল
ওড়ে প্রজাপতি কল্‌কা-ফুল,
কর্ণে অতসী স্বর্ণ দুল,
আলোক-লতার সাত-নোরী ॥

পদ্ম ডলিয়া-পা'য় বালা
করিয়াছে সারা বন আলা,
দ্বারে মঞ্জরী-দীপ্‌ জ্বালা
ডালপালা রচে ফুল্‌ছড়ি ॥

কবি, তোর ফুলমালি কেমন
ফাগুনে শূন্য পুষ্প বন !
বরিবি বঁধুরে এলে চমন
রিক্ত হাতে কি ভুলভরি ॥"

এ গানের ভাব-সম্পদ মিস ফরিদার লীলায়িত নৃত্যভংগী অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে—এ-কথা বললে সম্ভবতঃ অন্যায় হবে না।

কোলকাতায় নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলামের আর্থিক অপ্রতুলতা তাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি বারবার। কিন্তু এ জন্য তাঁকে কোনোদিন মুষড়ে পড়তে দেখিনি। অভাব তাঁকে কোনোদিন দমাতে পারেনি। এমন একটি দিন দেখিনি, টাকার অভাবে তিনি মুখ ম্লান করে বসে আছেন। কাল সকালে বাজার কি করে হবে, তার হয়তো কোনো সংগতি নেই, আজ সন্ধ্যায় নিউ মার্কেট থেকে দু'টাকা দিয়ে তাঁর জন্য রজনীগন্ধার মালা নিয়ে আসতে হবে। হাসির হররা আর গানের মজলিস তাঁর পূরোদমে চলেছে। অন্তর্নিহিত বেদনাকে তিনি হাসির উচ্ছ্বাসে চাপা দিতে চেয়েছেন কি না জানি না। কোনোদিন দুঃখের দীর্ঘশ্বাস তাঁর বেরিয়ে আসেনি দ্বিতীয় ব্যক্তির সামনে। তাঁর দারিদ্র্যকে অন্তর দিয়ে হয়তো অনুভব করেছেন তিনি। কিন্তু সেই দারিদ্র্যকে ঢাকঢোল পিটে জন-সমাজে প্রচার করতে তিনি কোনোদিনই চাননি।

তাঁর বন্ধুদিগের মধ্যে অর্থশালী লোকের ছেলেপিলের অভাব ছিল না। এক কথায় হাজার হাজার টাকা দিয়ে দিতে পারে, এমন বিত্তশালী গুণমুগ্ধ ভক্তের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। কিন্তু নিজের অভাবের কথা জানিয়ে কারো কাছে হাত পাততে তিনি ঘৃণাবোধ করতেন। কর্তব্যবোধে কেউ কেউ হয়তো বিভিন্ন উপায়ে তাঁকে সাহায্য করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতি সমাজের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি বরাবরই কুণ্ঠাবোধ করতেন।

কৃষ্ণনগর থেকে বন্ধুরা সংবাদ বহন করে আনতে লাগলেন,

নজরুলের সংসার অচল অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। চালের হাঁড়িতে তাঁর ইঁদুরে 'বক্সিং খেলতে' শুরু করেছে।

এ-সংবাদে কোলকাতার বন্ধুরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কি করা যায়। 'সওগাত' অফিসে বসে অনেক ভেবে সবাই ঠিক করলেন: তাঁকে সকলের চোখের সামনে কোলকাতায় থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া যাক। এখানে এসে পড়লে এক ব্যবস্থায় তাঁর সংসার চলেই যাবে।

যে-কথা সেই কাজ। কিছুদিন পর তিনি সপরিবারে কোলকাতায় চলে এলেন। চলে এলেন কৃষ্ণনগরের পাট চুকিয়ে। এসে তিনি উঠলেন সওগাত অফিসে—১১, ওয়েলেসলী স্ট্রীটে। নিচের দু'খানা অপরিসর কামরা তাঁকে ছেড়ে দেয়া হলো। আপাততঃ তিনি এখানেই থাকবেন, তারপর ভালো বাড়ী দেখে দিতে হবে।

কৃষ্ণনগরে থাকতেই অনেকগুলো টাকা তিনি দেনা হয়েছিলেন। এককালীন বেশ কিছু টাকা তাঁর দরকার। কিন্তু এই টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?

একদিন নিরিবিলি পেয়ে কবিকে বললাম: "ভাই, আপনার ভক্তদের মধ্যে নামজাদা যাঁরা, তাঁদের নাম দিয়ে একটা আবেদন-পত্র ছড়িয়ে-দি' কাগজে কাগজে। দেশবাসীকে বলি: আপনাদের প্রিয় কবি দারুণ অর্থকষ্টে আছেন,—আপনারা সাহায্য করুন। কি বলেন?"

মুখে তিনি এর কোনো জওয়াব দিলেন না। দিলেন ঠাস করে একটা চড়। বললেন: "শয়তান! আমাকে কি ভিক্ষুক ঠাউরেছিস?"

সত্যি লজ্জিত হলাম। কিন্তু অর্থই বা কোথায় পাওয়া যায়? সওগাতের অবস্থা তখন এমন নয় যে, এঁরা একাই নজরুল-পরিবারের ষোলো আনা সাহায্য করতে পারেন।

একটা "নজরুল-জয়ন্তী" করে কিছু টাকা তোলার ব্যবস্থা করা যায় কি না, এ-সম্বন্ধে একটা টুকিটাকি আলাপ চলছিল।

বললাম : "নজরুল-জয়ন্তী করে তার মারফতে টাকা যোগাড়ের চেষ্টা করলে আপনার আপত্তি আছে ?"

হেসে বললেন : "না।"

তখন সবাই মিলে ঠিক করা হলো, একটা "নজরুল-জয়ন্তী" করা হবে।

সওগাত-সম্পাদক নাসিরউদ্দীন, বর্তমান আজাদ-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ, হাবীবুল্লাহ বাহার প্রমুখ অনেকেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এতে যোগ দিলেন।

এলবার্ট হল লোকে লোকারণ্য। মহা ধুমধামে "নজরুল-জয়ন্তী" সমাপ্ত হলো। খরচ-খরচা বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হলো, তা কবিকে দিয়ে দেয়া হলো। এ-অর্থ নিতে তিনি অস্বীকার করেননি। কিন্তু অভাব-গ্রস্ত হয়ে অর্থ সাহায্যের জন্য কারো কাছে হাত পাততে তাঁকে কখনো দেখিনি। যাক, এইভাবে কোলকাতায় আসার প্রথম ধাক্কা তিনি সামলে নিলেন।

নজরুলের পুত্র বুলবুলের বয়স তখন তিন কি সাড়ে তিন বৎসর হবে। 'সওগাত' অফিসে আমাদের সকলের কোলে কোলে থাকে। একদিন নাসিরউদ্দীন সাহেব প্রস্তাব করলেন : "চলুন সব, ফটো তুলে আসা যাক।"—তখন সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। ঠিক হলো : বন্ধুদের স্ত্রীদের ফটোই শুধু নেয়া হবে। পুরুষেরা সবাই থাকবে বাদ। কারণ অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, এঁরাই তাতে রূপ দিচ্ছেন। সমাজের কঠোর বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে এঁরা স্বামীদের চিন্তাকে কার্যকরী করছেন। সওগাত-অফিস থেকে পায়ে হেঁটে এঁরা প্রায়ই যেতেন গড়ের মাঠের দিকে।

সওগাত-গোষ্ঠীর অন্যান্য বন্ধুরা সেদিন সেখানে ছিলেন না। সেদিন ওখানে ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ, আবু লোহানী, আর মোহাম্মদীর বিজ্ঞাপন-বিভাগের ম্যানেজার মোহাম্মদ জোবেদ আলী। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন সবাই সপরিবারে নজরুলের স্ত্রীর সাথে দেখা

করতে গিয়েছিলেন। আমি আর আমার স্ত্রী কর্পোরেশন স্কুলে তখন চাকুরী করি। স্কুল-ফেরত আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

নজরুল ইসলামের স্ত্রী আশালতা সেনগুপ্তাকেও (বর্তমানে মিসেস প্রমীলা নজরুল) আমাদের সাথে ফটো তুলতে যেতে অনুরোধ করা হলো। কিন্তু তিনি ছিলেন এমনি লজ্জাশীলা যে কিছুতেই তিনি এত লোকের সাথে যেতে রাজী হলেন না। নজরুল বললেন: "তা'হলে বুলবুলকে নিয়ে যান আপনারা।"

তা-ই হলো। আমার স্ত্রীর পরনে যে কাপড় ছিল, ফটোতে তা ভালো উঠবে না বলে নজরুলের স্ত্রী তাঁর কালোপেড়ে একখানা শাড়ী ওঁকে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

বুলবুলের ফটোর জন্যই বিশেষ করে সেই গ্রুপফটো এ-বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

এর কিছুদিন পর নজরুলকে কোলকাতা ইণ্টালী অঞ্চলে, পান-বাগান লেনে একখানা বাড়ী দেয়া হলো। তিনি থাকেন পান-বাগানে, আর অফিস করেন সওগাত অফিসে। সেখানে গান হয়, কবিতা লেখা হয়, সাহিত্য-আলোচনা হয়, আর বসে বসে বিরুদ্ধ দলের মুণ্ডপাত করা হয়। বেশ চলে দিন।

এর মধ্যে সচিত্র 'সাপ্তাহিক সওগাত' বের করা হয়েছে। তাতে লিখে চলেছেন নজরুল তাঁর 'কুহেলিকা' উপন্যাস ঝড়ের বেগে। 'চানাচুর' শিরোনামে করে চলেছেন রসিকতা। এ জন্য 'সাপ্তাহিক সওগাত' খুব অল্প দিনের ভেতরই জনপ্রিয় হয়ে পড়লো। যে-দিন এই পত্রিকাখানা বের হতো সেদিন হকাররা তিন ঘণ্টা আগে থেকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো।

পূর্বে যে "নজরুল সংবর্ধনা"র কথা আলোচনা করেছি, এ ব্যাপারে 'সাপ্তাহিক সওগাতের' ছিল বিরাট দান।

কবি গোলাম মোস্তাফা সাহেবের 'গর্ভবতী' কবিতার এক প্যারডি লেখা হয়েছিল 'গর্ভবান' নামে। তা' সাপ্তাহিক সওগাতেই ছাপা

হয়েছিল। এই প্যারডি প্রথমে লেখেন শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। পরে তা' কিছু কিছু রদবদল করে দেন নজরুল ইসলাম। 'শিশু-সওগাতে'র জন্যও অনেক লেখা যোগাতে হতো নজরুল ইসলামকে।

দুপুর বেলা একদিন সওগাত অফিসে বসে আছি, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে খবর দিলেন: "নজরুলকে কে যেন নিচে ডাকছেন।" নাসিরউদ্দীন সাহেব বললেন: "তাঁকে এইখানেই ডেকে নিয়ে আসুন।" কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। বললেন: "না, কবিকে নিচেই যেতে হবে।"

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম কবি নিচে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। নাসিরউদ্দীন সাহেব আপত্তি করলেন। কারণ আমাদের ধারণা ছিল, একবার হাতছাড়া করলে শীগ্‌গির আর তাঁকে পাওয়া যাবে না। কবি শুনলেন না। বললেন: "আপনারা বসুন আমি এক্ষুণি আসছি। আমি ঠিক ফিরবো। এক্ষুণি ফিরবো। আচ্ছা, আমি আমার চাদর রেখে যাচ্ছি। এখন বিশ্বাস হলো তো?" —হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে তিনি নিচে নেমে গেলেন।

মিনিট দশেক পরে কেমন সন্দেহ হলো। খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, কবি নিচে নেই। সওগাত-অফিসের আশেপাশে কোথাও নেই। বুঝলাম: যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা তাঁকে ঠিক ধরে নিয়ে গেছেন। এতক্ষণ কোন্ আড্ডায় নিয়ে তাঁকে ফেলা হয়েছে, কে জানে? সারাদিনের ভেতরে কবি এলেন না। পরদিনও না।

আমার স্ত্রীকে কয়েক দিনের জন্য দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ঐ দিন রাত্রির ট্রেনে তাঁকে আনতে আমি বাড়ী চলে এলাম। গায়ে দিয়ে নিয়ে এলাম কবির গচ্ছিত রেখে যাওয়া চাদর। নীল আভায় ঝলমলে সুন্দর চাদর।

দিন পাঁচ-ছয় পরে কোলকাতায় ফিরে গিয়ে দেখি, 'সওগাত'-অফিসে তখনও কবি ফেরেননি। কোথায় আছেন কেউ জানেন না। কবির বাড়ীতেও সবাই উৎকণ্ঠিত।

দশ বারদিন পর একদিন কবি হঠাৎ এসে সওগাত-অফিসে উপস্থিত। কত প্রশ্ন করা হলো, সঠিক উত্তর পাওয়া গেলো না।

আমাকে বললেন: "আমার চাদর কোথায় রে?"

বললাম: "ধোবার বাড়ী পাঠিয়েছি। ওটা আমি গায়ে দিয়ে দেশ থেকে ঘুরে এলাম, ঢাকা জেলা ঘুরে এলো আপনার চাদর। না ধুয়ে তো আর আপনাকে দেয়া যায় না!"

এর কয়েক দিন পরেই জানতে পারলাম: কবির পুরাতন বন্ধু মোহাম্মদ আফজালুল হক সাহেব 'নওরোজ' নামে একখানা মাসিক বের করছেন। এর অর্থ যোগাবার ভার নিয়েছেন কবি বে-নজীর আহমদ সাহেব। কবি নজরুল তাতে যোগ দিয়েছেন ওঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধে।

সম্ভবতঃ পরপর চার সংখ্যা 'নওরোজ' বেরিয়েছিল। তারপর পুলিসের হ্যাংগামায় পড়ে 'নওরোজ' গিয়েছিল বন্ধ হয়ে। আর তার নিজস্ব প্রেস 'দৈনিক ছোলতানে'র প্রেসে পরিণত হয়েছিল। সে পৃথক ইতিহাস।

এরপর নজরুল কোলকাতার বিশাল-জনারণ্যে হারিয়ে গেলেন। আমার পক্ষে তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা মুশকিল হলো। কখন কোথায় থাকেন, তার পাত্তা পাওয়া যায় না।

কয়েকজন হিন্দু-বন্ধু জুটে তাঁকে পানবাগানের বাসা থেকে উত্তর কোলকাতার দিকে নিয়ে গেলেন। আজ বেনিয়াটোলা, কয়েক দিন পরই বিবেকানন্দ রোড, তারপর মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট—এমনি তাঁর বাসা বদল হতে লাগলো। বার বার ঘুরে প্রত্যেক বাড়ীতেই তাঁর সাথে গিয়ে দেখা করেছি, যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি।

মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের বাড়ীতে ঘটলো তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম মর্মন্তুদ ঘটনা। যে-ঘটনায় তাঁর জীবনে আনলো অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

বুলবুলের মৃত্যু

কোলকাতার মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের ছোট একটা তিনতলা বাড়ীতে নজরুল ইসলাম থাকতেন। আমাদের কাছে এই বাড়ী ছিল একপ্রকার তীর্থস্থান। হাজারো কাজের ফাঁকে প্রতিদিন অথবা দু'একদিন অন্তর এই বাড়ীতে না গেলে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতাম। কবি এমন যাদু করেছিলেন শুধু আমাকে নয়, বন্ধু-বান্ধব সকলকেই।

একদিন বেলা তিনটে কি চারটে হবে। আমি গিয়ে হাজির হলাম কবির বাড়ীতে। দেখলাম: দোতলার একটা কামরায় বসে একান্ত নিবিষ্টচিত্তে কবি কি যেন লিখছেন। আমাকে দেখেই একটু হেসে ইঙ্গিতে বসতে বললেন।

অনেকটা দূরে আমি চুপ করে বসে আছি, এমন সময় বুলবুল তার ছোট ছোট পা ফেলে, ওপরতলা থেকে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আর "কাকা" বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুকে। তখন ওর বয়স চার কি সাড়ে চার বৎসর হবে।

আমি বুলবুলকে কাছে বসিয়ে ফিস ফিস করে কথা বলতে লাগলাম। আর ওর হাতের খেলনা দিয়ে ওকে আস্তে আস্তে খেলা দিতে লাগলাম। আমার খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল, যাতে কবির লেখায় কোনো ব্যাঘাত না জন্মে। কিন্তু ছোট অবুঝ ছেলে বুলবুল—নজরুলের মতোই যার চোখে প্রতিভার দীপ্তি, দুর্দান্ত আর অশান্ত বলেও যাকে আমরা জানি, তাকে কি চুপি চুপি খেলা দেয়া চলে? হঠাৎ এক সময় সে চেঁচিয়ে উঠলো, লাফিয়ে উঠলো উচ্ছ্বসিত উল্লাসে।

এ চীৎকারে লেখা বন্ধ করে কবি খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দিলেন ধমক—আমাকে নয়; বুলবুলকে। বললেন: "দুষ্টু ছেলে,—যাও, এখান থেকে যাও, বের হও।"

সেই ছোট শিশু নিজের অন্যায় বুঝলো। পিতার রাগ বুঝলো। মুখ কাচু-মাচু করে মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এত দুঃখ হলো আমার মনে যে তা আজও আমি ভুলতে পারিনি। শুধু দুঃখ নয়, আমার লজ্জাও হলো। আমারই ত্রুটির জন্য কি বুলবুল এমন করে বকা খেলো?

খানিকক্ষণ পর লেখাটা শেষ করে কবি উঠলেন। বললেন: "কি রে, কেমন আছিস?"

আমি এ-প্রশ্নে কান দিলাম না। বললাম: "আপনি রাগ করতে পারেন বুলবুলের ওপর? কেন, এমন হঠাৎ রেগে গেলেন? এমন রাগ তো আপনার দেখিনি কখনো?"

তিনি বোধহয় আমার দুঃখ বুঝলেন। মুখে মৃদু হাসি টেনে বললেন: "তুই একটু বোস, আমি আসছি।"

একটু পরেই তিনি বুলবুলকে কোলে নিয়ে ফিরে এলেন। বললেন: "ছেলেমানুষ, ও-রাগে ওদের কি হয়? ও-সব কথা কি ওদের মনে থাকে?"

আমি বুলবুলকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলাম। কিন্তু সে অভিমানী ছেলে তখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও ওর সাথে আর আলাপ জমাতে পারলাম না। এরপর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি চলে এলাম।

পরদিন আবার যখন কবির বাড়ীতে গেলাম, শুনলাম: ওপরের কামরায় বুলবুলকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার ভীষণ জ্বর।

মনের ভেতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। কেন, জ্বরতো অনেকেরই হয়। এজন্য আমার মন এমন করছে কেন? একটু

পরে নজরুলের শাশুড়ী—আমাদের মাসীমা এসে সামনে দাঁড়ালেন। বললেন : "কাল কি হয়েছিল বাবা ?"

বললাম : "কি আর হবে, বুলবুল হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিল, তাই কবি তাকে ধমক দিয়েছিলেন, আর কি হবে ?"

মাসীমা বললেন : "নূরুর (নজরুলের) দোষ ঢাকবার জন্য তুমি আমার কাছে লুকুচ্ছ। নূরু নিজেই আমাকে বলেছে, সে নাকি বুলবুলকে ধমক দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল ?"

আমি বললাম : "এতে লুকাবার কি আছে, মাসীমা ? পিতা রেগে গিয়ে যদি ওকে ঘব থেকে বেরিয়ে যেতে বলে থাকেন, তাতে দোষের কি আছে ?"

মাসীমাব মুখ অত্যন্ত ম্লান হয়ে গেলো। বললেন : "তুমি বুঝতে পারবে না বাছা,—বুঝতে পারবে না।"

তিনি ওখান থেকে চলে গেলেন।

একটা অমংগল-আশংকার তিনি যে-ইংগিত দিলেন, এ-কথা বুঝে আমিও অত্যন্ত শংকিত হয়ে উঠলাম।

এর দু'একদিন পরে জানা গেলো, বুলবুলের গায়ে বড় বড় গুটি বেরিয়েছে—মারাত্মক রকমের বসন্ত হয়েছে তার। চিন্তায় ভাবনায় সবাই আমরা মুষড়ে পড়লাম। তারপর চললো যতো রকমের তদবীর, যার যা' জানা আছে।

একজন বহুদর্শী চিকিৎসকের অধীনে শেষপর্যন্ত রাখা হয়েছিল তাকে।

বুলবুলের গায়ে গুটি বার হবার সম্ভবতঃ সাত কি আটদিন পরের ঘটনা। বিকেল চারটে। নজরুল ওপর থেকে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। বললেন : "দেখ, দমদমে নাকি একজন সাধু থাকেন। তিনি সর্বরোগে ধন্বন্তরী। একবার তাঁকে ডেকে আনতে পারিস ?"

দোতলার কামরায় আমি তখন একাই বসে ছিলাম। বাইরে যারা

চলা-ফেরা করে, তাদের কাউকে রোগীর কাছে যেতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল। তাই এখানে বসে ছিলাম। বললাম: "কেন পারবোনা, এখনই যেতে হবে, না, কাল সকালে গেলে চলবে?"

দমদম ওখান থেকে কাছের পথ নয়। হয়তো ফিরতে রাত হবে। তাই কালকের কথা বললাম। কিন্তু কবি আকুল হয়ে বললেন: "না, না, তোকে আজই, এক্ষুণি যেতে হবে।"

আমি বললাম: "বেশ যাচ্ছি, কিন্তু আর কাউকে কি পাওয়া যাবে না? অজানা-অচেনা জায়গা, একজন সংগী হলে ভালো হতো।"

কবি এ-কথার কোনো জওয়াব দিলেন না। আর দাঁড়ালেন না তিনি। বোধ হয় দাঁড়াবার মতো মনের অবস্থা তাঁর ছিল না। তিনি ওপরে চলে গেলেন।

এমন সময় শান্তিপদ সিংহ—আমারই বয়সী এক ভদ্রলোক এলেন। এসে আমার কাছে দাঁড়ালেন। আমি এঁকে চিনতাম। নজরুল-ভক্ত। একসময় 'ধূমকেতু'র ম্যানেজার ছিলেন ইনি। তাঁকে ব্যাপারটা দু'মিনিটে বুঝিয়ে দিলাম। তারপর তাঁকে অনুরোধ করলাম, আমার সাথে দমদম যেতে। ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করে রাজী হলেন আমার সংগী হতে।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার পথে চীৎকার করে বললাম: "শান্তিকে পেয়েছি। ওঁকে নিয়ে দমদম গেলাম।"

ওপর থেকে কবির ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে এলো: "আচ্ছা।" আমাদের কাছে তা' আর্তনাদের মতো শোনালো।

আমরা যখন বাসের শেষ সীমায় গিয়ে নামলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। দু' দিকে ঘন বন। তার বুক চিরে ছোট মেটে রাস্তা। লোক-চলাচল বিরল। গা ছম ছম করতে লাগলো। ঐ জংগলে কোনো হিংস্র জানোয়ার থাকাও আশ্চর্য নয়। যে-কোনো মুহূর্তে এসে আক্রমণ করতে পারে।

দুই বন্ধু, বন্ধুর পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। লোকজন

কাউকে পাচ্ছি না, কা'কে সাধুর বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করবো! তবু আন্দাজী এগিয়ে চললাম।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর একজনের সাথে আমাদের দেখা হলো। দেখলাম: সাধুর বেশ নাম-ডাক আছে। লোকটিকে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে সাধুর বাড়ীতে যাওয়ার একটা পথের নির্দেশ দিলো। তা' আমাদের বোধগম্য হলো না। লোকটিকে ভীষণ বিপদের কথা বারবার করে বললাম। আমাদের প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝালাম। অনেক খোশামোদ করলাম। অবশেষে সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজী হলো।

আমাদের ভাগ্য ভালো। লোকটিকে না পেলে সাধুর বাড়ী খুঁজে নিতে আমাদের সেদিন ভীষণ অসুবিধা হতো।

অনেক আঁকা-বাঁকা ছোট পথ পেরিয়ে একসময় আমরা একটি ছোট মেটে বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ জমাট বেঁধে উঠেছে। তারই ক্ষীণ আলোকে দেখলাম: একটি অর্ধবয়সী মেয়ে তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করছেন। অনেকক্ষণ পর মেয়েটি মাথা তুলে আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন: "কি চাই আপনাদের?"

আমরা সাধুর কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি তাঁর যা' জওয়াব দিলেন, তা' অত্যন্ত হতাশাপূর্ণ। বললেন: "সাধু তো এখন বাড়ীতে নেই। কখন ফিরবেন তা-ও আমার জানা নেই। সেই দুপুর বেলায় তিনি কোলকাতায় গেছেন।"

এতো দূর থেকে, এতো কষ্ট করে এসেও সাধুকে বাড়ীতে পাওয়া গেলো না। মনে, হতাশার সঞ্চার হলেও, দুঃখ হলেও বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কারণ বিদ্রোহী নজরুলের সাহচর্যে থেকে সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর আমাদের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। সারা রাস্তা শুধু এ-কথাই ভাবতে ভাবতে এসেছিলাম যে, যে-কবি তাঁর লেখায় বিদ্রোহের বাণী প্রচার করেছেন, আইন অমান্য এক বিদ্রোহী বলে

নিজেকে সদম্ভে ঘোষণা করেছেন, তিনি কি করে সাধু-সন্ন্যাসীর তুকতাকে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন! তবু, তাঁর ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা বিবেচনা করে মেয়েটিকে কবির বাড়ীর ঠিকানা লিখে দিলাম। বললাম: "তিনি কখন ফিরবেন তা' যখন জানা নেই, তখন অনিশ্চিতভাবে এখানে বসে থেকে কি হবে? আপনি দয়া করে আজই একবার এই ঠিকানায় সাধুকে পাঠিয়ে দেবেন। যত রাত হোক।"

আমাদের ফিরবার বাস প্রায় গতিশীল হয়ে উঠেছিল। আমরা তাড়াতাড়ি এসে বাসে উঠে পড়লাম। এ-বাস ছেড়ে গেলে প্রায় দু'মাইল দূরে দমদম স্টেশন। সেখান থেকে শেয়ালদ'—তারপর ট্রাম, তারপর কবির বাড়ী। সে অনেক হ্যাংগাম।

কবির বাড়ীতে যখন ফিরে এলাম, তখন বেশ রাত হয়েছে। রাত তখন সাড়ে আট কি নয়টা হবে। আমাদের সাড়া পেয়ে কবি ওপর থেকে ছুটে নিচে নেমে এলেন। আর বুকে জড়িয়ে ধরেই হু হু করে কেঁদে ফেললেন। বললেন: "ওরে, সাধু কি এলেন না? কি বললেন তিনি? আচ্ছা বলতে পারিস, সাধু মরাদেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারেন কি না? বল—বল, তিনি কি মরাদেহে প্রাণ দিতে পারেন?"

তিনি আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর এমন অতর্কিত আক্রমণে, আর এই এলোমেলো কথায় হকচকিয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হলো না। শুধু অর্থহীন দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক তাকাতে লাগলাম। ঘরভরা গিস গিস করছে লোক। কবি বার বার আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনী দিতে লাগলেন, আর ঐ একই কথার পুনরুক্তি করতে লাগলেন।

ঘরে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বোধ হয়, আমার বিপন্ন অবস্থা বুঝতে পারলেন। একজন এগিয়ে এসে বললেন: "মিনিট দশেক আগে বুলবুল মারা গেছে।"

আছাড় খেয়ে কবির বুকের ওপর পড়লাম। বললাম: "ভাই মরাদেহে কি কেউ প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারে?"

একজন কবিকে ধরে ওপরে নিয়ে গেলেন। তার ঘণ্টাখানেক পর ওখান থেকে বাসায় ফিরে এলাম।

কোলকাতা কর্পোরেশনের দু'নম্বর ডিস্ট্রিক্ট গো-খানার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট জনাব আবদুল হামিদ এবং আরো অনেকে ওখানে ছিলেন। সকলে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করা হয়েছিল: আজ রাতে আর লাশ নাড়াচাড়া করে লাভ নেই। কাল সকালে এসে যা' হয় করা যাবে।

পরদিন সকাল ন'টা। কবির বাড়ীতে গিয়ে হাজীর হ'লাম। তখন অনেকেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আবার অনেকেরই আসতে এখনো দেরী আছে। স্থির হয়েছিল: বাগমারী গোরস্তানে বুলবুলকে কবর দেওয়া হবে। সেখানেই গোসল এবং কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হবে।

নজরুল বললেন: "বাবা আমার খালি 'ভোঁ-গাড়ীতে' চড়তে চাইতো—ওকে কি মোটরে করে নিয়ে যাওয়া যাবে না?"

কেউ কেউ বললেন: "হাঁ, চেষ্টা করে দেখতে হবে। কোনো ড্রাইভার বসন্ত রোগীর লাশ তার গাড়ীতে তুলতে চাইবে কি না—বুঝতে পারছি না।"

এই সময় শুনতে পেলাম: পূর্বদিন যে-সাধুকে দমদমে খবর দিতে গিয়েছিলাম, তিনি কালই এসেছিলেন। তখন রাত এগারোটা।

বহু চেষ্টার পর একজন শিখ ড্রাইভারের গাড়ী পাওয়া গেলো। তবে তাঁকে পাঁচটাকা দিতে হবে। তখনকার বাজার দরের তুলনায় প্রায় চার গুণ বেশী।

কিন্তু টাকা? আর্য পাবলিশিং হাউস, ডি, এম, লাইব্রেরী অনেক জায়গাই লোক পাঠানো হয়েছিল টাকার জন্য। শুধু ট্যাকসী ভাড়াই তো নয়। কাফন আছে, গোর-খোদাই আছে, তারপর জমি

কিনে কবরের স্থান রিজার্ভ করার ব্যবস্থা আছে—প্রায় দেড়শো টাকার দরকার। সে যুগে—দেড়শো টাকা তো অনেক। এতো টাকা কোথায় পাওয়া যাবে? এই মুহূর্তে?

যে-লোক টাকার জন্য গিয়েছিল, ফিরে এসে খবর দিলো, কোথাও টাকা পাওয়া গেলো না। আবার ডি, এম, লাইব্রেরীতে তাকে পাঠানো হলো।

এরপর সম্ভবতঃ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা নিয়ে ডি, এম, লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী গোপাল দাস মজুমদার মহাশয় নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। তবু অনেক টাকা বাকী রয়ে গেলো। জনাব হামিদ বাদ-বাকী টাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সমস্যা হলো: কে, বা কারা লাশ বয়ে নিয়ে ঠ্যাকসিতে তুলে দেবে। সবাই 'বাবু' আর 'সাহেব' লোক। এ-ছাড়া বসন্ত রোগীর লাশ।

আমি নিজে একজন নার্ভাস রোগী। পাঁচশত মাইল দূর থেকে কোনো বসন্ত বা কলেরা রোগীর খবর এলে ভাবি: আমাকেও ঐ রোগে ধরলে বুঝি। কিন্তু নজরুল-ভক্তি এমনি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল আমাকে যে, কি হচ্ছে, কি করতে যাচ্ছি, সমগ্র অনুভূতি যেন হারিয়ে ফেলেছি আমি। সবাইকে ইতস্ততঃ করতে দেখে আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম: "আমি বয়ে নিয়ে যাব লাশ।" কিন্তু ঐ লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়া কি একার কাজ?

পাশেই এস, এম, জহুর উদ্দীন দাঁড়িয়ে ছিলেন। (বর্তমানে ইনি ঢাকা বারের একজন প্রসিদ্ধ উকিল—কৃষ্ণনগরে বাড়ী। গল্প লেখক এস, এম, আকবর উদ্দীনের ভাই।) তাঁর হাত ধরে বললাম: "চলুন।"

নজরুল সংগে করে আমাদের ওপরে নিয়ে গেলেন।

যে ঘরে বুলবুলকে রাখা হয়েছিল, সে-ঘরটি মাঝারি গোছের। দরওয়াজাটি অপ্রশস্ত। সমস্যা হলো: কি করে ওকে বাইরে আনা

যাবে। লোক বেশী হলে ভালো হতো। বসন্ত রোগীর লাশ কাল থেকে পড়ে আছে। ফুলে একটায় তিনটে হয়েছে। জহুর মাথার দিকে ধরলেন, আর আমি দু'হাত কোমরের নিচে দিয়ে উঁচু করে তুলে ধরলাম। বসন্ত গুটিকার রস গলে গলে আমাদের গায়ে পড়তে লাগলো। চামড়া উঠে এসে আমাদের হাতে লেপটে যেতে লাগলো। আমরা তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে, দরওয়াজার দিকে এগুতে লাগলাম।

জহুর কোনো রকমে দরওয়াজা পার হয়ে গিয়েছিলেন। আমি পড়ে গেলাম মুশকিলে। অন্য কেউ সাহায্যকারী নেই। সংকীর্ণ দরওয়াজা। ওদিকে মাথা ঠেকে গেছে বারান্দার রেলিংএ। লাশ ঘোরাতে গিয়ে লাশের হাঁটুর কাছে চৌকাঠ আটকে গেলো। জহুর তো চেঁচামেচী করতে লাগলেন।

বললাম: "দাঁড়ান, দেখা যাক কি করা যায়।" বহুকষ্টে কায়দা করে করে সংকট কাটালাম। কিন্তু অতি সাবধান হওয়া সত্বেও বুলবুলের হাঁটুর ওপরকার খানিকটা চামড়া উঠে দুমড়ে গেলো। এই সংকটের সময় আর সবাই নিচে দোতলায় ছিলেন। নতুবা হয়তো আর কারো সাহায্য পাওয়া গেলেও যেতে পারতো।

দোতলায় আসার পর হাঁটুর ওপরকার দুমড়ানো চামড়া দেখে নজরুল ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন: "আহা! কচি শিশু, তাকে এমনভাবে আঘাত দিলি?"

আমি বললাম: "ভাই, কি আর করা যাবে। বহু চেষ্টা করেছিলাম এরূপ দুর্ঘটনা এড়াবার। কিন্তু ছোট দরওয়াজা কিছুতেই এড়ানো গেলো না।"

মোটর গোরস্তানে এসে পৌঁছলো। ওখানকার দু'জন "হাজী" যথারীতি গোসল দিয়ে দিলো আর কাফন পরিয়ে দিলো।

সারা গা ঘিন ঘিন করছিল। এ-অবস্থায় আমাদেরও গোসল করা উচিত ছিল। কিন্তু পানির কল ছিল খুব নীচু এবং তাতে প্রেসার ছিলো কম। আর পুকুরের চারদিকের অবস্থা দেখে ওখানে গোসল

করতেও প্রবৃত্তি হলো না। কোন রকমে হাত-পা ধুয়ে অজু করে জানাজার নামাজে শরীক হলাম। দেখলাম : অজু করে মাথায় রুমাল বেঁধে নজরুলও আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

হিন্দু-বন্ধুরা তখন বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

নামাজগাহ থেকে লাশ কবরগাহ পর্যন্ত আমি আর জহুর-ই বয়ে নিয়ে গেলাম। তখন সমস্যা দাঁড়ালো : কবরে নামবে কে ? বেলা তখন প্রায় দুপুর গড়িয়ে গেছে। আমার শরীর ঝিম ঝিম করছিল। অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আমি কবরে নামতে রাজী হলেম না। জহুর কবরে নেমে আমাকে বার বার ডাকতে লাগলেন। চারদিকে অনেকগুলি চোখ আমার দিকে তাকিয়ে। হয়তো নেমে পড়তাম। কিন্তু তার আগেই কবি-বন্ধু আবদুল কাদির সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তিনি লাফ দিয়ে কবরে নেমে পড়লেন। বললেন : "ও অনেক খেটেছে, এবার ও একটু জিরিয়ে নিক।"

যে-স্থানে বুলবুলকে কবর দেয়া হয়েছিল, সে-স্থানটি একটি বিশেষ ফি (সম্ভবতঃ পঞ্চাশ টাকা) দিয়ে কিনে রিজার্ভ করা হয়েছিল। পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কবরটি পরে বাঁধিয়ে দেয়া হবে। আর নজরুলকে দিয়ে একটি কবিতা লিখিয়ে পাথরে খোদাই করে স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করা হবে।

আর্থিক দুরবস্থা নজরুলের কোনদিনই কাটেনি। ফলে গড়িমসি করে কবরটিও আর বাঁধানো হয়নি।....

চার বছরের কোমল কচি শিশু বুলবুল। ওর চেহারায় কি একটা মাদকতা ছিল জানি না। যে দেখেছে, সে ওকে আর ভুলতে পারেনি। চোখে মুখে যেন একটা প্রতিভার দীপ্তি জ্বল জ্বল করতো। ছন্নছাড়া উচ্ছৃংখল নজরুলের সে ছিল এক শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। পিতার স্নেহকোমল বৃত্তিগুলি যেন ওরই ভেতরে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।

বুলবুলকে হারিয়ে (১৯৩০) নজরুল এমনভাবে মুষড়ে পড়লেন

যে, এরপর থেকে তাঁর মুখের দিকে তাকাতেও আমাদের ভয় হতো। তাঁর লেখাও অনেক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করলো এর পর থেকে। নজরুলের লেখার সেই বিদ্রোহের চিরবৈশিষ্ট্য সুর যেন গেল হারিয়ে। সেখানে এসে ভিড় করলো ধ্যান-স্তিমিত ভাব আর আধ্যাত্মবাদের সুর।

মানুষের সহজাত বাৎসল্য, বুলবুলের ভীষণ ও ভয়াল রোগশয্যায় নজরুলের কবি-মনকে অভিভূত করে ফেলেছিল। তখন থেকেই আল্লাহর অদৃশ্যশক্তির কাছে তাঁর বিদ্রোহী-আত্মা পরাজয় স্বীকার করেছিল। এই জন্যই সম্ভবতঃ তিনি সাধু-সন্ন্যাসী, ফকীর-দরবেশের ওপর ভক্তিমান হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে এক সাধুর খোঁজে তিনি যে এতো আকুলি-বিকুলি করে দমদমায় পাঠিয়ে ছিলেন, তার মূলেও ছিল বাৎসল্যরসে-সিঞ্চিত তাঁর পরাজিত মনোভাব। দিন-দিনই তাঁর এই পরাজয় তাঁকে বাইরের দুনিয়া থেকে অন্তরের দুনিয়ার দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। লক্ষ্যযোগ্য যে, এরপর তিনি তাঁর আবেদন, গানের ভেতর দিয়েই প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ কবিতা এর পর থেকে যা' সৃষ্টি হয়েছে, 'নতুন চাঁদে' যে-সকল কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে, তাতে অসীম অনন্তের উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে এসেছে তাঁর আত্মার ক্রন্দন।

বুলবুলের রোগ-শয্যার শিয়রে বসেই নজরুল পারস্যের অমর কবি হাফিজের 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' বইয়ের তর্জমা শেষ করেন। কালিকা প্রেস এবং এস, সি, চক্রবর্তী এণ্ড-সন্স-এর সত্বাধিকারী মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যেই তিনি এই বইএর অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। পরে এ-বই বুলবুলের নামে উৎসর্গ-পত্র নিয়ে খুব জাঁক-জমকের সাথে বের হয়। (১-৩-১৩৩৭ বাং, ১৯৩০ ইং)

এরপর থেকে আমাকেও সাংসারিক নানা প্রকার চাপে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। নজরুলের সাথে যোগাযোগ রাখা আর আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ক্বচিৎ-কদাচিত যাই, সাধারণ দেখা-সাক্ষাৎ। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের খোঁজ-খবর নেওয়া বহু দিন আর ঘটে নাই।

'সওগাতে'র সংস্পর্শচ্যুৎ হয়ে নজরুল নিজেকে বিলিয়ে দিলেন, ছড়িয়ে দিলেন, একেবারে উন্মুক্ত করে দিলেন ব্যবসায়ীদের কাছে। একটা প্রবল স্রোতের মুখে গা এলিয়ে দিলেন। কোন্‌দিকে এঁরা নিয়ে যাবেন তাঁকে, কোথায় গিয়ে ভিড়বে তাঁর ভাঙা তরী, এ-কথা তিনি জানেন না, বুঝতে পারেন না।

এ-ছাড়া বোধ হয় তাঁর অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। অনেক-গুলো কারণ বিরাট পাহাড়ের মতো তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমতঃ 'সওগাতে'র ব্যবসায়ীসুলভ মনোভাব তাঁকে পীড়া দিয়েছিল। তাঁর প্রয়োজনের তুলনায় তিনি যা' পেতেন, তা' ছিল একান্ত অকিঞ্চিৎকর।

দ্বিতীয়তঃ এরপর এসেছিল তাঁর পর পর দুটি সন্তান। সানি আর নিনি, (কাজী সব্যসাচী ইসলাম, কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম)। এদের ভরণ-পোষণ আর শিক্ষার জন্য তিনি হয়ে পড়েছিলেন বিব্রত। সংসারে অর্থের চাহিদা গিয়েছিল বিপুলভাবে বেড়ে।

তৃতীয়তঃ বুলবুলের মৃত্যুতে তাঁর উদ্দামতার হয়েছিল হ্রাস। মনও হয়ে পড়েছিল দুর্বল। অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল হৃদয়—ধীর মন্থর গতিতে।

তাই ব্যবসায়ীরা যখন তাঁর সামনে তুলে ধরলেন তাঁদের অর্থের থলি, গানের ভেতরে পেলেন মনের খোরাক, তখন তিনি হারিয়ে

ফেললেন নিজের সূক্ষ্ম বিবেচনা শক্তি। সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি তাঁদের কাছে।

অর্থকরী সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে এজন্য তাঁর এই সময়ের জীবনে দেখা যায়, তিনি মেগাফোন, হিজমাস্টার্স ভয়েস, সেনোলা প্রভৃতি রেকর্ড-কোম্পানীর গান লিখছেন নিয়মিতভাবে, অর্থের বিনিময়ে। ফিল্ম কোম্পানীর হাতে পড়ে অভিনয়ে নামতে হয়েছে তাঁকে ধ্রুব চিত্রে নারদের ভূমিকা নিয়ে। বিবেকানন্দ রোডের ওপর খুলে বসতে হয়েছে "কলগীতি'—গ্রামোফোনের দোকান। অবশ্য তাঁর অবচেতন মনে অশরীরী কোনো আত্মার প্রভাব ধীরে ধীরে ছায়া ফেলছে তখনো। তবে এ-সময় অর্থই হয়েছিল তাঁর কাল। এরই জন্য তিনি বিকিয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে। কেহ কেহ বলেন: "অর্থের জন্য একটি প্রতিভার অপমৃত্যু হয়েছিল সেদিন।"

প্রয়োজনীয় অর্থ না পেলে প্রতিভা বাঁচে কি করে? যাঁরা তাঁর প্রতিভার পূজারী শুধু ভক্তি ও শ্রদ্ধা লইয়ে কি সামাজিক জীবকে বাঁচান যায়? তাঁরা কি চেষ্টা করেছেন? ঠকান ছাড়া?

হয়তো এ-কথা আংশিক সত্য।

গানের রাজ্যে তিনি তাঁর বিরাট প্রতিভার যে-পরিচয় দিয়েছেন, তা' পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

প্রায় তেত্রিশ শত গান তিনি লিখেছেন। এতো গান পৃথিবীর কোনো গীতকারের নাকি নেই। এই সমস্ত গানের অনেকগুলি তিনি তাঁর নিজস্ব সুর বৈশিষ্ট্যে করেছেন রূপায়িত। অনেক উর্দু, হিন্দী, তুর্কি প্রমুখ বৈদেশিক গান তিনি বাঙলা দেশে নূতন আমদানী করেছেন। বিশেষ করে তাঁর গজল-গানের তো তুলনাই হয় না।

এ-সময় দেখেছি তাঁকে ব্যস্ততার চরম সীমায়। পান, জর্দা আর চা-এর সমারোহ তাঁর সামনে। হারমোনিয়ম নিয়ে বসে আছেন তিনি। চারদিকে ঘিরে বসে আছেন শিল্পীরা। কারো প্রয়োজন কীর্তনের,

কারো ভৈরবী, কারো ঠুংরি, কারো গজল। একই বৈঠকে বসে তিনি এই বিভিন্ন প্রকৃতির গান লিখছেন। সুরযোজনা করছেন, যাঁর যাঁর হাতে দিয়ে তাঁর চাহিদা পূরণ করছেন। কী বিরাট প্রতিভার—কী বিরাট শক্তির অধিকারী হলে এরূপ সম্ভব! পাঁচ মিনিট আগে যেখানে সুর তুলেছেন করুণ কান্নার সুর, তারপরই তুলতে হয়েছে তাঁকে হাসির হর্‌রা।

নজরুলের গানকে রূপায়িত করতে তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের দান অনস্বীকার্য। এঁদের ভেতরে আঙ্গুরবালা, কে. মল্লিক, হরিমতী, নলিনী সরকার, আব্বাস উদ্দীন, ইন্দুবালার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কুচবিহারে এক মিলাদ-মহফিলে যোগ দিতে গিয়ে নজরুল আবিষ্কার করেন আব্বাস উদ্দীনকে। এঁর সুরেলাকণ্ঠ কবিকে মুগ্ধ করে। তাঁরই আমন্ত্রণ ক্রমে আব্বাসউদ্দীন কোলকাতায় আসেন। আর নজরুলের—"ও মন রমজানের ঐ রোজাব শেষে এলো খুশীর ঈদ", "ইসলামের ঐ সওদা নিয়ে এলো নবীন সওদাগর",প্রভৃতি ইসলামী গান, "নদীর নাম সই অঞ্জনা," "পদ্ম দীঘির ধারে ধারে", আবে ও দরিয়ার মাঝি মোরে নিয়ে যা রে মদিনায়" "ওরে কে বলে আরবে নদী নাই" প্রভৃতি পল্লীগান রেকর্ড করেন। বিশেষ করে কবির লেখা ভাওয়াইয়া গান ঃ

> "কুঁচ বরণ কন্যারে তার মেঘ ববণ কেশ
> আমায় নিয়ে যাওরে নদী, সেই সে কন্যার দেশরে...."

আব্বাসের কণ্ঠ যে-সুরের মায়া সৃষ্টি করে, সারা বাঙলা দেশের শিল্পী-মনে যে-আলোড়ন সৃষ্টি করে, তা' আমাদের মনে অক্ষয় সম্পদ হয়ে বেঁচে আছে।

গানের রাজ্যে যেন নজরুল ডুবে গিয়েছিলেন। তলিয়ে গিয়েছিলেন তিনি এর অতলস্পর্শী-জলধি-কল্লোলে। মনের স্বাভাবিক দরদ না

থাকলে, নিজেকে অর্থের বিনিময়ে বিকিয়ে দিয়ে এমন করে গানের-রাজ্যে যুগান্তর সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না।

এ কথা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অসংগত হবে না যে, কবি গ্রামোফোনে গান রেকর্ড করবার আগে গ্রামোফোনের বিশেষ মর্যাদা ছিল না। সাধারণতঃ সস্তা হাল্‌কা ধরণের গান রেকর্ডায়িত হতো, আর সেগুলোর আদর ছিল বিশেষ করে দেশের নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে। এতে নজরুলের প্রবেশের পর থেকে গ্রামোফোনের গানের প্রতি অভিজাত-মহলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এরপর থেকেই গ্রামোফোন অভিজাত-মহলে মর্যাদা পায়।

দরাজদিল নজরুল ইসলাম

মানুষ যখন বড়ো হয়, তখন তাঁর মনও প্রশস্ত হয়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই। যাঁর ব্যাংকে অগুনতি টাকা আছে, তাঁকে নূতন চেক লেখবার সময় হিসাব খতিয়ে দেখতে হয় না। যতো ঝগড়াঝাঁটি, যতো হিংসা-দ্বেষ দরিদ্রদের মধ্যে। হাঁড়িতে যার চাল নেই, তাঁর বাড়ীতেই ছুঁচোর কীর্তন লেগে থাকে নিত্যনৈমিত্তিক।

অর্থে নজরুল ইসলাম দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু প্রাণ-শক্তি আর প্রতিভারবিত্তে তাঁর ভাণ্ডার যে ছিল অফুরন্ত, এ-সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সজ্ঞান। এ জন্য যাঁরাই তাঁর বিশাল শক্তিকে খর্ব করার চেষ্টা করেছেন, অথবা তাঁর নিন্দাবাদ করেছেন, তাঁকে জনসমাজে হাস্যাস্পদ করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের কারো কথাতেই তিনি আমল দেননি। তাঁদের ছুঁড়েমারা হিংসার বাণ যেন তাঁর হাসির হুল্লোড়ে ফুল হয়ে উড়ে গেছে। একটা বড়ো গাছের নিচে স্বাভাবিকভাবেই চারাগাছ বাড়তে পারে না। কিন্তু নজরুলের ছায়ায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের শক্তির বিকাশ তাঁর প্রতিভার চাপে কখনো পিষ্ট হয়নি।

প্রথমে মেগাফোন কোম্পানিতে, পরে হিজমাস্টার্স ভয়েসে নজরুল যোগ দেন। এ দু'জায়গায়ই দেখা গেছে, সামান্য শক্তির অধিকারী গান রচয়িতারাও তাঁর স্নেহস্পর্শে, পরে নামকরা লিখিয়ে হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অকৃতজ্ঞ কেউ কেউ তাঁর নিন্দাবাদ করে থাকেন। আবার অনেক শক্তিহীন অক্ষম লেখকও আছেন, যাঁরা তাঁর কাছে প্রশ্রয় না

পাওয়ায় নিন্দা করেন। (এই শ্রেণীর লোকদের সাথে যে-কোনো কাগজের সম্পাদকের দেখা হয়।)

সামান্য শক্তি থাকলেও কিভাবে নিজের স্বার্থ বলী দিয়েও নজরুল ইসলাম স্থান ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর একটা নজির পেশ করছি :

নজরুল ইসলাম তখন মেগাফোন কোম্পানীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। উহার স্বত্বাধিকারী শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় একজন পাকা ব্যবসায়ী। কিন্তু ভদ্রলোক উদার আর গুণীর কদর করতে জানেন। তিনি কবিকে সকল রকম সুবিধা দিয়ে যেমন গুণের মর্যাদা দিচ্ছিলেন, অন্যদিক দিয়ে স্বীয় ব্যবসায়ের সমৃদ্ধি বৃদ্ধিরও চেষ্টা করছিলেন।

এমনি সময় একদিন তাঁরা জানতে পারলেন : বরিশালের বিখ্যাত এস্রাজ-বাদক শ্রীযুক্ত শীতল মুখার্জীর বার বৎসর বয়স্কা পৌত্রী শ্রীমতী বীণাপাণি মুখার্জী এলাহাবাদ মিউজিক কনফারেন্সে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

এই বয়সে সারা ভারতে সংগীত-প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয়। ওঁরা তখন থাকতেন ৫১, হাজরা রোডে, (বালীগঞ্জ, কোলকাতা) আমি যে-বাড়ীতে থাকি, তার সামনের বাড়ীতেই থাকেন। আর আমার সাথে তাঁর ঠাকুর্দার বিশেষ সম্প্রীতি আছে।

আমি তখন কোলকাতায়, বালীগঞ্জে ৫৫।১, হাজরা রোডে সপরিবারে থাকি। একদিন সন্ধ্যার পর পাশের বাড়ীতে মিঃ প্রসাদ মুখার্জীর সাথে বসে ক্যারাম খেলছি। খেলা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় এক বিরাট মোটরকার এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়ালো। একজন এসে সংবাদ দিলো : গাড়ীতে কবি নজরুল ইসলাম বসে আছেন, আর আমাকে ডাকছেন।

নজরুলের নামে পাগল আমি—আমার পক্ষে কি আর খেলা চালানো সম্ভব ? দৌড়ে গাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

গাড়ীতে তিনি একা নন। সাহিত্যিক-বন্ধু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আর মেগাফোন কোম্পানির মালিক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় রয়েছেন। বললাম: "কবিভাই, ব্যাপার কি? কোথায় গিয়েছিলেন? এখানে হঠাৎ?"

কবি বললেন: "কোথাও যাইনি রে, তোর কাছেই এলাম, বিশেষ কথা আছে। চল, তোর বাড়ীতে চল—একটু বসে আলাপ করতে হবে।"

আমি এক মহা বিভ্রাটে পড়ে গেলাম। যে-বাড়িতে বাস করি, মস্ত কমপাউণ্ড-ওয়ালা মান্ধাতার আমলের তৈরী বাড়ী। পুরানো ইট-গুলো যেন দাঁত বার করে ভেংচি কাটছে। সেখানে কোথায় নিয়ে এঁদের বসাবো? একটু ইতস্ততঃ করে বললাম: "যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে, তা' হলে মিঃ প্রসাদ মুখার্জির এখানে বসার ব্যবস্থা করতে পারি। এখানে বসার ভালো ব্যবস্থা আছে। তা' ছাড়া এখানে আপনাদের অমর্যাদা হবে না। ইনি স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে হিরণ্ময়ী দেবীর ছেলে—রবীন্দ্রনাথের নাতি। আমার বিশেষ বন্ধু।

কবি যেন একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন: "তোর বাড়ীতে কি একটা ছেঁড়া চ্যাটাইও বিছিয়ে দিতে পারবিনে? বড় লোকদের কাছে ঘেঁষতে ভালো লাগে না।"

জিতেন বাবু আর নৃপেনও তাঁর কথারই প্রতিধ্বনি করলেন।

আমি সাগ্রহে এবং সানন্দে ওঁদের নিয়ে এলাম বাড়ীতে। চায়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে এসে বললাম: "এখন হুকুম করুন।"

হেসে কবি বললেন: "হাঁ হুকুমই করবো। একটা কাজ তোকে করে দিতে হবে। বীণাপাণি মুখার্জিকে জানিস? সেই যে অল্প বয়সেই নাম করেছেন?"

বললাম: জানি বই কি! ঐ তো সামনেই ঐ বাড়ী।"

কবি বললেন: "তাই নাকি। চমৎকার বাড়ী তো! ওটা কি ওঁদের নিজের বাড়ি?"

বললাম : "না, নিজের বাড়ি নয়। এক নিঃসন্তান মহিলার বাড়ি ওটা। তিনি ওঁর ঠাকুর্দা শীতল মুখার্জির খুব ভক্ত। তাই নিচের তলায় থাকতে দিয়েছেন।"

কবি বললেন : "বেশ, এখন কথা হচ্ছে বীণাপাণিকে রাজী করিয়ে দিতে হবে। মেগাফোন ওঁর গান রেকর্ড করতে চায়।"

বললাম : "এ আর বড়ো কথা কি? কিন্তু ওঁর তো কোনো স্বকীয় সত্তা নেই। ওর ঠাকুরদাকে রাজী করাতে হবে। মনে হয় তিনি রাজী হবেন।"

কবি একটু হাসলেন। বললেন : "যত সহজ ভাবছিস, তত সহজ বোধহয় নয় রে। ওস্তাদী গানের যারা চর্চা করেন, সত্যিকার আর্টিস্ট যাঁরা, তাঁরা এখনো রেকর্ডের গানকে সম্মান দেন না। তবে বেশী দিন বাকী নেই, শীগ্‌গীরই তাঁরা এতে আকৃষ্ট হবেন বলে মনে হয়—আচ্ছা দেখ তুই চেষ্টা করে।"

আমি বললাম : "এত শীগগীরই উঠবেন নাকি? সে কি, একটু বসুন। আমি শীতলবাবুকে একটু খবর দি', তাঁর সাথে আপনারা আলাপ করে যান।"

কবি বললেন : "সেটা কি ঠিক হবে?"

আমি বললাম : "কেন ঠিক হবে না? একবার ওঁকে ভাববার সুযোগ দিন, কাঁরা তাঁর বাড়ীতে, তাঁর খোঁজে এসেছেন?"

আমি শীতলবাবুকে ডেকে এঁদের আগমনের সংবাদ দিলাম। তিনি ছিলেন সত্যিকার গুণী লোক, বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে এসে ওঁদের সাথে দেখা করলেন।

এমন সময় প্রসাদবাবুর বাড়ি থেকে তাগিদ এলো : কবি যেন তাঁর ওখানে 'পায়ের ধুলো' দিয়ে যান। ওঁর চাকর এসে এমনভাবে আঁকড়ে ধরলো, যে এঁদের আর ওখানে না গিয়ে উপায় রইলো না।

অনেক কথা—অনেক আলাপ, অনেক হাসাহাসি হলো।

শীতলবাবুকে প্রসাদ মুখার্জি বললেন: "একবার বীণুকে ডাকুন না, ওঁর একটা গান শুনিয়ে দেওয়া যাক এঁদের।"

মনে মনে সবাই প্রীত হলেন বলে মনে হলো। কিন্তু শীতলবাবু একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। ওস্তাদ লোকের ধর্মই বোধহয় এই। কেউ গান শুনতে চাইলেই অমনি তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন না। আমরা সবাই অত্যন্ত আগ্রহ দেখাতে লাগলাম। তাতে অনেকটা খোশামোদের আমেজ ছিল।

একটু পরেই চাকরের ঘাড়ে হারমোনিয়ম চাপিয়ে বীণু এসে হাজির হলেন। ছোট্ট মেয়েটি। আমাদের কারুরই ওঁকে ভক্তি আর সম্মান দেখাবার কথা নয়। কিন্তু মেয়েটি যখন গান ধরলো, মনে হলো হাজারো পাখী যেন ওঁর কণ্ঠে কুলুকুলু করে কথা কয়ে উঠলো। কী সুর! কী তান! আর হারমোনিয়মের রীডগুলোর ওপর তাঁর কী বিপুল দক্ষতা। মেয়েটির প্রতিভা অনস্বীকার্য। কিন্তু যে-শীতলবাবু এঁকে তালিম দিয়েছেন, সার্থক তাঁর শিক্ষাদানের কৃতিত্ব। গান শোনার জন্য আমাদের আগ্রহে যে খোশামোদের আমেজ ছিল, তা' পাবার এঁরা যোগ্য অধিকারী।

অনেক রাতে কবি সদলবলে গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। যাবার সময় বিশেষ ভাবে আমাকে বলে গেলেন: "দেখিস, হাতছাড়া যেন না হয়। অন্যান্য কোম্পানি হয়তো এঁদের সাথে কনট্রাক্ট করার চেষ্টা কোরবে।"

অনেক চেষ্টা-তদবির—অনেক প্রলোভন—কত কষ্টে যে শীতলবাবুকে রাজী করা গেলো, তা আর বলে শেষ করা যায় না। ওঁর যুক্তি হলো: "বীণু এখন ছেলেমানুষ। এই বয়সে গান রেকর্ড করালে ওঁর গানের মান (Standerd) নিচে নেমে যাবে।" আর আমার যুক্তি হলো: ওঁর গান রেকর্ড হলে, ও মনে উৎসাহ পাবে। আর আর্থিক দুর্গতিরও কিছুটা অবসান হবে। কারণ শীতলবাবুর তো এই গানের চর্চা ছাড়া আয়ের আর কোনো পথ নেই।

টিউশনি করেই তো তিনি সংসার চালান। পিতৃহীন বীণুর এতে লাভই।"

একদিন বীণু আর শীতলবাবুকে সাথে নিয়ে মেগাফোন কোম্পানির অফিসে, হ্যারিসন রোডে গেলাম। দেখলাম: আসর জমজমাট। মধ্যমণিরূপে কবি বিরাজ করছেন। তাঁর চারদিকে ঘিরে আছেন সুগায়ক জ্ঞানদত্ত আর পাঁচ ছয়টি পেশাদার গায়িকা। আমাদের দেখে তো কবি লাফিয়ে উঠলেন। চীৎকার করে বললেন: "দে গরুর গা ধুইয়ে।"

তারপর একে একে সবার সাথে পরিচয় বিনিময়ের পর ওখানে বসা গেলো। সবারই আগ্রহে বীণাপাণি দু'একখানা গান করলেন। তাঁর কৃতিত্বে সবাই মুগ্ধ হয়েছেন বলে মনে হলো।

তারপর যথারীতি কনট্রাক্ট সই হবার পর অগ্রিম এক শত টাকা দেয়া হলো শীতলবাবুকে। খুশী মনে আমরা বাড়ি ফিরে এলাম। এখন প্রতীক্ষা করতে হবে—ওঁদের আহ্বানের। যখন ওঁরা সুবিধা বিবেচনা করবেন, গান পাঠাবেন। আর তা' তালিম দিয়ে ঠিক করতে হবে। তারপর একদিন His Master's Voice-এর দমদম Studio-তে গিয়ে রেকর্ডায়িত করতে হবে। ব্যস।

একদিন দু'দিন যায়। দিন-পনেরো প্রতীক্ষায় কাটলো। কোম্পানির পক্ষ থেকে আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। কবির গুল-বাগিচা বইখানা ছাপার ব্যাপারে আর অন্যান্য কাজেও তখন আমি বেশ খানিকটা ব্যস্ত। ফলে যদিও আমি মেগাফোন বা কবির আশপাশ দিয়ে প্রায়ই ঘুরছি, তা' হলেও বীণাপাণির কনট্রাক্টটির আর কিছু উন্নতি বা অবনতি ঘটলো কিনা, কোন খোঁজ নিতে পারিনি বা নিজেদেরকে একটু Reserve রাখার জন্য ইচ্ছে করেই খোঁজ নিইনি।

এমনি সময় একদিন কবি আমাকে খবর পাঠালেন—জরুরী খবর: "অবিশ্যি দেখা করতে হবে।"

গেলাম। তাঁর মুখের গাম্ভীর্য দেখে বুকের পানি শুকিয়ে গেলো।

যিনি দেখলেই উচ্চহাসিতে অভ্যর্থনা করেন, শত দুঃখ আর অভাব-অভিযোগে যিনি মুখ ম্লান করতে জানেন না, স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা যাঁর সব সময় দু' হাত পেতে নিচ্ছি, আজ তিনি গম্ভীর। এ যেন একটা ঝড়ের পূর্বাভাস। আমার কাছে অত্যন্ত মর্মপীড়াদায়ক। দুরু দুরু বক্ষে পাশে গিয়ে বসলাম। খবর পেয়ে জিতেন বাবুও এলেন।

অতি কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে বললাম: "ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার কি, তা' কি তুই জানিস না?"—কবির কণ্ঠে বিরাট গাম্ভীর্য।

বললাম: "না তো, কি হয়েছে আমাকে বলুন, সত্যি আমি কিছু জানি না।"

জিতেনবাবু বললেন: "শুনলাম বীণাপাণির ঠাকুরদা' নাকি কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানির সাথে আগেই কনট্রাক্ট করেছেন। তা' হলে আবার আমাদের সাথে কনট্রাক্ট করে এমন একটা প্রতারণা করলেন কেন? লোকটা একটা চীট্—ওকে পুলিসে দেওয়া উচিত।"

আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। মুখে আমার কোনো রা' নেই। কারণ প্রথমতঃ আমি এঁদের এই সকল টেক্‌নিক সম্বন্ধে মোটেই কিছু জানি না। দ্বিতীয়তঃ সত্যই শীতলবাবু এর আগে কলম্বিয়ার সাথে কোন কনট্রাক্ট করেছেন কি না তা-ও আমার জানা নেই।

কোনো ক্রমে ঢোক গিলে বললাম: "আপনারা বোধহয় ভুল শুনেছেন। শীতলবাবু দরিদ্র হতে পারেন, কিন্তু তিনি 'প্রতারক' এ-কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।"

এরপর মনের জোর আমার ফিরে এলো। বললাম: "আমি এক্ষুণি চললাম, দেখি এর ভেতরে কি রহস্য। পরে আমি আপনাদের খবর দেবো।"

ওঁরাও আর কিছু বললেন না।

আমি বললাম : "দেখুন আপনারা জানেন, এতে আমার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই। তার ওপর আপনাদের অনুরোধেই এর ভেতরে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। যাক আমি আশা করছি, এ-ব্যাপারে একটা মীমাংসা করে আপনাদের কাছে আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো।"

কবি কোনো কথা বললেন না। শুধু তাঁর ঠোঁটের আগায় যেন একটা হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেলো।

এতে আমার মন ভরলো না। একান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাসায় এসে পেঁ ৗছলাম।

শীতলবাবুকে ডেকে বললাম : "এ-কি ব্যাপার, সত্যিই কি আপনি কলম্বিয়ার সাথে এর আগে কোনো কনট্রাক্ট করেছিলেন ?"

তিনি অবাক হয়ে বললেন :"কই না তো, তাঁদের সাথে কোনো কনট্রাক্ট তো আমার হয়নি !"

বললাম : "তবে ওঁরা এ-কথা কোথায় পেলেন ?"

তিনিও মহা চিন্তায় পড়লেন বলে মনে হলো।

আমি বললাম : "আপনি বেশ করে ভেবে দেখুন, তাঁদের সাথে কোনো কনট্রাক্ট করেছেন কি না, বা কোনো কাগজে আপনি সই দিয়েছেন কি না।"

শীতলবাবু এবার যা' বললেন, তাতে মন আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো।

তিনি বললেন : "রেডিওর শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারের মেয়ে গৌরীকে আমি গান শেখাই। তিনি কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানিরও একজন কর্তাব্যক্তি। কোনো সময়ে, কোনো ফাঁকে আমাকে দিয়ে তিনি কিছু লিখিয়ে নিয়েছেন কি না, তাতো বুঝতে পারছি না। আমি তো ইংরাজী জানি না। দু'একখানা কি কাগজে যেন তিনি আমার সই নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।"

হায় সরলপ্রাণ বৃদ্ধ! ওখানে কোনো ফাঁদে তিনি আটকেছেন কি না নিজেও তিনি তা জানেন না। ফলে তাঁর সাথে জড়িয়ে পড়ে আমিও কবির কাছে, আর জিতেনবাবুর কাছে একেবারে খাটো হয়ে গেলাম।

বললাম: "মেগাফোনের কাছ থেকে যে একশো টাকা এনেছেন, তা' ফিরিয়ে দিন, তারপর চলুন, নৃপেনবাবুর সাথে দেখা করি, দেখি তিনি কি বলেন।"

সে-টাকা শীতলবাবু ভেঙ্গে ফেলেছেন। জোগাড় করতে দু'চারদিন সময় লাগলো। একদিন ঐ টাকা নিয়ে জিতেনবাবুকে ফেরত দিলাম। বললাম: "কার কাছে আপনি এ-কথা শুনেছেন যে, শীতলবাবু কলম্বিয়ার সাথে কনট্রাক্ট করেছেন?"

তিনি বললেন: "নৃপেনবাবুই বলছিলেন।"

আমরা আর কথা না বাড়িয়ে নৃপেনবাবুর সাথে গিয়ে দেখা করলাম।

শীতলবাবু তাঁর পৈতেয় হাত রেখে বললেন: "দেখুন, আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে আপনি এই লজ্জার হাত থেকে বাঁচান। এখানে টাকার কোনো প্রশ্ন নয়, আমার সম্মান আজ বিপন্ন। আর এই ভদ্রলোককেও মুশকিলে ফেলেছি।"—আমাকে তিনি দেখিয়ে দিলেন।

বৃদ্ধ একেবারে কেঁদে ফেললেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, শীতলবাবু ইচ্ছে করে আমাকে এই লজ্জায় ফেলেননি। এর ভেতরে একটা ষড়যন্ত্র আছে। বললাম: "সত্যিই কি ইনি আপনাদের সাথে কোনো কনট্রাক্ট করেছেন?"

নৃপেনবাবু একটু হেসে বললেন: "আমার যেন মনে হচ্ছে ইনি কনট্রাক্ট করেছেন। তবে ফাইল দেখতে হবে, আর একদিন আসবেন, ফাইল দেখে দেবো।"

শীতলবাবু বুড়ো মানুষ। বার বার ওঁদের কাছে যেতে পারেন না।

সকল দায়িত্ব আমার ঘাড়েই চাপলো। নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে একবার নৃপেনবাবুর বাড়িতে, একবার রেডিও অফিসে, একবার কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানিতে ঘোরাঘুরি করতে লাগলাম। কিন্তু কোনো কিছুই খোঁজ করতে পারি না। নৃপেনবাবু যেন অনর্থক আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমোদ পাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে পড়েছি, রাগও করতে পারি না।

শেষে অনেক খোশামোদ, কিছুটা রাগ, এমনি করে একদিন নৃপেনবাবুর দয়া হলো। তিনি একখানা চিঠি দিয়ে আমাকে কলম্বিয়ার এক ভদ্রলোকের কাছে পাঠালেন।

গেলাম। তিনি তাঁর অধীনস্থ এক মেম সাহেবের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বললেন: "এঁর সাথে যান, ইনি ব্যবস্থা করবেন।"

মেম সাহেব বিরাট ফাইল নিয়ে বসলেন। যাঁদের সাথে কলম্বিয়ার কনট্রাক্ট আছে, তাঁদের ফাইল। এক এক করে দেখা শুরু হলো। বীণাপাণি দত্ত, সেন, দাসী এমনি অনেক নাম পাওয়া গেলো। কিন্তু বীণাপাণি মুখার্জি নামের কোনো কনট্রাক্ট দু'তিন ঘণ্টা খাতা ঘেঁটেও পাওয়া গেলো না।

আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আর সেখানে নয়। ছুট ছুট—দৌড়ে একেবারে মেগাফোন অফিসে। কবি তখন সেখানে ছিলেন না। জিতেনবাবুকে বললাম: "না, কলম্বিয়ার রেকর্ডে বীণাপাণির নাম পাওয়া গেলো না। আমার মনে হয় নৃপেনবাবু আপনাকে একটা ধাপ্পা দিয়েছেন।"

তিনি আমতা আমতা করে বললেন: "সেটা সম্ভব। কারণ শীতলবাবু যখন নৃপেনবাবুর মেয়ের শিক্ষক, তখন সহজেই তাঁর মনে হয়েছে, শীতলবাবুর ওপর তাঁর একটা অধিকার আছে। আর সেই অধিকারে যখন খুশী একটা কনট্রাক্ট সই করিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু আমরা আগেই তাঁর সাথে কনট্রাক্ট করে ফেলায় তিনি একটু মুশকিলে পড়েছেন। তাই এই চাতুরী খেলেছেন।"

বললাম : "এখন কি করতে হবে ?"

তিনি বললেন : "ওঁদের কাছ থেকে এই মর্মে একটা চিঠি আনতে হবে যে কলম্বিয়ার সাথে বীণাপাণির কোনো কনট্রাক্ট হয়নি। একটা কথা যখন উঠেছে, তখন কাগজ-কলমে এটা পরিষ্কার থাকাই ভালো।"

বললাম : উপযাচক হয়ে ওঁরা তা দেবেন কেন ? একটা অভিজাত ফার্ম কি এরূপ কোনো চিঠি দেয় ?"

তিনি বললেন : "তা জানিনে, তবে এ-ছাড়া অন্য উপায় নেই। একবার যখন কথা উঠেছে, তখন কোনো লিখিত-পত্র ছাড়া আমি বীণাপাণির সাথে আর নূতন-ভাবে কোনো কনট্রাক্ট করতে পারি না।"

হায় রে ! এত ঘোরাঘুরির এই পরিণাম।

শীতলবাবুকে সুসংবাদটি দিয়ে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে বললাম। তিনি বললেন : "আমি এ-সব কিছু বুঝি না. তোমাকেই এর ব্যবস্থা করতে হবে।"

কি করা। আবার নৃপেনবাবুর কাছে ঘোরাঘুরি শুরু করলাম।

তিনি কয়েক দিন পর বললেন : "কলম্বিয়াকে একটি চিঠি লিখুন এই মর্মে যে বীণাপাণি মুখার্জির সাথে কোন কনট্রাক্ট আপনারা করেছেন কি না। এর উত্তর ওঁরা যা দেবেন, তাতেই আপনাদের কাজ হবে।"

পত্র নিয়ে একদিন কলম্বিয়াতে গেলাম। সেই মেম সাহেবের সাথে দেখা। তিনি তৎক্ষণাৎ ওটা নিয়ে ওপরওয়ালা অফিসারের সাথে পরামর্শ করে আবার ফাইলটি তন্ন তন্ন করে দেখে একখানা পত্র দিলেন। লিখলেন : "না, আমাদের সাথে বীণাপাণি মুখার্জি বলে কোনো মেয়ের বর্তমানে কোনো কনট্রাক্ট নেই।" ব্যস ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কার্য শেষ।

'সাহেব লোকে'র কাজ, সেদিন সঙ্গে সঙ্গে action নিলেন, আজও তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে দিলেন। যা' ঘোরাঘুরি করতে হলো দেশীয় লোকের কাছে। হায় রে আমার দেশ।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। কবির সাথে দেখা করে আগাগোড়া

ঘটনা খুলে বললাম। তাঁর ও আমার ভেতরে যে কালোমেঘ এসে ভিড় করেছিল, তা' অপসারিত হলো। তিনি খুব খুশী হয়ে পিঠ চাপড়াতে লাগলেন। বললেন: "তোর যথেষ্ট খাটুনি হয়েছে—পয়সাও কিছু পকেট থেকে খসেছে ঘোরাঘুরিতে—তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। জিতেনবাবুর কাছে আমার সম্মান ব্যাহত হবার উপক্রম করেছিল। কারণ আমি তোকে বিশ্বাস করি, তোর সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁকে আমি বলেছি। এর মধ্যে যদি সত্যি একটা প্রতারণা থাকতো, তা' হলে ভাবতে পারিস, কী মুশকিলে পড়তাম! দারিদ্র্য আমাদের থাকতে পারে, কিন্তু আমরা 'প্রতারক' নই, এটা প্রমাণ করে আমাদের সকলেরই সম্মান রক্ষা করেছিস।"—তারপর সহজভাবে আলাপ-আলোচনা হতে লাগলো।

একদিন শীতলবাবু এসে বললেন: "ওহে মাস্টার। দু'টো গান লিখে দাও। তোমার গানই রেকর্ড হবে।"

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। আমার গান? মনে একটা অভূতপূর্ব আনন্দেরও সঞ্চার হলো। বললাম: "কেন, কাজী সাহেব কোনো গান লিখে দেননি আপনাকে?"

তিনি বললেন: "না হে, তিনি একটা দেবতা—দেবতা। আমার সাথে যখন নূতন ক'রে মেগাফোনের কনট্রাক্ট হলো, গানের কথা বললাম, কাজী সাহেব বললেন: "বীণাপাণির জন্য গান লিখে দেবে মঈনুদ্দীন। কারণ যে-কষ্ট ক'রে ও এই যোগাযোগ ঘটিয়েছে, তার পুরস্কার স্বরূপ ওঁর গানই প্রথম রেকর্ড হবে। ভাবতে পার, কী উদার মন কবির? এতে তাঁর কতগুলো টাকা ক্ষতি। ওঁর গান রেকর্ড হলে অনেকগুলো টাকা তিনি পেতেন। দরিদ্রের পক্ষে এ-স্বার্থত্যাগ বড় সহজ কথা নয়।

ছুটে গিয়ে আমি কবির সাথে দেখা করলাম। বললাম: "ভাই, আমি তো কখনো গান লিখিনি, বীণাপাণির জন্য গান নাকি আপনি আমাকে লিখে দিতে বলেছেন?"

হেসে তিনি বললেন : "হাঁ, তুই-ই লিখে দে।"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম : "আমি কি গান লিখতে পারবো ?"

কবি বললেন : "লেখ না! ঠিক উৎরে যাবে, দেখে নিস।"

তিনি আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন।

শুধু আমাকে নয়, কত লোককে যে তিনি উপযাচক হয়ে এমন সুযোগ দিয়েছেন, তা' বলে শেষ করা যায় না। দুঃখের বিষয় তাঁর কাছ থেকে সুযোগ নিয়ে, একটু প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অনেকে আবার পরে তাঁর সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন!

যাক, কিছুদিন পর আমার "আজি মোর মউল বনে কে যেন এলো" আর "চাঁদের ছোঁয়ায় উঠলো জাগি ফুল বাগানে ফুল-বালিকা।" গান দু'টি বীণাপাণির কণ্ঠে রেকর্ড হলো। তাতে হিন্দুস্তানী সুর দেয়া হয়েছিল। আর তাতে বীণাপাণির শক্তি-সামর্থের একটা বিরাট পরিচয় দেয়া হয়েছিল। ফলে ও-রেকর্ড সমঝদার লোকদের মধ্যে খুব বাহবা পেলেও জনসাধারণের মধ্যে তার খুব আদর হয়নি। কারণ সাধারণ লোক হাল্কা সুর আর সুরের টুংটাং আওয়াজই পছন্দ করে বেশী। এরপর আমার আরও চারখানা গান রেকর্ড হলো। এ-গুলোরও ঐ একই অবস্থা।

একদিন কবিকে বললাম : "এবার আপনি বীণুকে একজোড়া গান লিখে দিন।"

কবি বললেন : "হাঁ, দেবো।" কিন্তু আর তিনি গান লিখে দেননি। কারণ এর কিছুকাল পরেই তিনি মেগাফোন ছেড়ে "হিজ মাস্টার্স ভয়েসে" চলে গিয়েছিলেন। কবিকে হারিয়ে মেগাফোনও খুব নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো। আমাদেরও ওখানে যাতায়াত কমে গেল।

মেগাফোনে থাকার সময় বিখ্যাত সংগীত-শিল্পী, আমাদের প্রিয়তম বন্ধু আব্বাসউদ্দীন খুব যাতায়াত করতেন ওখানে। সবার সঙ্গে হাসি গানে, আলাপে-মিলাপে কিছু দিন একটা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে যেন আমাদের কেটেছিল।

কবির উদার মনের আর একটা পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ করছি। নজরুল ইসলামের যে-সকল গান মেগাফোনে রেকর্ড হচ্ছিল, তা' থেকে কিছুটা বেছে বই আকারে প্রকাশ করলেন জনাব মুসাউরুর রহমান (বর্তমানে সার্জেন-জেনারেল অফ ইস্ট-পাকিস্তানের পি-এ) সাহেব। ইনি তখন গ্রেট-ইস্টার্ন লাইব্রেরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বইখানা এই লাইব্রেরীর পক্ষ থেকেই বের করেছিলেন তিনি। কথাবার্তা পাকা হওয়ার পর বই ছাপাখানায় গেলো। ওর প্রুফ দেখার ভার পড়লো আমার ওপর। আমার প্রুফ দেখার ওপর কবির অগাধ বিশ্বাস। এ জন্য এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমার ঘাড়েই চাপালেন।

অতি দ্রুত তিনি লিখে গেছেন। কোনো স্থানে ছন্দের ব্যাপারে আমার খট্‌কা লাগলেই আমি তা' কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করতাম, আর সংশোধন করিয়ে নিতাম। বইখানার নাম দেয়া হয়েছিল— "গুল-বাগিচা।"

যথা সময়ে "গুল-বাগিচা" বের হলো। ভূমিকায় দেখা গেলো: অন্যান্য কথার পর কবি লিখেছেন:

"কবি শ্রীমান খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন "গুল-বাগিচার" প্রুফ ও অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব না, তিনি আমার পরম স্নেহভাজন।"

কত বড় বিরাট আর মহৎ অন্তঃকরণ হলে এমন কথা মানুষ লিখতে পারেন, আজ সে-কথা মনে হলে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ে। আমি তাঁর "ত্রুটি-বিচ্যুতি" দেখে দিয়েছি? এ-কথা ভাবতে গিয়েও গা শিউরে ওঠে! শুধু যেখানে আমার কানে লেগেছে, সেখানে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ আর আলোচনা করেছি বৈ-তো নয়।

আর একটি ঘটনা: ছোট, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।

সওগাতে থাকতে একদিন আমরা বসে আছি, মানে আড্ডা চলছে। ছোট একখানা চিঠি নিয়ে একটি লোক এলো। চিঠি পড়েই কবি গম্ভীর

হয়ে গেলেন। তারপরই সওগাত-সম্পাদককে ডেকে বললেন : "পাঁচিশটি টাকা দিন তো।"

টাকা নিয়ে লোকটি চলে গেলো। চিঠিখানা কবির হাত থেকে টেনে নিয়ে দেখলাম, অগ্নি-লেখিকা মরহুমা মিসেস এম. রহমানের কন্যা মাসউদার চিঠি। এই মেয়েটি স্বামীর সাথে বনিবনাও না হওয়ায় বাপের বাড়ীতেই থাকতেন। আজ পিতার সাথেও ঝগড়া করে অন্য এক আত্মীয়ের বাসায় গিয়ে উঠেছেন। হঠাৎ প্রয়োজন হওয়ায় কবির কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন।

বললাম : "এ আপনি কি করলেন? আপনারই তো হাঁড়ি ঠন্ ঠন্।"

এ-কথায় কবি একটু রাগ-ই করলেন। বললেন : "তোরা কি জানবি। ওঁদের কাছে কতভাবে আমি ঋণী।"

এরূপ ঘটনা তাঁর জীবনে অনেক।

'মক্তব-সাহিত্য'

পাঠ্যপুস্তক লেখা, প্রকাশ করা, বেশ লাভজনক ব্যবসায়। এ-ধারণা প্রায় সকলেরই। কিন্তু এর ভেতরকার নোংরামি আর নীচতার খবর যাঁরা রাখেন, তাঁদের ঐ সকল ধারণা বদলে গেছে। এক শ্রেণীর লোক এই ব্যবসায়কে দুর্নীতিতে দুর্নীতিতে এমন এক স্তরে এনে ফেলেছেন যে, কোনো ভদ্রলোকের আর এই ব্যবসায় করা চলে না।

কোনো এক হিন্দু-ব্যবসায়ী বন্ধু নজরুলকে একবার বোঝালেন: একখানা মক্তবের বই লিখে দিন। চালিয়ে দিতে পারলে ভারী লাভ হবে। একবার ডিরেক্টারের অনুমোদনের ছাপ দিয়ে বাজারে ছেড়ে দিলেই হলো। টাকা আসতে থাকবে হাজারে হাজারে। আর এ জন্য দীর্ঘদিন বসেও থাকতে হবে না। নভেম্বর মাসে বই বাজারে ছাড়লে, ফেব্রুয়ারী মাসেই ঘরভরা টাকা—কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। তবে সিলেবাস অনুযায়ী বই হওয়া চাই।

নজরুল ব্যবসায়ী-বন্ধুর ফাঁদে পা দিলেন। বই ছাপা হয়ে টেক্সটবুক-কমিটিতে দাখিল করা হলো। এ-পর্যন্ত এ-সম্বন্ধে কোনো খবর আমি জানি না। জানলে বারণ করতাম। হয়তো মোহাচ্ছন্ন মন আমার বারণ শুনতে চাইতো না। বিরূপ ধারণা হতো আমার ওপর। তবু বারণ করতাম। কারণ এর ভেতরকার নোংরামিগুলোর খবর আমি কিছু রাখতাম। যাক্।

বই দাখিল করে ব্যবসায়ী-বন্ধু ছুটলেন নজরুলের কাছে টেক্সটবুক-

কমিটির তিনজন সদস্যের নাম সংগ্রহ করে। গিয়ে বললেন: "এবার আপনার প্রভাব খাটিয়ে বইখানা পাস করিয়ে নিতে হবে।"

নজরুল আঁতকে উঠলেন। বললেন: "সে কি! সদস্যদের কাছে এজন্য ধরনা দিতে হবে—আমার বই পাস করে দেবার জন্য? এ-নোংরামিতে আমি যেতে পারবো না—না।"

ব্যবসায়ী-বন্ধু কেঁদে তাঁর হাত চেপে ধরলেন। বললেন: "রক্ষে করুন কাজী সাহেব। প্রায় হাজার টাকা আমি এ জন্য খরচ করে ফেলেছি। বই পাস না হলে একেবারে মাঠে মারা যাবো। ডিরেক্টরের অনুমোদনের ছাপ না থাকলে এ-বইয়ের মূল্য হবে না। কেউ একখানা বইও কিনবে না।"

অনেক ঝকাঝকি—অনেক তর্ক-বিতর্ক। শেষে কবি বললেন: "আচ্ছা, আপনি যান। আমার একজন লোক আছে, তার সাথে পরামর্শ করে দেখি।"

আমি পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আছি। আমার শিশুপাঠ্য বইগুলো তখন বেশ নাম করেছে। নজরুল আমাকে ডেকে পাঠালেন। সব কথা খুলে বললেন। আর হাতে দিলেন সদস্যদের নামের তালিকা। এই তালিকা আমি তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিলাম। বললাম: "ওটা আমার মুখস্ত। দেখি, কি বই দাখিল করা হয়েছিল?"

বইখানা তিনি বালিশের তলা থেকে টেনে বার করলেন। দেখলাম: বইখানার নাম "মক্তব-সাহিত্য।" লেখক, নজরুল ইসলাম। প্রথম শ্রেণীর জন্য লেখা। প্রকাশ করেছেন, 'খোন্দকার আবদুল জব্বার, ২৫এ, পঞ্চানন তলা লেন, কলিকাতা।' ওপরে সম্ভবতঃ পূর্ণ চক্রবর্তীর আঁকা ঝকমকে তিনরঙা ছাপা কভার। ভেতরেও প্রয়োজন মত ব্লক আছে। বেশ খরচ করা হয়েছে বইখানায়।

বললাম: "এই দেখুন বইখানার প্রকৃত প্রকাশক আপনার হিন্দু-বন্ধু। কিন্তু মক্তবে তাঁর নামে বই চলবে না বলে ভাড়া-করা

কোনো মুসলমানের নাম প্রকাশক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই হলো এর এক নম্বর নোংরামি। তারপর কমিটির সদস্যদের কাছে ঘোরাফেরা করতে হবে—এ হলো দু'নম্বর—।"

নজরুল একটু বিরক্ত হলেন। বললেন: "রাখ ও-সব কথা। এখন আমায় কি করতে হবে, তাই বল।"

আমি হেসে বললাম: "যত ভালো বই-ই হোক, সদস্যদের কাছে একটু যাতায়াত না করলে, বই পাস হবার সম্ভাবনা কম। এখন যা' ভালো হয় করুন। বই পাস না হলে ভদ্রলোক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এ-কথা ঠিক। তবে বই পাস হলে আপনি যে কত দূর লাভবান হবেন, সে-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে।"

এমন সময় প্রকাশক-বন্ধু সেখানে এসে হাজির হলেন। সব শুনে বললেন: "আপনি রাজী হয়ে যান, কাজী সাহেব। খালি একদিন মাত্র আপনি যাবেন।"

আমি বললাম: "এতে আর কাজী সাহেবকে টানবেন না। যা' করবার আমি-ই করবো কাজী সাহেবের জন্য!"

সে দিন ঐ পর্যন্ত হলো।

এর কয়েক দিন পরে একখানা ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো আমার বাসার সামনে। তাতে সেই ভদ্রলোক আর কবি নজরুল।

বুঝলাম: সমব্যবসায়ী বলে ভদ্রলোক আমাকে পুরো বিশ্বাস করেননি। তাই কবিকে ধরে নিয়ে এসেছেন। ওঁদের সাথে যেতে হবে, হাওড়া বেলিলিয়স রোডে। সেখানে থাকেন টেক্স্ট বুক-কমিটির সদস্য—আমাদের জনৈক সাহিত্যিক-বন্ধু।

কোলকাতা গেজেটের ২৪-৯-১৯৩৬ তারিখের সংখ্যায় অনুমোদিত বইয়ের তালিকা প্রকাশিত হলো। দেখা গেলো: কাজী নজরুলের বই 'মক্তব-সাহিত্য' এই তালিকায় স্থান পেয়েছে।

এরপর খবর নিয়ে জেনেছিলাম প্রায় এক বৎসর পর। কবি এ-বই

থেকে একটি পয়সাও পাননি। অনভিজ্ঞ প্রকাশকের ভাগ্যেও টাকা আসেনি। কারণ তিনি করতেন অন্য ব্যবসায়। বই চালাবার চাতুরীগুলো বোধহয় তাঁর জানা ছিল না। এ জন্য বই বেশী চলেনি। বাজারে খুব চাহিদাও দেখিনি এ-বইয়ের।

পরে এ-বই কয়েকজন প্রকাশকের হাত-বদল হয়েছিল। কেউ লাভ করেছেন বলে শুনিনি।

রুচিবান নজরুল

নজরুল দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু রুচিতে তিনি অভিজাত-শ্রেণী অথবা অর্থশালী লোকদেরও ছাড়িয়ে যেতেন। কোনো সময়, কোনো অবস্থাতেই তিনি তাঁর জীবনের মান থেকে নিচে নামেন নি।

পয়সা নেই তো খাবেন না। খেলে তিনি ভালো জিনিসই খাবেন। পান আর জর্দা তিনি প্রচুর খেতেন। সস্তা দামের পচা জর্দা তাকে কোনোদিন খেতে দেখিনি। বাজারের সেরা সোনালী-রূপালী তবক দেয়া খোশবুদার জর্দা তিনি খেতেন। ঐ জর্দার লোভেই তাঁর পান আমি খেতাম। আব অপরিমিত পান খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

পয়সা থাকলে, কোথাও যেতে হলে ট্যাকসীতে চেপে যেতেন। নতুবা যেতেন ট্রামে। কোলকাতার মানুষ-টানা রিকশায় কখনো চাপতে তাঁকে দেখিনি।

একবার হ্যারিসন রোডের 'গণবাণী' অফিস থেকে কলুটোলার 'সওগাত' অফিসে তাঁকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। বেকায়দায় ফেলে রিক্শাতেই চাপিয়ে ছিলাম তাঁকে। কিন্তু তার জন্য মাশুলও আমাকে কম দিতে হয়নি। প্রায় পনেরো দিন তিনি সহজভাবে আমার সাথে কথা বলেন নি।

রাস্তাটা ছিল এমন বে-কায়দার যে ট্রাম, বাস বা অন্য কোনো যান-বাহনে যাওয়ার সুবিধে ছিল না। এক ট্যাকসিতে যাওয়া চলতো। কিন্তু রিকশায় চড়াটা যে এত বড় মারাত্মক একটা অপরাধের কাজ হবে, তা' আমি ভাবতেই পারিনি। কচিৎ-কদাচিৎ তিনি ট্রামে

উঠতেন। কিন্তু তা-ও সকলের অলক্ষ্যে। ট্রামের এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে থাকতেন। এর একমাত্র কারণ, তাঁর চেহারার অসাধারণত্বের জন্য চেনা-অচেনা সকলেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। আর উঁকি-ঝুঁকি মেরে ফিস ফিস করে বলতো: "ঐ নজরুল যাচ্ছে।" এতে তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতেন। ফলে পরের স্টপেজে টুপ করে নেমে পড়তেন।

একবার কলেজ স্ট্রীট থেকে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে, ডি. এম. লাইব্রেরীতে যেতে তাঁকে তিনখানা ট্রাম বদল করতে হয়েছিল—দেখেছি।

হুগলী জেলে আমরা এক সাথে, একই ওয়ার্ডে (১১নং) ছিলাম। এ-কথা আগে বলেছি। সেখানেও তাঁর রুচির খুঁটিনাটি অনেক পরিচয় পেয়েছি। তাঁর বিছানা, তাঁর কম্বল, তাঁর থালাবাটি সবার মধ্যেই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। একটা আভিজাত্যের ছাপ ছিল ঐ দুরবস্থা আর আইন-কানুনের ভেতরেও। দেখলেই মনে হতো: এ যেন জেলের আর সবার চেয়ে পৃথক। ধবধবে ধোয়া-ই শুধু নয়, কতক নিজেই বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করতেন।

অনেকেই হয় তো জানেন, জেল-কয়েদীদেব যে-কাপড় ব্যবহার করতে দেয়া হয়, তাতে প্রথম আগতদের কাপড়ে ("A" Class Prisoner) থাকে সরু নীল রেখা। আর দ্বিতীয় বার আগতদের ("B" Class Prisoner) জন্য থাকে বেশ চওড়া রেখা-টানা কাপড়। নজরুল নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য এই নীল সূতোগুলো টেনে বের করে ফেলেছিলেন জামা থেকে। ফলে তাঁর জামা হয়ে পড়েছিল একক সাদা। যদিও এটা জেল-আইনের বিরোধী, তবু কর্তৃপক্ষ এতে আপত্তি করেন নি। এতে উৎসাহিত হয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীরাও কবির অনুসরণ করেছিলেন।

একবার নজরুল ন'হাজার টাকায় একখানা মোটর কিনেছিলেন, সাময়িক মোহে পড়ে। হিজ মাস্টার্স ভয়েস, বই বিক্রি, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান প্রভৃতি নানা উপায়ে তখন বেশ টাকা-পয়সা

আমদানী হচ্ছিল তাঁর। ধারণা হয়েছিল : মোটর রাখার ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছেন। তবু মোটর কিনেছিলেন তিনি ক্রমঃদেয় চুক্তিতে (Instalment system-এ)। এ জন্য প্রথম যে-কয়েক হাজার টাকা মোটর কোম্পানিকে দিতে হয়েছিল, তা' দিতে হয়েছিল তাঁর 'অগ্নি-বীণা'র খুব সম্ভব এক সংস্করণের স্বত্ব বিক্রি করে। কোনো মহিলাব কাছে। সে-কথা এখন থাক।

এই মোটর কিনতে গিয়েও তিনি অত্যন্ত সুরুচির পরিচয় দিয়েছিলেন। হলদে রঙের জাঁকজমকপূর্ণ মোটর; মোটর-অধ্যুষিত কোলকাতা নগরীতে একটা দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় আধ মাইল দূর থেকে দেখলেই বোঝা যেতো : ঐ নজরুলের গাড়ী আসছে।

রুচির এই পরিচয় দিতে গিয়েও তাঁকে তাঁর মাশুল কম দিতে হয়নি। বন্ধু-বান্ধবের সাথে মোটরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে বহুবার।

কোলকাতার দু'নম্বর ডিষ্ট্রিক্টের গো-খানার সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন জনাব আবদুল হামিদ সাহেব। কি এক উৎসব উপলক্ষে তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে দাওয়াত করেছিলেন। এই উৎসবে গাড়ী নিয়ে নজরুলও এসেছিলেন। আর এসেছিলেন তৎকালীন ইন্‌কাম ট্যাকস্ অফিসার জনৈক খান বাহাদুর সাহেব। সকলের সাথে খাওয়া-দাওয়া, আলাপ-আলোচনা করতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। সকল রকমের যান-বাহন তখন প্রায় বন্ধ।

খান বাহাদুর সাহেব বাডী ফিরতে গিয়ে একটু বিপন্ন বোধ করলেন নিজেকে। কেমন করে তিনি বাড়ী ফিরে যাবেন?

ভদ্রতা দেখিয়ে নজরুল বললেন: "চলুন, আমার গাড়ীতে। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ী ফিরে যাব।"

খান বাহাদুর সাহেব থাকেন পার্ক সার্কাসে, আর নজরুলকে যেতে হবে শ্যামবাজারে। একটা কোলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে আর একটা

একেবারে উত্তর প্রান্তে। আর নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁরা যেখানে এসেছেন, সেটা হলো মধ্য কোলকাতা—বৈঠকখানা রোডে, দু'নম্বর ডিস্ট্রিক্ট গো-খানা অফিসের কোয়ার্টারে। নজরুল খুব ভদ্রতা আর ত্যাগ-স্বীকারই দেখালেন বলতে হবে।

কিন্তু এর পরিণাম হলো বিপরীত। তিন দিন পব নজরুলের নামে নোটিশ এলো : তাঁকে আয়-ব্যয়ের যাবতীয় হিসাব ইন্‌কাম ট্যাক্স্ অফিসে দেখাতে হবে।

নজরুল তো আকাশ থেকে পড়লেন। চোক্ষে দেখলেন সর্ষে ফুল। যাঁর হিসাবই নেই, তাঁর আবার হিসেবের খাতা কি? বাইরের জাঁকজমক বজায় রাখলে হবে কি? আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। ঘরে চলে নিত্য-নৈমিত্তিক ছুঁচোর কীর্তন। আর পকেট তো সব সময় গড়ের মাঠ।

বন্ধু-বান্ধবদের অনেকে এর ভেতরে পড়ে শেষ পর্যন্ত বোধহয় একটা মিটমাট করে দিয়েছিলেন। এই মিটমাটের চেহারা কিরূপ ছিল তা' আমার জানা নেই। তবে এ জন্য দীর্ঘদিন উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ আর অনেক চেষ্টা-তদবির করতে হয়েছিল।

এই সময় নজরুল একদিন আমাকে বলেছিলেন : "দেখলি তো ভদ্রতা দেখাবার পরিণাম?"

একবার দশ টাকায় তিনি একসেট চা-এর সরঞ্জাম কিনেছিলেন। তার ভেতরে একসেট পেয়ালা-পিরিচ ছিল অতি সুন্দর। এর গায়ে ছিল বিদেশী আর্টিস্টের আঁকা একটি অপূর্ব ছবি। পাইল ভরে ছোট একখানা নৌকা তর্ তর্ করে এগিয়ে চলেছে, একটা গাছের ডাল এসে পড়েছে নদীর ওপর। সেই ডালে বসে আছে ছোট একটি পক্ষী-দম্পতি। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট দিয়ে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটু অসাধারণত্বই ফুটেছিল ঐ পেয়ালা-পিরিচের গায়ে আঁকা ছোট ছবিতে। আর রংটাও ছিল ভারী সুন্দর, ভারী মানানসই। তাই ওর বাহির-সৌন্দর্য ছিল লোভনীয়। দেখলেই হাত বাড়াতে ইচ্ছে হয়।

একদিন চা খেতে বসে ঐ পেয়ালার দিকেই হাত বাড়িয়ে ছিলাম আমি। আর সে-দলে আমিই ছিলাম সবচেয়ে ছোট।

কিন্তু নজরুল স্নেহ-মিশ্রিত ধমকে আমাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন: "এ্যা ওঁ, থাম, থাম, ওদিকে লোভ দিস্ নে।"

লজ্জিত হয়ে, হাত টেনে নিয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম: ও পেয়ালা-পিরিচ শুধু নিজের ব্যবহারের জন্যই কিনেছেন তিনি। ঐ পেয়ালায় অন্য কারো চা খাবার অধিকার নেই।

দারিদ্র্য তার বিকট ও ভয়াল মূর্তি নিয়ে সব সময় নজরুলের চারদিকে ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু কোনোদিন তাঁকে কাবু করতে পারেনি, বোধহয় তাঁর শালীনতা আর রুচিবোধের জন্য। আর্থিক-দুর্গতির জন্য দামী কাপড় হয় তো তাঁর ছিল না। সাধারণ যে খদ্দরের পাঞ্জাবি, নিমা, ধুতি বা চাদর তিনি পরতেন, তা যেমন থাকতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি তা' পরিধানের ব্যাপারেও দিতেন বৈশিষ্ট্য আর রুচির পরিচয়।

গণ-সাহিত্যের সংজ্ঞা

১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে কোলকাতা থেকে 'কৃষক' নামে একখানা দৈনিক পত্রিকা বের হয়েছিল। দেশের অগণিত কৃষক-সমাজের ভেতরে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করতেই এই পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছিল। হুমায়ুন কবির, ডাঃ সিরাজুদ্দিন আহমদ, কাজী মোহাম্মদ ইদরীস, মোহাম্মদ হাসান আলী, এঁরা ছিলেন এর সাথে গভীরভাবে জড়িত। আর আবুল মনস্থর আহমদ ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক।

'কৃষক'কে কেন্দ্র করে জন-সাহিত্য-সংসদ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল। মাঝে মাঝে এর বৈঠক বসতো। একদিন হুমায়ুন কবির সাহেব বাছা বাছা কয়েকজন সাহিত্যিককে কৃষক-অফিসে এক চা-চক্রে আহ্বান করলেন। কবি নজরুল এই চক্রে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে মধ্যমণি করে একটা আলোচনা-মজলিস আরম্ভ হলো।

জনাব হুমায়ুন কবির আলোচনার সূত্রপাত করলেন এই বলে: "গণ-সাহিত্যের সংজ্ঞা কি? আমাদের দেশের গণ-সাহিত্যের ধারক ও বাহক কারা? গণ-সাহিত্য স্থষ্টি করতে হলে, কি কি গুণের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন?"

আমার যত দূর মনে পড়ে, অন্যান্য সাহিত্যিকেরা কেউ এ-আলোচনায় যোগ দেননি। শুধু দু'একটি খুচরো আলাপ করেছিলেন মাত্র। আমরা হুমায়ুন কবির সাহেবকেই এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করতে

এমন সময়—খুব মনে আছে আমার—ওয়াজেদ আলী সাহেব প্রস্তাব করলেন: বিরাট পাগড়ি বেঁধে নজরুল ইসলামকে একটি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দেয়া হোক—গলায় দিতে হবে ফুলের মালা। কোমরে ঝুলিয়ে দিতে হবে একটা লম্বা তলওয়ার।

ঘোড়া আর ফুলের মালা জোগাড় করতে আমাদের অসুবিধা হলো না। কিন্তু ঐ শেষ মুহূর্তে তলওয়ার সংগ্রহ করা সম্ভব হলো না। সেদিন কী উৎসাহ আর উন্মাদনাই না জেগেছিল সবাকার মনে!

বিপুল উল্লাসে শোভাযাত্রা হ্যারিসন রোড, ফৌজদারী বালাখানা, কলুটোলা আর বৌ বাজার স্ট্রীট হয়ে স্ব-স্থানে ফিরে এসেছিল।

অ-বাঙালীদের ভেতরেও এ-কবিতা উল্লাস জাগিয়েছিল সে দিন। কারণ এতে আরবী-উর্দু শব্দের প্রাচুর্য থাকায় তাঁরা এর ভাবার্থ বুঝতে পেরেছিলেন।

কোলকাতার মসজিদ বাড়ী স্ট্রীটের বাসা। দোতলার পশ্চিম দিকের কামরায় বসে দাবা খেলা হচ্ছে। পাড়ার কতিপয় ভদ্রলোক এসে বসেছেন। ভীষণ আড্ডা চলছে। এমন সময় আমাদের বন্ধু বিখ্যাত বংশীবাদক জনাব তকরীমউদ্দীন আহমদ সাহেব এলেন। আমার কানে কানে বললেন: "ভাই, একটা গান আমার দরকার। এক্ষুণি লিখে দিতে হবে। এর শেষ শব্দ হবে—'বল, বল।' সুর আমার প্রায় ঠিক করাই আছে, এখন গান হলেই হয়।"

বললাম: "তা'হলে কবিকে বলি?"

তিনি বললেন: 'তাঁর কাছে বহু উৎপাত করেছি, আর তাঁকে বলতে সাহস হয় না। আপনি যদি শেষে "বল বল" দিয়ে একটা গান লিখে দেন, বড় ভালো হয়।"

এর আগে আমার গানের রেকর্ড হয়েছে, তাই তিনি এ-কথা আমাকে বলতে উৎসাহ বোধ করলেন।

বললাম ঃ "আমার লেখা কি আর কবির মতো হবে। আপনার পক্ষ থেকে কবিকে আমি অনুরোধ করবো, এতে অসুবিধার কি আছে ?"

তিনি হাত চেপে ধরলেন। বললেন ঃ "না, আপনি-ই চেষ্টা করুন।"

কবিকে দেখাবার জন্য আমি আমার গানের খাতা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাতেই আমি একটা গান ফরমায়েশ মতো লিখতে শুরু করলাম।

খানিকক্ষণ পরে দেখি, কবি আমার মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন। বললেন ঃ "কি হচ্ছে রে ?"

বললাম ঃ "এই দেখুন না, তকরীমউদ্দীন সাহেবের নির্দেশ— এক্ষুণি একটা গান লিখে দিতে হবে। যার শেষ শব্দ হবে—বল, বল। আপনার কথা বলেছিলাম। কিন্তু উনি লজ্জা পাচ্ছেন আপনাকে বলতে।"

কবি বললেন ঃ "দেখি কি লিখেছিস তুই।"

অতি সংকোচে তাঁর হাতে খাতাখানা তুলে দিলাম। ইশারায় তিনি আমার হাত থেকে কলমটা চেয়ে নিলেন। তারপর তাঁর মুখে ফুটে উঠলো ধ্যানী দরবেশের রূপ। চারপাশে ভীষণ জোরে আড্ডা চলছে, চীৎকার হচ্ছে। তার ভেতরেই কবি ঐ খাতায় লিখে ফেললেন একটি সুন্দর গান ঃ

"কোন কুসুমে তোমায় আমি
পূজিব নাথ বল বল।
তোমার পূজার কুসুম ডালা
সাজায় নিতি বন তল॥" ইত্যাদি

গানটি 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' রেকর্ড করেছেন। আর এটা ছাপা হয়েছে কবির "গুলবাগিচা" বইয়ে।

কোলকাতা কর্পোরেশন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে কয়েক দিন হলো মাত্র পাস করেছি। এখনো গেজেট হয়নি। কবির ওখানে স্বাভাবিকভাবে যেমন যাই, তেমনি দেখা করতে গেছি। দেখি, ঘরের এক কোণে বীরেনদা'—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বসে আছেন। কি যেন কথা হচ্ছিল দু'জনার ভেতরে। বীরেনদা তখন কর্পোরেশন স্কুল-সমূহের ইন্সপেক্টর। সাধারণতঃ হিন্দু-স্কুলগুলো দেখেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন: "শুনলে হে কাজী, তোমার মঈনু তো এবার ভালো রেজাল্ট করেছে।"

কবি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে মুখে জিজ্ঞাসা।

বললাম: "এবার ট্রেনিং পরীক্ষা দিয়েছিলাম। কি রেজাল্ট তা' বীরেনদা'-ই বলতে পারেন।"

বীরেনবাবু বললেন: "না হে, তুমি ভালো রেজাল্ট করেছ। প্রাক্টিক্যাল টিচিং-এ তো আমার মনে হয় নাইনটি আপ নাম্বার উঠেছে।"

কবির চক্ষু বড় হয়ে উঠলো। বললেন: "এটা আবার কি?"

বললাম: "হাতে-কলমে শিক্ষা। কতকগুলি মেথড আছে, সেই অনুযায়ী ছেলেদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে হয়। আনকোরা নতুন ছেলে যদি পেতাম, তা হলে আপনাকে দেখাতে পারতাম।"

কবি বললেন: "তার মানে?"

বললাম: "যে কোনোদিন বই ছোঁয়নি এমন ছেলে। যে কিছু শিখেছে, সে ভুল মেথডে শিখেছে। হঠাৎ ঐ শিক্ষা থেকে তার মন ফেবানো শক্ত। আন্‌কোরা ছেলে পাওয়া গেলে পরীক্ষা করে দেখা যেতো।"

কবির তৃতীয় পুত্র সানি একটু দূরে খেলছিল। বোধহয় তখন ওর বয়স চার কি সাড়ে চার বৎসর হবে।

কবি বললেন: "বেশ, তোর মেথড তুই সানির ওপর চালা দেখি।"

বললাম : যে-বয়স থেকে আমাদের দেশে শিক্ষা আরম্ভ হয়, ওর বয়স তার চেয়ে অনেক কম। মস্তিষ্কের বিকাশ তো আর ভালভাবে হয়নি। আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখছি।"

যে দুষ্টু ছেলে, ওকে কি আর স্থিরভাবে বসানো যায়। কথার যাদুতে ওকে বশে আনতে চেষ্টা করলাম। একটা কিছু ওকে নিয়ে করতে যাচ্ছি, এটা সম্ভবতঃ ও বুঝতে পেরেছিল। তাই ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগলো।

ওকে কোনো কিছু বুঝতে না দিয়ে আমিও ওর মর্জি মাফিক খেলায় যোগ দিলাম। কোন মুহূর্তে ওকে নিয়ে মেঝেয় বসে পড়লাম। কাগজ সামনে ধরলাম। অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি এঁকে তার প্রতি ওকে আকর্ষণ করলাম, ও তা জানতেও পারলো না। খানিকক্ষণ পরে কবি অবাক বিস্ময়ে দেখলেন : ও দিব্যি নিজে নিজেই কাগজের ওপর 'ব' অক্ষরটি লিখতে শিখেছে। শুধু তাই নয়, বইয়ের যে-কোনো জায়গা থেকে 'ব' অক্ষরটি খুঁজে বার করতে পারছে।

বললেন : "এ তো চমৎকার রে। এই একটা অক্ষর শেখাতে আগের দিনের পণ্ডিত মশায়রা ক'খানা বেত পিঠে ভেঙ্গেছেন, আর কত দিন সময় নিয়েছেন!"

বললাম : চমৎকার তো বটেই। তবে এর জন্য চাই, শেখাবার নানা রকম উপাদান, আর শিক্ষকের অসীম ধৈর্য। মেথড শিখলাম বটে, এ-তো আর কাজে লাগানো যাবে না। শিখে রাখলাম এই পর্যন্ত।"

কবি বললেন : "কেন?"

বললাম : "ঐ বীরেনদা-কে জিজ্ঞাসা করুন।"

বীরেনদা' বললেন : "আমাদের দেশ এখনো এত এগুতে পারেনি হে। এ জন্য যে-সকল উপাদানের দরকার, তা' স্কুল-কর্তৃপক্ষ থেকে সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা নেই। একজন শিক্ষককে এ জন্য যে-

পরিমাণ চিন্তা করতে হয়, যে-পরিমাণ সময় নষ্ট করতে হয়, সে-পরিমাণ টাকা এরা পায় না। কী করে এ-সব হবে?"

কবি বললেন: "কেন, কর্পোরেশন স্কুলে তো অন্যান্য প্রাইমারী স্কুলের তুলনায় অনেক বেশী মাইনে দেয় শুনেছি।"

বীরেনদা' বললেন: "হ্যাঁ ত্যায়। ওঁরা অনেক ঝগড়াঝাটি করে মাইনে বাড়িয়েছেন। শিক্ষকদের জেনারেল কোয়ালিফিকেশন আই-এ, বি-এ, এম-এ পর্যন্ত আছে, সব চেয়ে নিচের ডিগ্রি হচ্ছে ম্যাট্রিক। এঁদের মাইনে কি প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশী? কাউন্সিলর থাকতে মিঃ চারু বিশ্বাসও তোমার সুরে সুর মিলিয়ে বলেছিলেন, পনেরো টাকায় ঢের ঢের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক পাওয়া যায়। পনেরো টাকায় শিক্ষক রাখলে তাকে নানা ফন্দিতে টাকা উপায়ের পথের খোঁজে থাকতে হয়। তখনই এক অক্ষর শেখাতে এক মাস সময় নষ্ট হয়।"

এ কথায় কবি হো হো করে হেসে উঠলেন। সানিনিনিকে দেখিয়ে বললেন: "তুই কি ওদের পড়ার ভার নিতে পারবি?"

আমি মাথা নিচু করে বললাম: 'আমি থাকি সেই বালীগঞ্জে, এত দূরে এসে...."

কবি হেসে বললেন: "যা' যা' বুঝেছি তোর বিদ্যে।"

বীরেন বাবু (বীরেন সেনগুপ্ত) এক সময় 'নবারুণ' নামে একখানা মাসিক-পত্র বের করেছিলেন। তাতে আমার "বুলবুল" এই শিরোনামে একটা সনেট ছাপা হয়েছিল।

এই লেখাটা পড়ে কবি নাকি নীরবে কেঁদেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলকে উদ্দেশ্য করেই কবিতাটি লেখা হয়েছিল। বোধহয় তার স্মৃতি কবিচিত্তে দোলা দিয়েছিল।

নজরুল ইসলাম যখন সওগাতের সাথে গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট, তখনই তিনি সুফিয়া এন. হোসেনের (কবি সুফিয়া কামাল) কবিতা—পড়ে মানুষটির সাথে পরিচিত হন। একটি পুর-মহিলা অবরোধের অন্তরালে বসে এমন সুন্দর কবিতা লেখেন, যাঁর ভেতরে আছে এক বিপুল সম্ভাবনার ইঙ্গিত—দেখে তিনি মুগ্ধ হন। সুফিয়ার প্রথম কবিতার বই 'সাঁঝের মায়া' সওগাত প্রেস ছেপে বার করেন। এর জন্য নজরুলের আশীর্বাণী প্রয়োজন।

আমি তখন থাকি ১৮, মুসলমান পাড়া লেনে (কোলকাতা)। একদিন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা। হঠাৎ গিয়ে হাজির নাসিরউদ্দীন সাহেব আমার বাসায়। বললেন: "চলুন, নিচে গাড়ীতে বসে আছেন সুফিয়া আর নূরজাহান।"

নূরজাহান নাসিরউদ্দীন সাহেবের মেয়ে।

"ব্যাপার কি ?"

তিনি বললেন: "চলুন, নজরুলের কাছে যেতে হবে।"

তাড়াতাড়ি এসে গাড়ীতে বসলাম। নজরুল তখন থাকতেন বিবেকানন্দ রোডের কাছে একটি দোতলা বাড়ীতে।

সেদিন আমাদের পেয়ে নজরুল দারুণ খুশী। কত আলাপ, কত আনন্দের হাসি। সেদিনের সেই আনন্দময় পরিবেশের কথা আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে। সে-দিনটি সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে আছে আমার স্মৃতির পাতায়।

রাত প্রায় এগারোটায় আমরা সেদিন ফিরেছিলাম মনে একটা মধুর আনন্দ আর তৃপ্তি নিয়ে। হাতে নিয়ে নজরুলের সহজ সরল অনাড়ম্বর প্রশস্তি।

এতে কবির শেষ কথাটি ছিল এই: "কবি সুফিয়া এন. হোসেন বাঙলার কাব্য গগনে নবোদিতা উদয় তারা। অস্ত-তোরণ হ'তে আমি তাঁকে যে বিস্মিত মুগ্ধ-চিত্তে আমার অভিবন্দনা জানাতে পারলাম, এ

আনন্দ আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবে   এই তারিখটি স্মরণীয়: ১লা শ্রাবণ ১৩৪৫।

"সওগাত" অফিসে বসেছে সান্ধ্য-আসর। বহু সাহিত্যিক-বন্ধু এসে জুটেছেন এই আসরে। নজরুলের হাসি, গান আর উচ্ছ্বসিত কলরবে আসর সরগরম।

এমন সময় দেখলাম একটি উঠতি তরুণ দরওয়াজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন। মাঝে মাঝে উঁকি মারছেন, লজ্জায় ভেতরে প্রবেশ করছেন না হয়তো।

আমি এঁকে জানতাম। বললাম: "এসো হে, ভেতরে এসো।"

তিনি এসে আমার গা ঘেঁষে বসলেন।

হঠাৎ ফাঁক পেয়ে একবার নজরুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম ওঁর দিকে। বললাম: "এঁকে জানেন? এই সংখ্যা সাপ্তাহিক সওগাতে এঁর একটা লেখা বেরিয়েছে। এঁর নাম মোহাম্মদ মোদাব্বের। —'দি মুসলমান' কাগজের সাথে সংশ্লিষ্ট।"

নজরুলের সে কী উচ্ছ্বসিত আনন্দ। পিঠ চাপড়িয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে মোদাব্বেরের অবস্থা কাহিল করে তুললেন। এর পেছনে ছিল তাঁর তরুণদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। মোদাব্বের লজ্জায় যেন একেবারে কুঁকড়ে গেলেন।

বিবেকানন্দ রোডের ওপর একটা বাড়ীতে তখন থাকেন নজরুল ইসলাম। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর কবি-বন্ধু আবদুল কাদির কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ সাহেবের একমাত্র কন্যা আফিফা খাতুনকে বিয়ে করে কোলকাতায় ফিরেছেন কয়েক দিন হলো। একই বাড়ীতে থাকি। একদিন কাদির বললেন: "চল্, কাজীর ওখানে—আফিফাকে দেখা করিয়ে নিয়ে আসি।"

দুই বন্ধু সপরিবারে কবির বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেম। বেলা তখন প্রায় এগারোটা হবে। আমার স্ত্রীর কোলে তখন আমাদের প্রথম সন্তান সাইফুদ্দীন।

আমাদের পেয়ে কবি ভারী খুশী। বিদ্রোহী কবির ভেতরে দেখলাম সেদিন সামাজিক নীতিজ্ঞান। আতিথেয়তার চরম নিদর্শন। ফিরবার সময় তিনি আফিফাকে বেশ দামী একখানা শাড়ী এনে দিলেন, আর আমাদের খোকা সাইফুদ্দীনকে দিলেন চমৎকার রঙীন এক টুক্‌রো পাঞ্জাবির কাপড়। তার রংটা ছিল হাল্‌কা গোলাবী। এরা দু'জনাই সেদিন তাঁর প্রথম অতিথি। বললাম: "আপনিও তা' হলে সামাজিকতার ধার ধারেন?"

উত্তরে তিনি শুধু মৃদু একটু হাসলেন।

* * *

নজরুল ছিলেন দাবা খেলায় ওস্তাদ। বড় বড় দাবাড়ুদের সাথে তিনি দাবা খেলার প্রতিযোগিতায় নামতেন। ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, কোলকাতায় গেলে তাঁর সাথে প্রায়ই খেলা হতো তাঁর।

একদিন গিয়ে দেখলাম, তিনি তাঁর দোতলার কামরায় দাবার ছক নিয়ে বসে নাড়াচাড়া করছেন। বিছানা এলোমেলো। চারদিকে সিগারেটের ছাই। সদ্য নিঃশেষিত চায়ের কাপগুলো দেখে মনে হলো, এইমাত্র এখানকার আড্ডা ভেঙ্গে গেছে। যাঁরা সকাল থেকে এসে আড্ডা দিচ্ছিলেন, তাঁরা এইমাত্র চলে গেছেন।

কবি একা বসে আছেন। হাতে কোনো কাজ না থাকায় দাবার ঘুঁটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। বললাম: "কি করছেন? দাবা খেলবেন নাকি এক হাত।"

হেসে কবি বললেন: "তুই খেলতে জানিস নাকি?"

বললাম: "কিছু কিছু জানি।"

কবি বললেন: "আচ্ছা বোস তা' হলে।"

ঘুঁটিগুলো সাজিয়ে বসা গেলো। তিন চার মিনিটের মধ্যেই তিনি আমাকে মাত করে দিলেন।

বললেন: "তুই তো কিছুই খেলা জানিস না রে।"

বললাম: "হুঁ, তা' বইকি! খেলিনি তাই।"

"বেশ, তা' হলে আবার বোস।"—কবি ঘুঁটিগুলি সাজালেন। এবার আমি খুব সাবধানে খেললাম। এবার আমাকে মাত করতে তাঁর বোধহয় চার মিনিটের কম সময় লাগলো।

বললেন: "আরো খেলবি?"

বললাম: "হুঁ—"।

আবার বসা হলো। তিনি আমাকে নিতান্ত উপেক্ষা করে খুব অমনোযোগী হযে খেলছিলেন। এবার আমি ফাঁক পেযে প্রথমেই তাঁর মন্ত্রীকে গজ দিয়ে কোণাকুণি মেরে দিলাম। তিনি অবাক হয়ে আমাব মুখের দিকে তাকালেন। বললেন: "তুই তো দাবার নিয়ম-কানুন কিছুই জানিস্ না।"

তিনি সবগুলো ঘুঁটি তুলে নিলেন। বললেন: "বেশ! আমার মন্ত্রী, নৌকা, গজ তুলে রাখলাম। শুধু কয়েকটা বড়ে দিয়ে তোর সাথে খেলবো।"

এবার আমাকে মাত করতে তাঁর পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগেনি।

মৃদু হেসে কবি বললেন: "তুই দাবা খেলার কিছুই জানিস না। অথচ আমার সাথে খেলতে তোর সাহস হলো?"

বললাম: "আমি যে দাবা খেলার কিছুই জানি না, আমি তা' ভালো করেই জানি। তবে ইউসুফ আলায়হিস্ সাল্লামের কিস্সা আপনার মনে আছে? সেই যে মিসরের বাজারে যখন তাঁকে বিক্রি করতে নিযে যাওয়া হয়েছিল? আর হাজারে হাজারে লোক উটের পিঠে আশ্রফি বোঝাই করে তাঁকে কিনতে এসেছিল? এক বুড়ী এসেছিল সেই দলে, মাত্র দু' একটা টাকা নিয়ে।

লোকেরা বলেছিল: বুড়ী, তুই কোন সাহসে এলি ?

বুড়ী হেসে বলেছিল: বাবা, বুঝতে পারছ না ? আমি কিনতে পারব না, জানি। কিন্তু হজরত ইউসুফের ক্রেতার দলে আমার নাম লেখা থাকবে তো ?

আমারও সেই বুড়ীর দশা। আপনাকে কোনো সময় একা পাওয়া যায় না। এই সুযোগে আপনার সাথে দু'এক হাত দাবা খেলে নিলাম। বন্ধুদের কাছে গর্ব করে বলতে তো পারব, নজরুল ইসলামের মত বিখ্যাত দাবাড়ুর সাথে আমি দাবা খেলেছি!"

হো হো করে হেসে কবি ঘর ফাটিয়ে দিলেন। আর পিঠে কী বিরাট চাপ্পড় !

আমি তখন টেক্সট্ বই নিয়ে খুব মেতে উঠেছি। ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য লেখা আমার বই 'সাহিত্য-সঞ্চয়ন' বেশ সুনাম নিয়ে ডিরেক্টরের মঞ্জুরী পেয়েছে। মৌলবী শহীদউদ্দীন মাহমুদ—বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের স্বামী ডাঃ ওহীদুদ্দীন মাহমুদের ভাই গিয়ে অভিযোগ করলেন টেক্সট্ বুক কমিটির তৎকালীন সেক্রেটারী খান বাহাদুর মওলা বখ্‌শ সাহেবের কাছে। তাঁর অভিযোগ: "মুসলমানের কোনো লেখায় হিন্দুয়ানী ভাব থাকা উচিত নয়।"

আমি নজরুলের "অমর কানন" কবিতাটি "রাঢ়ের পল্লী" নাম দিয়ে 'সাহিত্য-সঞ্চয়নে' সংকলন করে দিয়েছিলাম। তার এক জায়গায় ছিল:

"রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান
মোরা নারায়ণ সাথে খেলা খেলি অনুখণ,
মোরা বটের ছায়ায় বসি করি গীতা পাঠ,
আমাদের পাঠশালা চাষীভরা মাঠ।" ইত্যাদি

মওলা বখ্‌শ সাহেব আমায় ডেকে পাঠালেন। বললেন: "এ

চারটি লাইন আপনার বদলাতে হবে, নতুবা আপনার বই বাতিল করে দেয়া হবে।"

বললাম: "আমি কেমন করে বদলাবো? বিখ্যাত কবির কবিতা, তিনি নিজে না বদলালে?"

মণ্ডলা বখ্‌শ সাহেব বললেন: "তা জানি না, তবে বদলাতে হবে।"

"আচ্ছা" বলে বেরিয়ে পড়লাম। কবির কাছে গিয়ে বললাম আমার সমস্যার কথা। তিনি বিরক্তি প্রকাশ করলেন। নাসিকা কুঞ্চিত করলেন। তারপর তক্ষুনি বদলে দিলেন। তাঁর নূতন লাইন চারটি এই:

"যত বিহঙ্গ গাহে হেথা রাখালিয়া গান,
প্রকৃতির সাথে মোরা খেলি অনুখণ।
বসি বটের ছায়ায় করি শ্যামশোভা পাঠ,
হেথা আমাদের পাঠশালা চাষীভরা মাঠ॥" ইত্যাদি

এরূপ চিত্তনামা' বইয়ের 'ইন্দ্রপতন' নামে কবিতার দুটি লাইন নিয়ে যখন কাগজে কাগজে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল, তখন তিনি বন্ধুদের অনুরোধে তা' বদলে দিয়েছিলেন।

ডি. এম. লাইব্রেরীতে একদিন কবি বসে আছেন। সামনে বসে আছেন গোপালদাস মজুমদার। উভয়ে কি কথা নিয়ে গভীরভাবে আলাপ করছেন। আমাকে দেখে কবি বললেন: "মঈন! আমার 'কুহেলিকা' বইখানা এঁদের ছাপতে দিচ্ছি কিন্তু ওর কপি কোথায় পাই বলতো? "সাপ্তাহিক সওগাতে' ছাপা হয়েছিল—ওঁদের কাছে

উদ্‌বৃত্ত কপি নেই। এখন ছাপতে দেওয়াই হয়েছে মুশকিল। তোর কাছে আছে সওগাতের কপি ?"

যক্ষের ধনের মতো পুরাতন কাগজগুলো আমি আগলে রাখি। কবি চাচ্ছেন, অস্বীকার করি কি করে ?

বললাম : "আছে, তবে...."

কবি উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন : "ভারী দরকার, তুই দে আমাকে সওগাতের কপিগুলো। বই ছাপাবার পর তোকে দু'খানা বই দেবো। একখানা তোর পাওনা—একখানা এমনি।"

বললাম : "দু'খানা দিয়ে কি হবে ! একখানা হলেই আমার চলবে।"

'কুহেলিকা' পুস্তকাকারে ছাপা হবার পর কবি তাতে নিজের নাম স্বাক্ষর করে একখানা বই দিয়েছিলেন আমাকে। শুধু 'কুহেলিকা' নয়, তাঁর যখন যে-বই বেরিয়েছে, আমাকে দিয়েছেন একখানা করে। কিন্তু 'বই-চোরা' বন্ধুদের কৃপায় ওর সবগুলো এখন আমার কাছে নেই। বাজার থেকে কিনে নেয়া চলে। কিন্তু কবির স্মৃতি-বিজড়িত সেই বইগুলোই ছিল আমার অমূল্য সম্পদ।

কবি তখন কৃষ্ণনগরে থাকেন। আর আমি থাকি বেচুঠাকুরের গলি—কারমাইকেল হোস্টেলের পেছনে। সওগাত-অফিসে এলে একদিন তাঁকে দাওয়াৎ করলাম। নিয়ে এলাম বাসায়। সন্ধ্যা তখন উৎরে গেছে। খাওয়ার আয়োজন আমার সংগতির তুলনায় ভালই করেছিলাম।

বাড়ীতে এসে পৌঁছেই বললেন : "এটা কি রে ?"

বললাম : "রান্নাঘর।"

"আর ওটা ?"

"ওটা হলো পায়খানা।"

"দূর শয়তান! পায়খানা কি রে? বল যায়খানা।—খানা তো ওখান দিয়েই যায় রে।"

তারপর হাসি। সে কী বিরাট হাসি! তাঁর হাসির ধমকে কার্নিসের আড়ালে এসে যে-কপোতটি রাত্রের জন্য আশ্রয় নিয়েছিল, সে পাখা ঝটপট করে উড়ে পালালো।

আমার স্ত্রীকে দেখে বললেন: "আরে, এত ছোট বিয়ে করেছিস তুই? দেশ থেকে আনতে বোধহয় ওর হাফটিকিট লেগেছিল?"

আমার স্ত্রী লজ্জায় ঘোমটা টেনে দিলেন। আর আমি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলাম।

খেতে বসে বললেন: "কৈ রে! ডাল কোথায়? তুই যে বললি, ডালভাত খেতে হবে।"

বললাম: "পোলাওয়ের সাথে আমরা ডাল খাইনে। গোশতের সুরুয়া দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিন।"

হো হো করে কবি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন: "অনেক দিন মুসলমানী খানা খাইনি রে, আজ খেয়ে ভারী আরাম পেলাম।"

'গণবাণী' অফিসে গিয়েছি সওগাতের জন্য নজরুলের লেখা আনতে। অনেকেই তখন কবিকে ঘিরে বসে আছেন। তাঁদের ভেতরে বন্ধু আবুলকালাম শামসুদ্দীনও আছেন। বেশ আলাপ-আলোচনা চলছে। হঠাৎ কবি আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন: "ওরে, তোরা জসীমউদ্দিনের 'কবর' পড়েছিস?"

অনেকেই বললেন যে তাঁরা পড়েননি। শামসুদ্দীন বললেন: "এর নাম তো কখনো শুনিনি।"

কবি বললেন: "নতুন লিখছে—ভালো লিখছে।"

বললাম: "কোথায় বেরিয়েছে জসীমউদ্দীনের 'কবর'?"

কবি আনন্দে যেন ফেটে পড়লেন। বললেন: "যা, এক্ষুণি

নিয়ে আয়, আমি স্লিপ লিখে দিচ্ছি। এ মাসের কল্লোলে বেরিয়েছে।"

আমার আর যেতে হলো না। সেই দুপুর বেলায়, রোদ মাথায় 'গণবাণী'র একটা লোককে "কল্লোল" অফিসে পাঠানো হলো। কবি নিজে কবিতাটি আবৃত্তি করে আমাদের শোনালেন। বললেনঃ "এই কবিতায় ফুটে উঠেছে এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত।"

জসীমউদ্দীনের কবিতা তখন সামান্যই বেরিয়েছে কাগজে। তখন ওর কবিতা নজরুল ইসলামই কিছু হাত বুলিয়ে পাঠাতেন এ কাগজে, ও কাগজে।

শক্তিশালী তরুণ লেখকদের তিনি কিরূপ ভালোবাসতেন, আর তাঁদের আকর্ষণ করতেন সাহিত্যের পবিত্র অঙ্গনের দিকে, তাঁর এ-দিনের ভাবময়ী উচ্ছ্বাস দেখে আমাদের এ কথাই মনে হয়েছিল।

কোলকাতা দু'নম্বর ডিস্ট্রিক্ট গো-খানার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ আবদুল হামিদ একবার কবিকে নিয়ে গেলেন চুণারে। সেখানে পাঠান-সম্রাট শের শাহর দুর্গ আর অনেক পুরাতন কীর্তি আছে ছড়িয়ে। বায়ু-পরিবর্তনের স্থান হিসেবেও ভালো। তাই কবি আগ্রহ করে তাঁর সাথে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে এ্যাডভেঞ্চারের নেশা তাঁদের পেয়ে বসলো। একদিন রাত্রে তাঁরা সেখানে হরিণ শিকার করতে গেলেন। রাত্রের শিকারে জোরালো টর্চের ফোকাস ফেলতে হয়। এই তীব্র আলো হরিণের চোখে পড়লেই সে দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কোলকাতায় ফিরে এর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছিলেনঃ "যখন তীব্র আলোর ছটা গিয়ে হরিণের চোখে পড়লো, হরিণ তখন থমকে দাঁড়ালো। আর এমন করুণ নয়নে আমার মুখের দিকে চাইলো, যে আমি আর ফায়ার করতে পারলাম না। হাত থেকে বন্দুক

পড়ে গেলো। আর হরিণ গেলো পালিয়ে।"—এই কথাগুলো বলতে গিয়ে তাঁর গলার স্বর তখন কাঁপছিল।

চুণারে থাকতে পরে আর একদিন সম্ভবতঃ আবদুল হামিদ সাহেব একটি হরিণ মেরেছিলেন, তার গোশত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কোলকাতায় তাঁর বাসায়। ওঁর কোয়ার্টারের কাছে বৈঠকখানা রোডে তখন আমি থাকতাম সপরিবারে। কবির অনুরোধে এস. এম. জহুরউদ্দীন ঐ সঙ্গে আমাদের জন্যও কিছু গোশত বহন করে এনেছিলেন। কার্টিজ ফুরিয়ে যাওয়ায়, তা' নিয়ে যেতেই বিশেষ করে জহুরউদ্দীন কোলকাতায় এসেছিলেন।

কোলকাতা, বৈঠকখানা রোডে—টিন-ঘেরা মাঠে নবনির্বাচিত লীগ মন্ত্রীদের অভিনন্দন দেয়ার আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দীন আর মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার উপস্থিত। লোকের ভিড়ে একটু দাঁড়াবার স্থান নেই। এমন সময় নজরুলকে নিয়ে আসা হলো। সভায় নজরুল প্রবেশ করতেই বিরাট জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি করে তাঁকে অভ্যর্থনা করলো। সে কী উল্লাস! সে কী আনন্দধ্বনি!

মন্ত্রীদের অভিনন্দন-পত্র আমাকেই পড়তে হবে। এ জন্য আমি মন্ত্রীদের পাশেই দাঁড়ানো ছিলাম। খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব, মিঃ সরকারের কানে কানে বললেন: "নজরুল এত জনপ্রিয়, তা' আমি আগে জানতাম না।"

এরপর তাঁদের ফিস্ ফিস্ করে কি কথা হতে লাগলো, তা' আমি আর লক্ষ্য করিনি।

নজরুলকে জনাব হক সাহেবের পাশেই একটি চেয়ারে এনে বসানো হলো।

অভিনন্দন-পত্র পড়তে যখন আমি টেবিলের ওপরে দাঁড়াতে যাচ্ছি;

কবি আমার পিঠে খুব জোরে একটা চাপড় মেরে বললেন : "ওঠ তাড়াতাড়ি, ঘাবড়ে যাসনে !"

হেসে আমি তাঁকে নীরব-অভিনন্দন জানালাম।

পড়া আমার বেশ ভালোই হয়েছিল। টেবিল থেকে নেমে আসতেই কবি মাথা ধরে খুব ঝাঁকানি দিলেন। এতে একটি অভিজাত-মহফিলের শালীনতা একটু ক্ষুন্ন হলো বৈকি! খাজা সাহেব গম্ভীর হয়ে রইলেন। আর আর সবাই হাসতে লাগলেন। কারণ সবাই নজরুলের এই অনিয়মতান্ত্রিকতার সাথে পরিচিত ছিলেন।

আমি তখন 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকার সাথে সংশ্লিস্ট। কয়েক দিন ধরেই মওলানা আলী আহমদ ওলী ইসলামাবাদী সাহেব তাগিদ দিচ্ছেন 'ছোলতান' অফিসে একদিন কবি নজরুলকে নিয়ে যেতে হবে। 'ছোলতান' তখন সাপ্তাহিক আকারে বের হচ্ছে। ওর অফিস মির্জাপুর স্ট্রীটে। ইসলামাবাদী সাহেব তার চার্জে।

কৃষ্ণনগর থেকে কোলকাতায় প্রবেশ-পথে—শেয়ালদহ স্টেশনে কবিকে পাকড়াও করে 'ছোলতান' অফিসে নিয়ে গেলাম। কোলকাতার বিশাল জনারণ্যে হারিয়ে গেলে তাঁকে তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! তখন প্রায় সন্ধ্যা। রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত সেখানে চললো হাসি, গান আর আলাপ-আলোচনা। ফিরবার পথে রাস্তায় নেমে কবি বললেন : "তুই যা'—আমি কলেজ স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছি, সেখানেই কোন বন্ধুর ওখানে আজ রাত কাটাবো।"

বললাম : "তা' কি হয়, এত রাত্রে কাকে আবার মুশকিলে ফেলবেন। চলুন আমাব ওখানে!"

সত্যাগ্রহীর সম্পাদক মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী সাহেব তখন মফঃস্বল সফরে গেছেন। অফিসের সম্পূর্ণ ভার আমার ওপর। ওখান থেকে কাছেই—১০।৩, মুসলমান পাড়া লেনে। ওখানেই আমি থাকি।

কবি এলেন। ধবধবে সাদা বিছানা পাতা। জানালা দিয়ে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়েছে বিছানায়! বললাম: "খাওয়ার হাঙ্গাম তো ওখানেই চুকিয়ে এলাম। এখন শুয়ে পড়ুন।"

কবি বললেন: "তুই শুবি কোথায়?"

বললাম: "এই পার্টিশানের ও-পাশে। রাত্রে দরকার হলে ডাকবেন।"

ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কায় জানালা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলাম। কবি হেসে বললেন: "এমন সুন্দর জ্যোৎস্না থেকে তুই আমাকে বঞ্চিত করতে চাস? খবরদার! জানালা বন্ধ করিসনে।"

সকালে কবির ঘুমই আগে ভেঙেছিল। তিনি পার্টিশানের এদিকে এসে দেখলেন: খবরের কাগজ বিছিয়ে মাথায় বই দিয়ে আমি তখনো ঘুমুচ্ছি।

বললেন: "তোর আরামের বিছানা আমাকে ছেড়ে দিয়ে রাতভর তুই এই কষ্ট করলি?"

বললাম: "আপনার জন্য এ-কষ্ট কি খুব বেশী হলো? আপনি একটু বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি।"

কোনো বন্ধুর কাছ থেকে কিছু পয়সা জোগাড় করে নাশতা নিয়ে ফিরতে আমার একটু দেরি হলো। এসে দেখলাম: পাখী খাঁচা থেকে পালিয়ে গেছে!

এরপর একদিন কৃষ্ণনগরে গিয়ে অনুযোগ করলাম। তিনি হেসে বললেন: "আমার অপেক্ষা করবার উপায় ছিল না রে। বাড়ীতে ছিল তণ্ডুল নাস্তি। কিছু টাকা যোগাড় করে দশটায় আবার আমার এখানে ফিরে আসতে হলো।"

বললাম: "এ কথা আমাকে বলেন নি কেন? তা হলে তো আর আপনাকে সেদিন 'ছোলতান' অফিসে নিয়ে আটকাতাম না!"

তিনি বললেন: "ওঁরা আদর করে ডাকেন, না গিয়ে কি করি বল!"

তারপর তিনি হাঃ হাঃ করে তাঁর সেই চির বৈশিষ্ট্য হাসি হাসলেন।

ধ্যান-স্তিমিত নজরুল

১৯৪১ সালের পর....।

শেষের দিকে নজরুলের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ খুব কম হতো। আমি তখন সাংসারিক নানা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলাম। উদ্‌মো ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াবার সুযোগ থেকে হয়েছিলাম বঞ্চিত। যুদ্ধের জন্য দেশের বিশ্রী আবহাওয়াই ছিল প্রধানতঃ এ জন্য দায়ী। তারপর অম্লরোগের প্রবল আক্রমণে আমার অবস্থাও তখন ছিল খুব কাহিল।

এক সময় খবর পেলাম: বহরমপুর, লালগোলা হাই-স্কুলের হেড মাস্টার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত মজুমদার মহাশয়ের শিষ্য হয়েছেন নজরুল। শ্রীযুক্ত মজুমদার গৃহী-যোগী। নজরুল তান্ত্রিক মতে দীক্ষা নিয়েছেন তাঁর কাছে। আর কালীসাধনায় মত্ত হয়ে উঠেছেন।

আবার খবর পেলাম: কোনো এক মুসলমান দরবেশের শাগ্‌রিদ্‌ হয়ে মারফতী তত্ত্ব আলোচনা নিয়ে মাতামাতি শুরু করেছেন। কুরআন-শরীফের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনে তিনি সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছেন।

নজরুল-চরিত্রের সাথে পরিচিত থাকায় এ-ঘটনা আমার কাছে আশ্চর্য আর অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি। যে পরিবেশে নজরুলের জন্ম হয়েছিল, সে পরিবেশ ছিল সুফীমতবাদের ধারক। নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমদ সাহেব হাজী পাহ্‌লোয়ানের দর্গা বা মাজার শরীফের ছিলেন খাদেম। অতএব নজরুলের রক্তে ছিল—সুফীইজ্‌মের বীজ। সুফীসাধকদের অলৌকিক কার্যে তিনি শিশু-

বয়সেই হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস তাঁর রূপ নিয়েছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় প্রথম প্রকাশিত 'মুক্তি' কবিতায়। এই কবিতায় তিনি এক সাধকের বিরাট মনের পরিচয় দিয়েছেন। —"এক গাড়ীর চাকার তলায় পড়ে এক দরবেশের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুলিসের হাত থেকে গাড়োয়ানকে মুক্তি দিয়ে যান। বলেন: 'যে আমাকে সংসার বন্ধন থেকে দিয়েছে মুক্তি, তাকে কি বন্দী করা চলে?' —এই ঘটনা কবি সত্য বলে ঘোষণা করেন। আর এতে ফুটে ওঠে দরবেশের ওপর তাঁর সীমাহীন শ্রদ্ধা। তাঁর অবচেতন মনে যে সাধনার বীজ ছিল সুপ্ত, বুলবুলের মৃত্যুর পর এবং স্ত্রীর দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি স্বতঃই সে-সাধনক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ফলে তিনি স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু-মুসলমান এই দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী-সাধকেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর কারণও সুস্পষ্ট।

আমার ধারণা: নজরুলই সম্ভবতঃ একমাত্র কবি, যিনি এ দেশের হিন্দু-মুসলমান দুই বৃহৎ জাতিকে বলিষ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর কবিতা, তাঁর গান, তাঁর সামাজিক মেলামেশা প্রভৃতির ভেতর দিয়েই তা' ফুটে উঠেছে।

তিনি বিশ্বাস করতেন, এই দুই বৃহৎ জাতির পরস্পর প্রীতির অন্তরালেই সমগ্র দেশের কল্যাণ নিহিত আছে। তাই তিনি সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পেরেছেন। এ ব্যাপারে তিনিই বোধহয় একক। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, এমন কি রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যক্ষেত্রে সব সময় সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। নজরুল এঁদের ছাড়িয়ে সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে জোরালো কণ্ঠে মিলনের আওয়াজ তোলেন—সার্থক আওয়াজ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাই তাঁর মৃত্যুতে নজরুল লিখেছেন:

"নিন্দা-গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, পাগল মিলন হেতু,
হিন্দু-মুসলমানের পরাণে তুমিই বাঁধিলে সেতু!

জানি না আজিকে কি অর্ঘ দেবে হিন্দু-মুসলমান,
ঈর্ষা-পঙ্কে পঙ্কজ হয়ে ফুটুক এদের প্রাণ।"

সাধনক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাই আমার মনে হয় হিন্দু-মুসলমান দুই সাধকের প্রজ্ঞা লাভ করে নজরুল উভয় দর্শনের একটা সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। তা' সম্ভব কি অসম্ভব, তা' আমার পক্ষে বলা শক্ত। কারণ দুই জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতা এক নয়। তবে এ ক্ষেত্রে নজরুল ব্যর্থ হয়েছেন। এই ব্যর্থতাই এনে দিয়েছে তাঁর শরীর, মন ও মস্তিষ্কের বিকৃতি।

বিজ্ঞান-জগৎ হয়তো আমার এই মতে সায় দেবে না। তবে সাধনক্ষেত্রের ইতিহাসে এরূপ নজিরের অভাব নেই। সিদ্ধ আওলিয়া-দরবেশের জীবন আলোচনা করলে এর পরিচয় পাওয়া যাবে। এই সকল আওলিয়া দরবেশের পেছনে তাঁদের শক্তিশালী ওস্তাদের বলিষ্ঠ হস্ত সব সময় থেকেছে উদ্যত, রক্ষা করেছেন তাঁরা শিষ্যকে সম্ভাব্য সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে। হয়তো নজরুলের পেছনে এরূপ কেউ ছিলেন না। তাই আজ তাঁকে দেখা যাচ্ছে ধ্যান-স্তিমিত। মনে হচ্ছে এ জগতের বাইরের লোক বলে। শক্তিশালী সাধকের সংস্পর্শে এ ধ্যান তাঁর ভাঙতে পারে। হয়তো খুলে যেতে পারে তাঁর চোখ নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে, নতুন পৃথিবীতে। আমাদের এই ঐকান্তিক ইচ্ছা কি পূর্ণ হবে? আমরা কি এতই ভাগ্যবান?

বুলবুলের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর মনে বৈরাগ্যের সূচনা হয়। বৈরাগ্য ক্রমে তাঁর সকল সত্ত্বাকে গ্রাস করে ফেলে। পুরোপুরি ধ্যান-স্তিমিত হওয়ার দু'এক বছর আগে থেকেই তিনি বুঝতে পেরে-ছিলেন নিজের অবস্থা। এ জন্য এই সময় যাঁর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁকে তিনি নিজের সত্য উপলব্ধি অকপটে বলে ফেলেছেন। কোনো সভা-সমিতিতে ডাকলে সভার মূল উদ্দেশ্য এড়িয়ে 'অসীম-সুন্দরের' কথাই বার বার করে বলেছেন।

ধ্যান-স্তিমিত হওয়ার বেশ কয়েক বৎসর আগে তিনি লেখেন

'গুবাক তরুর সারি' (১৯২৯)। এটা লেখেন তিনি চট্টগ্রামে বসে। আজকের এই অবস্থার কথা যেন তিনি সেই দিনই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আজকের এই আর্তি যেন সেই দিনই তাঁর লেখায় ফুটে বেরিয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন :

"তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না,
কোলাহল করি সারাদিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।
নিশ্চল নিশ্চুপ—
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধ-বিধুর ধূপ।"

অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ সাহেবের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "আমাদের এই যে দেশ আর সমাজ, এ একদম মরুভূমি হয়ে পড়েছে। ঘড়ায় ঘড়ায় পানি এনে অনেক ঢেলে দেখলাম, তাতে এ মরুর কিছুই করা গেল না। তাই এবার সাগরের পানে চলেছি। দেখি, মেঘ হয়ে ফিরে এসে জল হয়ে ঝরে পড়ে একে সুজলা সুফলা করতে পারি কি না।"

১৯৪১ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র রজত-জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ৫ই ও ৬ই এপ্রিল তারিখে। এই সময় সাহিত্য-সমিতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন নিবিড় ভাবে, মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার আর মুজীবর রহমান খাঁ। এই সভা উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেব। সভাপতিত্ব করেন কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলামের অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে আলোচনায় আলোকপাত করতে হলে, এই সভায় তিনি যে ভাষণ প্রদান করেন তা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভাষণটি এই :

"আপনারা এই ভিখারীকে 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'র জুবিলী-উৎসবে সভাপতি কেন যে মনোনীত করলেন, যিনি বিশ্বভুবনের পরম পতি, পরম গতি, পরম প্রভু—তিনিই জানেন। আপনাদের কাছে আজ অজানা নেই যে,—ঘরে-বাইরে, সভায় বা সমাধির গোপন গুহায় কোথাও পতিত্ব করার ইচ্ছা বা সাধ আমার নেই। যিনি সকল

কর্মের, ধর্মের, জাতির, দেশের, সকল জগতের একমাত্র পরম স্বামী,—পত্তিত্ব বা নেতৃত্ব করার একমাত্র অধিকার তাঁর। এ অধিকার মানুষেও পায়, মানি। কিন্তু সে পাওয়া যদি তাঁর কাছ থেকে না হয় তারে বলে অহঙ্কার। এই অহঙ্কারকে আমি অসুন্দরের দূত বলে মনে করি। এ অহঙ্কার divine নয়, Demon—অসুন্দরের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ পরম সুন্দর। তিনি আমার কাছে নিত্য প্রিয়-ঘন সুন্দর, প্রেম-ঘনসুন্দর, রস-ঘনসুন্দর, আনন্দ-ঘনসুন্দর। আপনাদের আহ্বানে যখন কর্মজগতের ভিড়ে নেমে আসি, তখন আমার পরম সুন্দরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হই, আমার অন্তরে বাহিরে ত্বলে ওঠে অসীম রোদন। আমি তাঁর বিরহ এক মুহূর্তের জন্যও সইতে পারি না। আমার সর্ব অস্তিত্ব জীবন-মরণ-কর্ম-অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যে তাঁরই নামে শপথ করে তাঁকে নিবেদন করেছি। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমার ক্ষমা-সুন্দর প্রিয়তম আমার আমিত্বকে গ্রহণ করেছেন।

আমার বহু আত্মীয়াধিক প্রিয় সাহিত্যিক ও কবি-বন্ধু আমায় অভিযোগ করেন, আমার নাকি দান করার অপরিমাণ শক্তি ছিল দেশকে, জাতিকে, সাহিত্য-রস-পিপাসু মনকে—শুধু কার্পণ্য ক'রে বা স্বার্থপরের মত আপন মুক্তির প্রচেষ্টায় সেই দক্ষিণাদানের দক্ষিণ হস্তকে ঊর্ধ্বে না-জানা শূন্যের পানে তুলে ধরেছি। তাঁরা আমায় আত্মীয়ের চেয়েও ভালোবাসেন—তাঁরা যখন এ-কথা বলেন, আমার চোখের জলে বুক ভেসে যায়। যে অভিমান তাঁরা আমার উপর করেন, সেই অভিমান জানাই আমি আমার নির্ব্বিকার উদাসীন একাকীত্ব নিয়ে আমার পরম সুন্দরকে। যে মহাসাগর থেকে ঝড়ের রাতে শ্যামঘন মেঘরূপে আমি সহসা এসেছিলাম, ঘন ঘন বিদ্যুৎ ছটায়, বজ্রের রোলে ঘোর তিমির-ঘনঘটায়, মুক্ত জটায় দিগদিগন্তে ছেয়ে ফেলেছিলাম, অজস্র বারিবর্ষণে তৃষিত মাঠ-ঘাট-প্রান্তরের তৃষ্ণা মিটিয়ে ছিলাম; আমার রুদ্র-সুন্দর নৃত্য দেখে যাঁরা দেখতে পাননি, যে এই অশান্ত মেঘ-ঘন রূপ শুধু রুদ্রের ডমরু বিষাণ নিয়েই আসেনি,

এরই করুণ নয়নের অশ্রুধারায় পৃথিবীতে ফুটেছে প্রেমের ফুল ; শতদল-বৃন্ত বন-লতা হয়ে উঠেছে আনন্দে কণ্টকিত ; এই মেঘই এনেছে আনন্দ-বন্যা, ছন্দের নূপুর-ধ্বনি, সুরের-সুরধুনী, গানের প্রবাহ,—সেই মেঘ একদিন দেখতে পেল, সে তুষারীভূত হয়ে শ্বেতশুভ্ররূপে হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে পড়ে আছে। তার শক্তি—তার প্রিয়াও যেন মহাশ্বেতারূপে তার বামে সমাধিস্থা। সেই সমাধির মাঝে আমি যেখান থেকে এসেছিলাম সেই সমুদ্রকে স্মরণ করতাম। সহসা মনে হ'ত, এই মহাসমুদ্র এল কোথা থেকে। খুঁজতে গিয়ে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—সব কিছু হারিয়ে যেত আকাশের পর আকাশ পেরিয়ে কোন্ এক পরম শূন্যে। তাই, বন্ধুদের বলেছি, এ আমার কার্পণ্য নয়, স্বার্থপরতা নয়—এ আমার স্ব-ধর্ম, এ আমার স্বভাব। তাঁরা তুষারীভূত আমাকে ভেঙে যেটুকু বরফ পেয়েছেন, তাতে তাঁদের তৃষ্ণা দূরীভূত হয় না বলেছেন, আমি তাঁদের আমার অসহায় অবস্থার কথা বললে বিশ্বাস করেননি। ঘুড়ি উড়তে উড়তে গেছে ডালে আটকে—টানাটানি করলে সুতো ঘুড়ি সব যাবে ছিঁড়ে—অবুঝ হাত, তবু টানাহেঁচড়া করতে ছাড়ে না।

আপনাদের এই সাহিত্য-সভায়, রসের জলসায় আপনারা আমার অসহায় জীবনী শুনতে আসেননি। আমি আমার এ অসহায় অবস্থার কথা আগেই জানিয়েছিলাম। যার গলায় হয়েছে টন্‌সিল বা বেধেছে কুলের আঁটি, সে সঙ্গীত-শিল্পীকে জোর করে গান গাওয়ালে সে যত না গাইবে গান—তার চেয়ে অনেক বেশী ক'রে প্রকাশ করবে তার কণ্ঠের অসহায় অবস্থা, সুরের চেয়ে, আঁটি আর টনসিলের ব্যথাই বড় হয়ে উঠবে। আপনারা ইচ্ছা করে এ শাস্তি গ্রহণ করছেন, আমি নিরপরাধ। যে সিংহ আছে খাঁচায় আটকে—তার ল্যাজ ধরে টেনে ল্যাজ ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, হুঙ্কারও শুনতে পারেন, কিন্তু তাকে টেনে বের করতে পারবেন না। যিনি বন্ধ করেছেন, তিনি দয়া করে দুয়ার না খুললে আমার বাইরে আসার কোনো উপায় নেই।

আনন্দ-রস-ঘন স্বর্ণবর্ণের এক না-জানা আকাশ থেকে যে শক্তি আমায় রস সরবরাহ করতেন—আগেই বলেছি, তিনি মহাশ্বেতারূপে মাঝে মাঝে হয়ে যান সমাধিস্থা। তখন আমিও হয়ে যাই নীরব, আমার বাঁশী আর বাজে না, রস-স্রোত হয়ে যায় তুষারীভূত, আমার আনন্দময়-তনু হয়ে যায় পাষাণ-বিগ্রহ। এ মৃত্যু নয়, কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও নিরানন্দময়। আজ আপনাদের কাছে বলে যাব—আমার নিদ্রিতা সমাধিস্থা শক্তি জেগেছেন, তবে তন্দ্রার ঘোর—সমাধির বিহ্বলতা এখনো কাটেনি। আমার সেই আনন্দময়ী শক্তি যদি আবার সমাধিস্থা না হন, আমায় পরমশূন্যে নিয়ে গিয়ে চিরকালের জন্য লয় না করেন—তা'হলে এই পৃথিবীতে যে প্রেমের—যে সাম্যের—যে আনন্দের গান গেয়ে যাব—সে গান পৃথিবী বহুকাল শোনেনি। আমার চির-জনমের প্রিয়া এই প্রেমময়ীর প্রেম যদি না পাই—তা' হলে বুঝব, আমার এবারের মত খেলা ফুরাল। আমার বাঁশী বিরহ-যমুনার তীরে ফেলে চলে যাব। শুষ্ক যমুনার বালুচর থেকে সেই বেণু কুড়িয়ে যদি অন্য কেউ বাজাতে পারেন, আমার ফেলে যাওয়া বাঁশী ধন্য হবে।

যাঁর ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্যমধুর রূপ দর্শন করেছি—তিনি যদি আমার সর্ব অস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন, সেই শক্তির চোখে আবার যদি অশ্রুর বন্যা বয়, তাঁর অঙ্গে যদি আবার অমৃত রসধারা প্রবাহিত হয়, আবার যদি তাঁর চরণে রাস-নৃত্যের ছন্দ জাগে—তা হলে আমি এই বিদ্বেষ-জর্জরিত কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতা—ভেদজ্ঞান-কলুষিত, অসুন্দর অসুর-নিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর করে যাব, এই তৃষিতা পৃথিবী বহুকাল যে প্রেম, যে অমৃত, যে আনন্দ-রসধারা থেকে বঞ্চিত—সেই আনন্দ, সেই প্রেম সে আবার পাবে। আমি হবো উপলক্ষ্য-মাত্র, আধার মাত্র; সেই সাম্য, অভেদ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম আসবে আমার নিত্য পরম-সুন্দর পরম-প্রেমময়ের কাছ থেকে। নীরস তরুকে নিঙড়ে আপনারা রস পাবেন না। তাকে রসায়িত হবার অবকাশ দিন।

আপনাদের আনন্দের মুক্তির, রসের তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে জানি—তবু অপেক্ষা করতে হবে। আমি এই আনন্দের, এই প্রেমের ভিক্ষাপাত্র নিয়েই তাঁর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি—যদি আমি না পাই, আপনাদের কেউ পান—সেই পরম সুন্দরের নামে শপথ করে বলছি, তা'হলে আমি নিজে পেলে যে আনন্দ পেতাম, তেমনি সমান আনন্দ পাব - সর্বাগ্রে আমি গিয়ে তাঁর চরণ-বন্দনা করব—সেবক হয়ে, দাস হয়ে তাঁর আজ্ঞা পালন করব। যদি আপনাদের তৃষিত নয়ন আমাকেই কেন্দ্র করে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করে আছে বলেন, তা' হলে আশীর্বাদ করুন—যে, আমার অর্ধ-জাগ্রতা আনন্দময়ী শক্তি যেন আবার সমাধিমগ্না না হন, আবার যেন তাঁর সুন্দর নয়নের প্রসাদ পাই, তাঁর প্রেমের প্রবাহ-কূলে আবার যেন জ্ঞানে শক্তিতে আনন্দে নিত্য পূর্ণ হয়ে নৃত্য করতে পারি।

যদি আর বাঁশী না বাজে—আমি কবি বলে বলছিনে—আমি তোমাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি—আমায় তোমরা ক্ষমা করো—আমায় ভুলে যেয়ো। বিশ্বাস করো আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি—আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম—সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেম-হীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।

হিন্দু-মুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব—অন্য দিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মত জমা হয়ে আছে—অসাম্য এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম, আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম—অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম—তোমরা সাক্ষী, আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না—

তবু তোমরা আদর করে যখন নেতৃত্বের আসনে বসাও, তখন অশ্রু সম্বরণ করতে পারি না—তাঁর আদেশ পাইনি, তবু রুদ্রসুন্দররূপে আবার তোমাদের নিয়ে এই অসুন্দর, এই কুৎসিত অসুরদের সংহার করতে ইচ্ছা করে। যদি তোমাদের প্রেমের প্রবল টানে আমাকে আমার একাকীত্বের পরম শূন্য থেকে অসময়েই নামতে হয়—তা' হলে সেদিন আমায় মনে করো না আমি সেই নজরুল। সে নজরুল অনেক দিন আগে মৃত্যুর খিড়কি দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেদিন আমাকে কেবল মুসলমান বলে দেখো না—আমি যদি আসি, আসবো হিন্দু-মুসলমানের সকল জাতির উর্ধ্বে, যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাঁরই দাস হয়ে। আপনাদের আনন্দের জুবিলী-উৎসব আজ যে পরম বিরহীর ছায়াপাতে বর্ষাসজল রাতের মত অন্ধকার হয়ে এল, আমার সেই বিরহ-সুন্দর প্রিয়তমকে ক্ষমা করবেন—মনে করবেন—পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত-আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।"

নজরুলের মনে মহান সুন্দরের তপস্যার যে জোয়ার এসেছিল, আবেগে তিনি তা বলে ফেলতেন সকলের কাছে, এ-কথা আগে বলেছি। এ-সময় যে-সকল অলৌকিক দৃশ্য তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠতো, অন্তরঙ্গদের কাছে তা-ও তিনি অকপটে প্রকাশ করতেন।

কুষ্টিয়ার জনাব শামসুদ্দীন আহমদ সাহেব নবপর্যায়ের 'নবযুগ' প্রকাশের উদ্যোগ-আয়োজন করেন ১৯৪১ সালে। পরে জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেব তা' পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সারকুলার রোডে ছিল এর অফিস। জনাব আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন এর সাথে গভীরভাবে জড়িত। প্রথমবারে প্রকাশিত নবযুগে (১৯২০) নজরুল তাঁর যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার স্মৃতি অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ভুলতে পারেননি। তাই এবারও নজরুলকে নিয়ে আসা হলো নবযুগে এক নতুন যুগ সৃষ্টি করতে। তাঁকে দেয়া হলো প্রধান

সম্পাদকের পদ। কিন্তু তখন নজরুল সুন্দরের সাধনায় মত্ত। এই সাধনা ক্রমেই গাঢ় থেকে গাঢ়তর রূপ নিয়ে চলেছে তাঁকে এক অদৃশ্যলোকের দিকে। নজরুল 'নবযুগে' এসে তাই সাধারণ লোকের মধ্যে কোনো সাড়া জাগাতে পারলেন না। তিনি বসে কথা বলতে বলতে বা লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হয়ে পড়েন। লেখায় সেই প্রাণচঞ্চলতা তাঁর আর নেই। নেই তাতে 'উর্মিলোকের' হৃদয় জাগানো হাল্‌কা উন্মাদনার সমাবেশ। এ ঐতিহ্য হারিয়ে তিনি অসীম সুন্দরের পেছনে ছুটে চলেছেন তখন।

একদিন 'নবযুগ' অফিসে বসে আছি, কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। চোখ মেললে বললাম: "কি হলো?" তিনি কুরআন-শরীফের আয়াত উদ্ধৃত করে লাল-নীল আলো, স্বর্ণবর্ণ গাভী কত কি বললেন। বুঝলাম: তাঁর মন এ পৃথিবী থেকে দূরে কোন অদৃশ্যলোকের পানে ছুটে চলেছে। মনে তাঁর বিস্মৃতি এসেছে। এসেছে বৈরাগ্য। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বুঝি তাঁর দান করবার আর কিছু নেই। আমরা বোধহয় হারিয়ে ফেললাম তাঁকে। বেদনায় ভারাক্রান্ত হলো মন।

ট্রামে এক সঙ্গেই উঠলাম। রাত তখন আটটা বেজে গেছে। তিনি শ্যামবাজারে যাবেন। আমি যাব শেয়ালদহ। বললাম: "একা যেতে পারবেন, না, সঙ্গে যাব?"

তিনি হেসে বললেন: "কেন কি হয়েছে আমার? চিরকাল তো একাই চললাম।...."

তাঁর অর্থকষ্ট দূরীকরণের জন্য নানা দিক দিয়ে নানা চেষ্টা প্রায়ই হতো। একবার নাকি প্রস্তাব হয়েছিল, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে একখানা চেয়ার দেয়া হবে। হয়তো এতে তাঁর অর্থকষ্ট কিছুটা দূর হতো। পরে কি হয়েছিল জানি না।

জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের মন্ত্রীত্বের আমলে একবার কাগজে কাগজে গভর্ণমেন্টের একখানা নোটিস বের হলো। সঙ্গীতজ্ঞ

একজন লোক চাওয়া হয়েছিল। গভর্ণমেন্ট 'সঙ-পাবলিসিটি অরগানাইজেশন' নামে একটি নতুন ডিপার্টমেন্ট খুলছেন। এই বিভাগের প্রধান কর্তারূপে যে লোকটিকে তাঁরা চেয়েছেন, আমার যত দূর মনে পড়ে তাঁর যোগ্যতার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে—দরখাস্তকারীর বাড়ি বাঙলা দেশে অবশ্য হতে হবে। বলিষ্ঠ চেহারা হবে। নিজে গান রচনা করতে আর নিজেই তাতে সুর-যোজনা করতে পারবেন। গাইতেও হবে তাঁকেই। আর দ্রুত গান লিখবার বিশেষ ক্ষমতা থাকবে। ইত্যাদি। মোটা বেতন।

বিজ্ঞাপন পড়ে আমার মনে হলো : সারা বাঙলা দেশে এই সকল গুণের অধিকারী একটি মাত্র লোক আছেন, যাঁর নাম : কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

খোঁজ নিলাম। সত্যিই তাই। নজরুলকে দেয়ার জন্যই এই নতুন পদটি সৃষ্টি করেছেন গভর্ণমেণ্ট। খুশী হলাম দরিদ্র কবির প্রতি গভর্ণমেন্টের এই দরদ দেখে। কিন্তু এই পদ কবি পাননি।

হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে ঐ পদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। তাঁকে চেঞ্জে পাঠানো হলো। পদটিতে সাময়িকভাবে অন্য লোককে বসানো হলো। নজরুল সুস্থ হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই পদে উক্ত ভদ্রলোক কাজ করবেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে এ-সময় কবির বর্তমান অবস্থার সূচনাগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ফলে ও-পদের কথা সবাই ভুলে গেলেন। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সবাই কবিকে নিয়ে, তাঁর ভবিষ্যতের স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে।....

ধ্যান-স্তিমিত হবার পর

আমার জনৈক আত্মীয় ওয়াজেদ আলী খান। ফটোগ্রাফীর ব্যাপারে কাগজ-ওয়ালাদের সাথে তাঁর খুব দহরম-মহরম। একদিন তিনি এসে বললেন : "মামা! কবির ওখানে যেতে হবে। এক ভদ্রলোক এক শত টাকা দিয়েছেন, তা' কবির কাছে পৌঁছে দিতে হবে।"

বললাম : "যান—দিয়ে আসুন।"

ঠিকানা বলে দিলাম। তিনি বললেন : "না, আপনাকে সঙ্গে যেতে হবে। আমি কাউকে চিনি না, কার হাতে দেব?"

বললাম : "বিশেষ কারণে অনেক দিন কবির ওখানে আমি যাইনি। অতএব আমি আর যেতে চাই না, আপনি-ই যান।"

তিনি কিছুতেই শুনলেন না। বাধ্য হয়ে যেতে হলো। তখন শ্যামবাজারের বাড়িতে থাকেন কবি নজরুল। নিচেই পেলাম মাসীমাকে। তিনি হাসি মুখে কার সাথে গল্প করছিলেন। আমাকে দেখে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ব্যাপার কি? এ বাড়ীতে হাসি মুখে অভ্যর্থিত হতেই আমি চিরদিন অভ্যস্থ। মাসীমাকে গম্ভীর দেখে জিজ্ঞাসা করলাম : "আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন মাসীমা?"

একটু ঝাঁঝের সাথে তিনি জওয়াব দিলেন : "রাগ করবো না, কত দিন পরে তুমি এলে বলো তো? এর ভেতরে আমাদের ওপর দিয়ে কত ঝড়-ঝাপটা গেলো, একটু খোঁজও নিলে না।

বললাম : "আপনারাও তো একটু খবর দিতে পারতেন, তা-ও তো দেননি।"

তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন: "এই বুঝি তোমার বুদ্ধি? দিন রাত্রি হৈ-হুল্লোড় দাপাদাপি। আমরা আমাদের মধ্যে ছিলাম নাকি, যে তোমাকে খবর দেবো?"

বললাম: "সে ঠিকই। তবে আপনাদের বাড়ীর সামনে এক বিরাট প্রাচীর তুলে রেখেছেন, তা' ডিঙিয়ে আমাদের মতো 'ক্ষুদ্রলোকে'র প্রবেশও তো অসাধ্য করে রেখেছেন মাসীমা!"

আমার কথায় একটা প্রচ্ছন্ন অভিমানের আঁচ পেয়ে তিনি একটু নরম হলেন বলে মনে হলো।

বললেন: "প্রাচীর মানে?"

বললাম: "প্রাচীর মানে প্রাচীরই। বিরাট বাধা সৃষ্টি করে রেখেছেন। সে বাধা এড়িয়ে কি করে আসি, বলুন তো?"

বললেন: "বাধা? তুমি আসতে বাধা? এ-কি বলছ তুমি? এখানে কি তুমি এসেছিলে? কেউ কি তোমাকে অপমান করেছে?"

বললাম: "না, মাসীমা, আমি আসিনি। আসতে সাহসই হয়নি আমার। জুলফিকার হায়দার নামে জনৈক ভদ্রলোক আনন্দ-বাজারে এক বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এই বলে যে, কবি ভয়ানক অসুস্থ। তাঁর সাথে এখন আর কারো দেখা করা চলবে না। যদি নিতান্ত কারো দেখা করার প্রয়োজন হয়, তা'হলে আমার কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে।"

মাসীমা যেন আঁৎকে উঠলেন। বললেন: সে কী! এ-বিজ্ঞাপন তাকে কে দিতে বলেছে? নুরুকে নিয়ে দেখছি বেশ ছিনিমিনি খেলা আরম্ভ হয়েছে! তুমি যাবে তার কাছে অনুমতি চাইতে?"

আমার ধারণা ছিল: উক্ত ভদ্রলোক সম্ভবতঃ এঁদেরই হুকুমে ওরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিলেন। তাই মনে অভিমান জমে ছিল। এবার সব পরিষ্কার হয়ে গেলো।

মাসীমা আমাদের ওপরে নিয়ে গেলেন। বললাম: "এক শত টাকা নিয়ে এসেছি, নিন।"

তিনি বললেন: "দুলীকে (নজরুলের স্ত্রীর ডাক নাম: দোলনা দেবী) গিয়ে দাও।"

জিজ্ঞাসা করলাম: "কবি এখন কেমন আছেন?"

মাসীমা বললেন: "এখন অনেকটা ভালো। যাও না, ও-ঘরে আছে, দেখে এসো।"

সঙ্গে গেলো কবির সেজ ছেলে কাজী সব্যসাচী ইসলাম—সানি। দীর্ঘদিন দেখিনি। বেশ বড় হয়ে উঠেছে সানি। বেশ বুদ্ধির দীপ্তি মুখে। আমাকে দেখে প্রথমে ও চিনতেই পারেনি!

পশ্চিম দিকের একটা ছোট কামরায় কবি তক্তপোশের ওপর আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন।

সানি বললে: "বাবা, দেখুন কে এসেছেন?"

কবি মাথা থেকে চাদর খুলে ফেললেন। তারপর আমার দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকালেন। মুখ-চোখ তাঁর হাসিতে ভরে গেলো। সেই আগের হাসি।

বললেন: "কে, মঈনুদ্দীন না?"

বললাম: "হাঁ, চিনতে পেরেছেন?"

এ-কথার তিনি আর কোনো জওয়াব দিলেন না। আবার চাদর-মুড়ি দিয়ে চুপ করে পড়ে রইলেন। আমি ওখানে বসেই সানির সাথে গল্প করতে লাগলাম। কথায় কথায় সানিকে জিজ্ঞাসা করলাম: "এ বাড়ীর ভাড়া কত?"

সানি বললে: "পঞ্চাশ টাকা"

আমি দুঃখ করতে লাগলাম। বললাম: "কত দিন থেকে অনর্থক এই ভাড়া গুনতে হচ্ছে। যখন অবস্থা একটু ভালোর দিকে ছিল, কিছু কিছু টাকা বেশ আসছিল, তখন তোমার বাবাকে বলেছিলাম, পার্ক সার্কাসের দিকে একটা বাড়ী কিনতে। তা' না কিনে, তিনি কিনলেন গাড়ী। এখন গাড়ীও গেল, বাড়ীও হলো না।"

কবি মুখের চাদর ফেলে দিলেন। আমার মুখের দিকে দু'-এক

সেকেণ্ড তাকালেন। তারপর আমাকে দিলেন জোরে এক ধাক্কা। বললেন: "যা', তুই বেরিয়ে যা' ঘর থেকে।"

কবি আবার চাদরে মুখ ঢেকে চুপ করে পড়ে রইলেন।

দেখলাম: খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন কবি। আমি তাঁকে আর উত্তেজিত হবার সুযোগ না দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ওরাও এসে আমার কাছে দাঁড়ালো।

সানি বললে: "এরূপ কেন হলো, বুঝতে পারলাম না তো। এর চেয়ে উন্মত্ত অবস্থা গেছে। কিন্তু উনি তো কারো সাথে এমন দুর্ব্যবহার করেন না?"

বললাম: "আমার সাথে এটা দুর্ব্যবহার নয়। এতে আমি কিছুই মনে করিনি। আমার ওপর এরূপ ব্যবহার করার ওঁর অবাধ অধিকার। তবে আমার এই ভেবে বেশ আনন্দবোধ হচ্ছে যে, কবির সম্বিৎ বোধ হয় ফিরে আসছে।"

সানি বললে: "কিসে বুঝলেন আপনি?"

আমি বললাম: "বাড়ি করেননি বলে তোমার কাছে আমি তোমার বাবার নামে অনুযোগ করছিলাম। এটা যখন উনি বুঝতে পেরেছেন, মনে হচ্ছে ওঁর সম্বিৎ ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। নইলে তোমাদের কাছে আগের অবস্থা যা' শুনলাম, তাতে তো মনে হয়েছিল, হয়তো কবি আর কোনো দিন জ্ঞান ফিরে পাবেন না।"

মাসীমাকে ও ভাবি সাহেবাকে ঘটনাটা বললাম। তাঁরা হাসতে লাগলেন।

এর কিছুদিন পর কোলকাতায় বেধে গেলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। (১৬-৮-১৯৪৬) তখন আমি থাকি মুসলমানপাড়া লেনে। কবির সাথে দেখা করতে যাওয়া এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। অথচ নানা-রকমের গুজব শুনে শুনে মন ভারাক্রান্ত। একদিন শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখার বুদ্ধি আবিষ্কার করলাম। ডাকে একখানা চিঠি দিলাম তাঁকে। লিখলাম: "ভাই, কাজী আর তাঁর পরিবার-

বর্গ আপনাদের পাড়ায় আটক। এখানে নানা রকমের গুজব এসে ধাক্কা, দিচ্ছে। তবে আমার মনে বল আছে যে, আপনি, পবিত্রদা' এঁরা ওদিকেই থাকেন। এখন ওঁরা কেমন আছেন? ওঁদের জীবনের দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের ওপর।"

কয়েক দিন পর নলিনীবাবুর চিঠি পেলাম। তিনি আশ্বস্ত করেছেন আমাকে। লিখেছেন: "চিন্তার কোনো কারণ নেই। তাঁরা খবরাখবর নিচ্ছেন। মানুষ এখন পশুত্বের শেষ সীমায় এসে দাঁড়ালেও কাজির অনিষ্ট করতে কেউ সাহসী হবে না।"

কবিকে দেখতে আর যেতে পারিনি আমি। সাম্প্রদায়িক গোলযোগ থামেনি বলে। তারপর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা-দিবসে আমি কোলকাতা ছেড়ে চলে আসি ঢাকায়।

এরপর ১৯৪৮ সালের ২৫শে এপ্রিল কোলকাতায় যেতে হয় আমাকে। এবার কবিকে একদিন দেখতে গিয়েছিলাম। (২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫ ইং ১৬-৫-১৯৪৮) কবিকে বেশ সাজিয়ে গুজিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি অনবরত জিভ থেকে থুথু নিয়ে একখানা মাসিকের পাতা উল্টাচ্ছিলেন। মাসিকখানার অবস্থা জীর্ণ হয়ে এসেছিল। কিন্তু পাতা উল্টানোর বিরাম ছিল না। আমি ঘরে ঢুকতেই কবি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিলেন। এ হাসিতে তাঁর চোখমুখ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন হেসে উঠলো। এ-হাসি আগের সেই উদ্দাম হাসি নয়। এ-হাসি নীরব, এ-হাসি শান্ত। তারপর তিনি আবার পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম: "আমাকে চিনতে পেরেছেন?"

তিনি এর কোনো জওয়াব দিলেন না। এর পর আরও কত প্রশ্ন করলাম, কোনো প্রশ্নেরই জওয়াব তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল না। কবি-পত্নী—আমার ভাবি সাহেবা (মিসেস প্রমীলা নজরুল) অর্ধাঙ্গ অবস্থায় তাঁর পাশে শুয়ে ছিলেন। তাঁর সাথে বসে বসে গল্প করতে লাগলাম।

এর মধ্যে দৈনিক ইত্তেহাদ (কোলকাতা) থেকে দু'জন লোক এল। তার মধ্যে একজন রুকনুজ্জমান খান। আমার একান্ত স্নেহভাজন। শিশু-সাহিত্যে অল্প দিনেই বেশ নাম করেছেন। সঙ্গে ক্যামেরা। ওঁরা এসেছেন কবির ফটো নিতে।

কবিকে ঠিকভাবে বসানো হল। এতে কবি কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। একটা পোজ নিয়ে আরেকটা নেওয়া হলো। নেওয়া হলো একটা গ্রূপ ফটো। এতে সানি, নিনি, ভাবি সাহেবা, আমি সবাই ছিলাম। পরে জেনেছিলাম এই ফিল্মটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফটো ওঠে নি। যাক্।

আগের বার সাক্ষাতে আমি ভেবেছিলাম বোধহয় কবির সম্বিৎ ফিরে আসছে—স্মৃতিশক্তি বোধহয় ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু এবার দেখলাম কোনো উন্নতি হয়নি তাঁর। বরং আগের বার দু' একটা কথা বলেছিলেন—রাগ করেছিলেন। এবার যেন এ শক্তিও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

একান্ত দুঃখিতচিত্তে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা পানি ঝরে পড়লো। হায়রে! একটি প্রতিভার অকাল মৃত্যু ঘটেছে আজ আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে। যে মানুষটি ছিল জীবন্ত আর প্রাণবন্ত, সৃষ্টির উল্লাসে যিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিলেন না—আজ তিনি সংসারের কল-কোলাহল থেকে ঊর্ধ্বে—বহু ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। তাঁর সে রূপ নেই, সে হাসি নেই, নেই তাঁর জীবন-জাগানো সেই চিরচঞ্চল প্রাণের উল্লাস। একটা ঝড়—একটা ভূমিকম্প—একটা সাইক্লোন যেন তাঁর দেহ ও মনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। আজ তিনি রিক্ত—সর্বহারা। একটা প্রচণ্ড আঘাত যেন তাঁকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেছে। নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে পড়েছেন তিনি। আমাদের মত তাঁর একান্ত বিশ্বাসী অনুচরও ক্ষণিকের তরে তাঁর মনে সাড়া জাগাতে পারে না!

দুর্বলের সান্ত্বনা অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্টকে স্বীকার করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এখন ঢাকায় স্থায়ীভাবে ডেরা বেঁধেছি। আবার কবে কোলকাতা আসবো, কবির সাথে আর দেখা হবে কি না কে জানে? তাই আসার সময় কবির একটা হস্তাক্ষর চাইলাম। সাদা কাগজ মেলে ধরলাম সামনে। আর হাতে কলম গুঁজে দিলাম। তিনি তাতে লিখলেন। অস্পষ্ট হস্তাক্ষর—হিজিবিজি। এলোমেলো কথা। নিচে নাম স্বাক্ষর করলেন।

আমরা এর পাঠোদ্ধার করেছি এরূপ ভাবে ঃ

কবি নজরুল ইসলাম কবে চির—
বুলবুলকে গান গান শেখাব—গান শেখাব
গান করাব কবিতা গান করব—
কবি কাজী নজরুল ইসলাম চিরদিন

এই ঘটনার পর আর আমার কবির সাথে দেখা হয়নি।....

নজরুলের চিকিৎসা

বাঙলা-সাহিত্যে নতুন যুগের স্রষ্টা কবি নজরুল ইসলাম আজ জটিল রোগে আক্রান্ত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা এই জটিলতা দূর করতে গিয়ে পরাজয় স্বীকার করেছেন। সমগ্র দেশ কামনা করেছিল ঃ আবার কবি নিরাময় হয়ে উঠবেন, আবার তাঁর জাগর-সংগীতে সারা দেশকে মাতিয়ে তুলবেন, নাচিয়ে তুলবেন।

এ জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। মাইকেল, রজনীকান্ত, গোবিন্দদাস, লুৎফর রহমান, শিরাজী, ইসলামাবাদী প্রমুখ পূর্ববর্তী কবি-সাহিত্যিকদের শোচনীয় মৃত্যুতে বাংলার ইতিহাসে যে কলংকময় অধ্যায় লেখা হয়েছে, তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে বোধ হয় বাঙালী সচেতন হয়ে উঠেছিল। নজরুলকে তাই তাঁরা বিদেশী-বিশেষজ্ঞদের কাছে শেষ চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছিলেন।

প্রথমে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে এবং ডাঃ আবুল আহসানের প্রত্যক্ষ চিকিৎসাধীনে কবিকে বহুদিন রাখা হয়েছিল। তারপর তাঁকে লুম্বিনী পার্কে রাখা হয়। মানসিক ব্যাধি বিশেষজ্ঞ ডাঃ মোহাম্মদ হোসেনও পরীক্ষা করেছিলেন কবিকে। তারপর তাঁকে পাঠানো হয়েছিল মানসিক হাসপাতালে—রাঁচীতে। কিন্তু এখানেও কোনো ফল না হওয়ায় লণ্ডনে পাঠাবার পরিকল্পনা হয়।

সমগ্র জাতি যেন সেদিন পণ করেছিল, যে-কোনো মূল্যে নজরুলকে রোগমুক্ত করে তুলতেই হবে। তাই এ ব্যাপারে পূর্ব ও পশ্চিম-বাঙলা

এক সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল। ১৯৫২ সালের ২৭শে জুন তারিখে কোলকাতার সাহিত্যিকেরা মিলে 'নজরুল নিরাময়' সমিতি গঠন করেন। আর তার সম্পাদক নির্বাচিত হন কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব। ঢাকায় একটি 'পূর্ব-পাকিস্তান নজরুল সমিতি' গঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ সাহেব। উভয় বাঙলার জনসাধারণের চেষ্টায় যে টাকা সংগৃহীত হয়েছিল, তা দিয়েই নজরুলকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। পশ্চিম-পাকিস্তানে জনাব মীজানুর রহমান সাহেবের চেষ্টায় 'নজরুল একাডেমী' গঠিত হয়। ওখান থেকেও সাহায্য পাঠানো হয়—ছ' হাজার টাকা।

১৯৫৩ সালের ১০ই মে তারিখে নজরুল লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর সহগামী হন তাঁর রুগ্না স্ত্রী প্রমীলা নজরুল, কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম, রবীউদ্দিন আহমদ ও একজন শিক্ষিতা নার্স।

বন্ধু রবীউদ্দিন আহমদ রোম (ইটালী) থেকে আমাকে নজরুলের চিকিৎসা সম্বন্ধে ২৯-৩-১৯৫৪ তারিখে একখানা পত্র লেখেন। কিন্তু তা' ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। কবি-বন্ধু আবদুল কাদিরকে তিনি একখানা বিস্তৃত পত্র লেখেন ৯-৪-১৯৫৪ তারিখে। এখানে আমি শেষোক্ত পত্রখানারই কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। এতে নজরুলের বিদেশে চিকিৎসা-ব্যাপারের পরিষ্কার একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। রবীউদ্দিন লিখেছেন: "দুই দিন বম্বে থাকিয়া ১৪ই মে বেলা ১১টায় সিন্ধিয়া কোম্পানির "জল-আজাদ" জাহাজ যোগে কবি লণ্ডন অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।—২৫শে মে কবির জন্মবার্ষিকী জাহাজে পালন করিবার জন্য অধিকাংশ বাঙালী ও কিছু অবাঙালী ভারতীয় এক-সপ্তাহ পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে ছিলেন। ২৫শে মে জাহাজ লোহিত-সমুদ্রের উপর দিয়া চলিতে ছিল। প্রথম শ্রেণীর লাউঞ্জে এই অনুষ্ঠান পালনের আয়োজন করা হয়।—অনুষ্ঠান শেষে জাহাজের Captain কবিকে একটি সুন্দর সুভেনির উপহার দিয়াছিলেন।

...London হইতে বেশ কিছু দূরে সারের মিচাম ষ্টেশনের

নিকট ৭৭ নং মর্ডেন রোডে কবির থাকিবার জন্ত বাড়ী ঠিক হইয়াছিল। ৮ই জুন বিকাল ৪টায় কবিকে নিয়া আমরা এই বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।

রাঁচী মানসিক হাসপাতালের Superintendent, Major Davis, London St. Thomas হাসপাতালের মানসিক চিকিৎসক Dr. William Sargent-কে একটি পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন আমার সঙ্গে। জনাব হুমায়ুন কবীর সাহেব লণ্ডনের ভারতীয় দূতাবাসের ডাঃ কর্নেল প্যাসরিচাকে কবির চিকিৎসায় যাবতীয় সাহায্য দিবার জন্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন। নানান আলোচনার পর একটি মেডিক্যাল-বোর্ড তৈরী করাই অধিক কার্যকরী বলিয়া মনে হইল।....২০শে জুন ডাঃ সার্জেণ্ট কবিকে প্রায় দুই ঘণ্টা পরীক্ষা করিলেন।....প্রাথমিক Medical report-এ বলিলেন যে কবির সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া আশাতীত। তবে Major Davis-এর report-এর সঙ্গেও তিনি একমত হইতে পারিতেছেন না। (এরপর বোর্ডের অপর দু'জন ডাক্তার—ই. এ. বেটন ও সার রাসেল ব্রেন পরীক্ষা করে report দেন। এঁরা একমত হতে পারেননি।) তাঁহারা আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, কোনো প্রকার চিকিৎসা-প্রয়োগের পূর্বে কবির মস্তিষ্কের অবস্থা Air encephalogram (একপ্রকারের পরীক্ষা পদ্ধতি, যাহাতে রোগীর শিরদাঁড়া ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্য দিয়া প্রয়োজন মতো বায়ু মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া তাহার পর মস্তিষ্কের X-Ray গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষার সময় 45 c. c. পরিমাণ বায়ু কবির মস্তিষ্কে প্রবেশ করানো হইয়াছিল।) করিয়া অবশ্য দেখিতে হইবে। (২৭শে জুলাই এঁরা London Clinic-এর operation theatre-এ নিয়ে যাবার সময় দেখতে পান কবির চক্ষু সজল আর অসহায় ব্যক্তির মতো তিনি নীরবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন।)...

X-Ray reports দেখিয়া স্তার রাসেল ব্রেন একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন: কবির মস্তিষ্কের cells যেভাবে নষ্ট

হইয়াছে; তাহা আরোগ্যের অতীত। (এরপর তাঁরা অধুনা London-এর বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক ডাঃ উইলি ম্যাকফিসক্ সহ এক কনফারেন্সে মিলিত হন।)....তাঁহারা বলিলেন, "ম্যাকফিসক্ অপারেশন" নামক অস্ত্রোপচার দ্বারা কবির মস্তিষ্কের সম্মুখভাগে অবস্থিত ফ্রন্টো থ্যালামিক ট্রাকট নামক স্নায়ুপথ যদি মস্তিষ্কের অপরাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তবে কবি অনেকটা আরোগ্যলাভ করিতে পারেন।

....ডাঃ রাসেল ব্রেন এই মত সমর্থন করিলেন না। এ অবস্থায় তিনি কোনো প্রকার চিকিৎসাই বিধেয় বলিয়া মনে করিলেন না। (দ্বিধায় পড়ে এঁরা বিভিন্ন নজরুল-সমিতির মতামত নিয়ে সুইজারল্যাণ্ড ও জার্মানীর বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ করেন। তাঁরা মত প্রকাশ করেন, অস্ত্রোপচারে কবির আরো ক্ষতি হতে পারে।) ভিয়েনার স্নায়ু-বিদ্যাবিদ্ ডাঃ হানস হফ বলিলেন: আমি নিজে একবার কবিকে পরীক্ষা করতে চাই। কারণ সমস্ত report-এর মধ্যে কবি যে কী ব্যাধিতে ভুগিতেছেন, তাহা নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। তবে X-Ray reports হইতে পরিষ্কার যে অস্ত্রোপচার তাঁহার পক্ষে রীতিমত ক্ষতির কারণ হইবে। এই রিপোর্টের পর সকলেই কবিকে ভিয়েনায় নিয়ে শেষ চেষ্টার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন।....

(....৭ই ডিসেম্বর কবিকে ভিয়েনায় নিয়ে যাওয়া হয়।)...৯ই ডিসেম্বর কবির উপর সেরিব্রাল অ্যাঞ্জিওগ্রাফী পরীক্ষা করা হয়। (ইহা এক প্রকারের পরীক্ষা, যাহাতে রোগীকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করিয়া গণ্ডদেশ ছিদ্র করিয়া মস্তিষ্কের মধ্যে রক্ত-সঞ্চারণ করিয়া মস্তিষ্কের X-Ray ছবি গ্রহণ করা হয়।) এই পরীক্ষার ফল দেখিয়া ডাঃ হফ বলিলেন যে কবি পিক্স্-ডিজিস নামক মস্তিষ্করোগে ভুগিতেছেন। এই ব্যাধিতে মস্তিষ্কের সম্মুখ ও পার্শ্ববর্তী অংশগুলি সংকুচিত হইয়া যায়। এ-ক্ষেত্রে কবির ব্যাধি এত পুরাতন হইয়া গেছে যে, আরোগ্যের আশা অল্প। তিনি একটি চিকিৎসার ব্যবস্থালিপি লিখিয়া

দিলেন। তাহাতে কিছুটা উপকার হইতেও পারে এবং উহা কলিকাতাতেও পরীক্ষা করা যাইতে পারিবে।"

এরপর কবি ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৩ সোমবার কোলকাতায় ফিরে আসেন।

লণ্ডন ও ভিয়েনার বিশেষজ্ঞগণ নানাভাবে কবিকে পরীক্ষা করেছেন, কিন্তু তাঁরা কবির প্রকৃত রোগ নির্ণয় করেননি। তবে ডাঃ হফ "পিক্স্ ডিজিস" নামে একটা রোগের কথা বলেছেন। তিনিও কবির রোগ-মুক্তির আশা দিতে পারেননি।

ঘটনা পরম্পরা আলোচনা করলে স্বতঃই আমাদের মনে হয় সত্যই কি কবি কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন, না এ তাঁর ধ্যান-স্তিমিত ভাব?

নজরুল গ্রন্থ-পরিচয়

[বর্ণানুক্রমিক]

১। অগ্নি-বীণা

এতে আছে: প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বরধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু, কামাল পাশা, আনোয়ার, রণভেরী, শাত্-ইল-আরব, খেয়া পারের তরণী, কোরবানী, মোহর্‌রম।

'অগ্নি-বীণা' অগ্নিগর্ভ কবিতার বই। এর প্রত্যেকটি কবিতা যেন আগুনের লেলিহান শিখা। পাঠকের মনে আগুন ধরিয়ে দেবার যোগ্যতা অগ্নি-বীণার প্রত্যেকটি পাতায় দেদীপ্যমান।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ হেল্‌মুথ ফন গ্লাসেনপ এ-বই সম্বন্ধে লিখেছেন: "The Poems deserve with full right the name the author has given them ; they are full of emotion like fire and sweet like the tune of Vina."

প্রথম প্রকাশ: ১৩২৯ সাল।

২। আলেয়া

গীতি-নাট্য। প্রথমে বইখানার নাম দেওয়া হয়েছিল—মরুতৃষা। পরে এর 'আলেয়া' নামকরণ করা হয়। হিন্দু-পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে এর গল্পাংশ নেওয়া হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ: ১৩৩৮ সাল।

৩। কাব্যে আমপারা

মহাগ্রন্থ কুরআন শরীফের শেষ পারার কাব্যানুবাদ। এর ভূমিকায় কবি বলেছেন: "ইসলাম ধর্মের মূল মন্ত্র—পুঁজি, ধনরত্ন,

মণি-মাণিক্য সব কিছু কোরআন মজীদের মণি-মঞ্জুষায় ভরা, তাও আবার আরবী ভাষার চাবি দেওয়া। আমরা—বাঙালী মুসলমানেরা—তা নিয়ে অন্ধ-ভক্তিভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষায় যে কোন্ মণিরত্নে ভরা তার শুধু আভাসটুকু জানি। আজ যদি আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই কোরআন মজীদ, হাদীস, ফেকা প্রভৃতির বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন, তা' হলে বাঙালী মুসলমানের তথা বিশ্বমুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন।"

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সাল। ইং ১৯৩৩।

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৫৪ সাল। তৃতীয় মুদ্রণ (সুন্দর শোভন সংস্করণ) ১৯৫৬।

৪। কুহেলিকা

উপন্যাস। এর নায়ক জাহাঙ্গীর বিপ্লবী তরুণ। দেশের মুক্তি-সংগ্রামে একজন অগ্রগামী সৈনিক। এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে কবি যেন সমগ্র মুসলিম তরুণকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। এই উপন্যাসটি প্রথমে মাসিক "নওরোজে" কয়েক পরিচ্ছেদ এবং পরে সাপ্তাহিক "সওগাতে" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তকে রূপান্তরিত হয়।

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৩১ সাল।

৫। গানের মালা

কতকগুলি গানের সমষ্টি।

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৩৪ সাল।

৬। গীতি-শতদল

এতে আছে কবির একশ'টি গান। গানগুলি মেগাফোন ও গ্রামোফোন কোং রেকর্ড করেছেন।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৪১ সাল।

৭। গুল-বাগিচা

কবির বিভিন্ন ঢং-এ লেখা অষ্টাশীটি গানের সমষ্টি এর প্রায় গানই মেগাফোন কোং-তে রেকর্ড হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ : ১৩৪০ সাল।

৮। চক্রবাক

এতে আছে : ওগো চক্রবাকী, তোমারে পড়িছে মনে, বাদল রাতের পাখী, স্তব্ধরাতে, বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি, কর্ণফুলী, শীতের সিন্ধু, পথচারী, মিলন-মোহানায়, গানের আড়ালে, ভীরু, এ মোর অহঙ্কার, তুমি মোরে ভুলিয়াছ, হিংসাতুর, বর্ষা-বিদায়, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে, অপরাধ শুধু মনে থাকে, আড়াল, নদী-পারের মেয়ে, ১৪০০ সাল, চক্রবাক, কুহেলিকা।

কবিতার বই। প্রথম প্রকাশ : ১৩৩৬ সাল।

৯। চন্দ্রবিন্দু

গানের সমষ্টি। এতে আছে মোট একষট্টিটি গান। তার ভেতরে ১৮টি কমিক গান। সব গানগুলোতেই তরুণ মনে আগুন ধরিয়ে দেবার গুণ আছে। কমিক গানগুলি যাঁদের উদ্দেশে লেখা, তাঁরা এর রস উপভোগ করতে না পেরে বইখানা বাজেয়াফ্‌ত করে কবির লেখার আসুরিক মর্যাদা দিয়েছিলেন।

প্রথম প্রকাশের তারিখ পাওয়া যায়নি। রাজরোষ মুক্ত হলে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে ১৩৫২ সালের ফাল্গুন মাসে।

১০। চিত্তনামা

এতে আছে : অর্ঘ্য, অকাল সন্ধ্যা, সান্ত্বনা, ইন্দ্রপতন, রাজ ভিখারী।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুতে কবির যে সকল কবিতা ও গান বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, 'চিত্তনামা' সেই সকল গান ও কবিতার সমষ্টি।

প্রথম প্রকাশ : ১৩৩২ সালের (খুব সম্ভব) শ্রাবণ মাসে।

১১। চোখের চাতক

এতে আছে : গজল গান, ভাটিয়ালী প্রভৃতি বিভিন্ন ঢং-এর একান্নটি গান। এর অনেকগুলি গান সাধারণ্যে বহুল প্রচারিত।

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ সাল।

১২। ছায়ানট

এতে আছে : বিজয়িনী, কমল-কাঁটা, চৈতী হাওয়া, বেদনা অভিমান, নিশীথ প্রীতম্‌, অবেলায়, হার মানা হার, লক্ষ্মীছাড়া, শেষের গান, নিরুদ্দেশের যাত্রী, চিরন্তনী প্রিয়া, বেদনা-মণি, পরশ পূজা, অনাদৃতা, শায়ক-বেঁধা পাখী, হারামণি, নীল পরী, স্নেহভীতু, পলাতকা, চিরশিশু, মানস-বধূ, দহন মালা, বিদায়-বেলায়, অকরুণ পিয়া, ব্যথা নিশীথ, সন্ধ্যাতারা, দূরের বন্ধু, আশা, মরমী, মুক্তিবার, আপন-পিয়াসী, বিবাগিনী, প্রতিবেশিনী, নূপুর-অভিসার, ছল্‌-কুমারী, পাপড়ি খোলা, বিধুরা পথিক-প্রিয়া, মনের মানুষ, প্রিয়ার রূপ, বাদল-দিনে, কার বাঁশী বাজিল, অকেজোর গান, স্তব্ধ বাদল, চাঁদ মুকুর, চিরচেনা, পাহাড়ী গান, অমর কানন, পূবের হাওয়া, (ঝড়—পূর্ব তরঙ্গ), আল্‌তা স্মৃতি, রৌদ্রদগ্ধের গান।

প্রথম প্রকাশ : ১৩৩১ সাল।

১৩। জিঞ্জীর

এতে আছে : বার্ষিক সওগাত, অঘ্রানেব সওগাত, মিসেস এম. রহমান, নকীব, খালেদ, সুব্‌হ উম্মিদ, খোশ আমদেদ, নওরোজ, ভীরু, অগ্রপথিক, ঈদ মোবারক, আয় বেহেশ্‌তে কে যাবি আয়, চিরঞ্জীব জগলুল, আমানুল্লাহ, উমর ফারুক, এ মোর অহঙ্কার।

ইসলামী ভাবধারায় পরিপূর্ণ কবিতা সমষ্টি। এর প্রতি কবিতাই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথম প্রকাশ : ১৩৩৫ সাল।

১৪। **জুল্‌ফিকার**

ইসলামী গানের সমষ্টি। মৃতপ্রায় মুসলিম জাতির দুর্দশায় ব্যথিত কবি যেন তাদের হাত ধরে টেনে তুলতে চেয়েছেন। বিভিন্ন দেশের মুসলিম জাগরণ লক্ষ্য করে নজরুল এ দেশের মুসলমানকে ডেকে বলেছেন : "ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে, তুইও তোর প্রাণের প্রদীপ জ্বাল্‌।"

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৩৯ সাল। দ্বিতীয় মুদ্রণ : পৌষ, ১৩৫৯।

১৫। **ঝিঙে ফুল**

এতে আছে : ঝিঙে ফুল, খুকী ও কাঠ বিড়ালী, খোকার খুশী, খাঁদু দাদু, দিদির বে'তে খোকা, মা, খোকার বুদ্ধি, খোকার গল্প বলা, চিঠি, প্রভাতী, লিচুচোর, হোঁদল কুঁৎকুঁতের বিজ্ঞাপন, ঠ্যাংফুলী, পিলে পট্‌কা।

'ঝিঙে ফুল' কবি নজরুলের ছোটদের জন্য লেখা কয়েকটি কবিতার সমষ্টি। শিশু-সাহিত্যে নজরুলের এক বিরাট অবদান। শিশু-মনকে আকর্ষণ করার যোগ্যতা এর প্রত্যেকটি কবিতায় আছে।

প্রথম প্রকাশ....?

১৬। **ঝিলিমিলি**

নাটিকা। এতে আছে : ঝিলিমিলি, সেতুবন্ধ, শিল্পী, ভূতের ভয় —এই চারটি একাংকিকা।

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৩০ সাল।

১৭। **দুর্দিনের যাত্রী**

এতে আছে : আমরা লক্ষ্মী-ছাড়ার দল, তুবড়ী বাঁশীর ডাক, মোরা সবাই স্বাধীন সবাই রাজা, স্বাগত, ম্যায় ভূখা হুঁ, পথিক! তুমি পথ হারাইয়াছ? আমি সৈনিক।

বইখানা কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলি 'ধূমকেতু'তে

বেরিয়েছিল। মৃতপ্রায় জাতিকে ঘা মেরে জাগাবার আহ্বান এ-বইয়ের প্রতি পাতায়, প্রতি ছত্রে। তিনি বলেছেন : "বল, কারুর অধীনতা মানিনা স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না। যে অপমান করে, তার চেয়ে কাপুরুষ হীন সে-ই, যে অপমান সয়। তোমার আত্মশক্তি যদি উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে, তবে বিশ্বে এত বড় দানব-শক্তি নেই, যা তোমাকে পায়ের তলায় ফেলে রাখে।"

প্রথম প্রকাশ : ১৩৩৩ (?)

১৮। দোলনচাঁপা

এতে আছে : দোদুলদুল, বেলাশেষে পউষ, পথহারা, ব্যথা-গরব, উপেক্ষিত, সমর্পণ, পূবের চাতক, অবেলার ডাক, চপল-সাথী, পূজারিণী, আশান্বিতা, অভিশাপ, পিছু-ডাক, মুখরা, সাধের ভিখারিণী, কবি-রাণী, আশা, শেষ প্রার্থনা।

দোলনচাঁপা কবিতার বই।

এর তৃতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে ১৩৬১ সালের শ্রাবণ মাসে। এতে অনেক কবিতা বাদ দিয়ে অনেক নতুন কবিতা যোগ করা হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৩০ সাল।

১৯। নজরুল-গীতিকা

গানের সমষ্টি। জাতীয় সংগীত, ঠুংরি, হাসির গান, গজল, ধ্রুপদ, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, টপ্পা, খেয়াল প্রভৃতি কবির বিভিন্ন ঢং-এর বহু গান এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর অধিকাংশ গান-ই খুব জনপ্রিয়।

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র, ১৩৩৭ সাল।

২০। নজরুল স্বরলিপি

এতে নজরুলের বিভিন্ন ঢং-এর তিরিশখানা গানের স্বরলিপি দেয়া হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৩৮ সাল।

২১। নির্ঝর

কবিতার বই। এতে আছে : অভিমানিনী, বাঁশীর ব্যথা, আশায়, সুন্দরী, মুক্তি, চিঠি, আরবী ছন্দের কবিতা, প্রিয়ার দেওয়া শারাব, মানিনী বধূর প্রতি, গান, গরিবের ব্যথা, তুমি কি গিয়াছ ভুলে, হবে জয়, পূজা অভিনব, চাষার গান, জীবনে যাহারা বাঁচিল না, দীওয়ান-ই-হাফিজ (৮টি রুবাইয়াৎ), নমস্কার।

এ-বইখানা ছাপার পর আর বিক্রয়ার্থে বাজারে বের হয়নি। কবি আবদুল কাদির সাহেব, কোলকাতার ফুটপাথের দোকানদারদের কাছ থেকে একখানা বই সংগ্রহ করেছেন।

২২। নূতন চাঁদ

এতে আছে : নূতন চাঁদ, চিরজনমের প্রিয়া, আমার কবিতা তুমি, নিরুক্ত, সে যে আমি, অভেদম, অভয়-সুন্দর, অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি, কিশোর রবি, কেন জাগাইলি তোরা, দুর্বার যৌবন, আর কতদিন, ওঠরে চাষী, মোবারক বাদ, কৃষকের ঈদ, শিখা, আজাদ।

(দ্বিতীয় মুদ্রণকালে দুইটি অতিরিক্ত কবিতা সংযোজিত হয়েছে। যথা : ঈদের চাঁদ ও চাঁদনী রাতে।)

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৫১ সাল।

২৩। পুতুলের বিয়ে

এতে আছে : পুতুলের বিয়ে, কালো জামাইয়ের ভাই, জুজু বুড়ীর ভয়, কে কি হবি বল, ছিনিমিনি খেলা, কানা মাছি, নবার নামতা পাঠ, সাত ভাই চম্পা, শিশু-যাদুকর।

এর প্রথমটি ছোট মেয়েদের উপযোগী নাটক। বাদবাকী ছোটদের উপযোগী হাস্য-রসাত্মক এবং উপদেশমূলক কবিতা।

প্রথম প্রকাশ : .... ?

২৪। পুবের হাওয়া

এতে আছে : মরমী, স্মরণে, অবসর, নিকটে, মানিনী, আশা,

বেদনা-মাণিক, বেদনহারা, নিরুদ্দেশের যাত্রী, পথিক-শিশু, স্নেহ-ঋণী, হোলী, বে-শরম, সোহাগ, শরাবন তহুরা, দুপুর-অভিসার, দহন-মালা, পথিক-বধূ, স্নেহ-পরশ, বাঁশী বাজিল, গৃহ-হারা, অনাদৃতা, স্নেহাতুর, বিরহ-বিধুরা, নিশীথ-প্রীতম, রেশমী ডোর, দূরের পথিক, প্রণয় নিবেদন, ফুল-কুঁড়ি, পুলক, প্রণয়-ছল, বরষায়, বিদায়-বাঁশী, শেষের ডাক, অভিমানিনী, শেষের প্রীতম, বিজয়িনী।

'পূবের হাওয়া' কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। কবির বিরহবিধুর মনের আলেখ্য। বিদ্রোহী কবির অন্তরের প্রেমের ফল্গুধারা।

প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন, ১৩৩২ সাল। দ্বিতীয় মুদ্রণ: ১৯৫৪ সাল।

২৫। প্রলয়শিখা

কবিতার বই। রাজরোষে বাজেয়াফ্‌ত হয়েছিল। এর দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়েছে, ১৩৫২ সালে।

২৬। ফণি-মনসা

এতে আছে: প্রবর্তকের ঘুর চাকায়, যা শত্রু পরে পরে, মুক্তিকাম, রক্ত-পতাকার গান, শ্রমিক মজুর, জাগরতূর্য, অশ্বিনীকুমার, দিলদরদী, ইন্দুপ্রয়াণ, সাবধানী ঘণ্টা, বাঙলায় মহাত্মা, সত্যেন্দ্র প্রয়াণ, হেমপ্রভা, ক্ষুধিত ব্যাঘ্র, বিবাগিনী, আশীর্বাদ, দেশবন্ধু, দে দোল দে দোল, সুকুমার, যুগের আলো।

কবিতা সমষ্টি। এর অধিকাংশ কবিতা সাময়িক ঘটনা বা ব্যক্তি-বিশেষকে নিয়ে লেখা। কবির স্বভাবসুলভ জাগর-গীতি এর প্রতি পাতায়, প্রতি ছত্রে। কবির অন্তরের সারল্য এ-বইয়ে ফুটে উঠেছে সহজভাবে।

প্রথম সংস্করণের সাথে দ্বিতীয় সংস্করণের মিল নেই। অনেক কবিতা রদবদল করা হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ: শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল।

২৭। বন-গীতি

গানের সমষ্টি। কবির হৃদয়াবেগ এর অধিকাংশ গানে পরিস্ফুট। তাঁর প্রেমানুভূতি, রূপ আর রস প্রতি গানে ঝলমল করছে। কয়েকটি অন্যভাবের গানও এতে আছে।

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৩৯ সাল।

২৮। বিষের বাঁশী

এতে আছে : ফাতিহা-ই-দোয়াজদহম (আবির্ভাব ও তিরোভাব), সেবক, জাগৃহি তূর্য-নিনাদ, বোধন, উদ্বোধন, অভয়মন্ত্র, আত্মশক্তি, মরণ-বরণ, বন্দীবন্দনা, বন্দনা গান, মুক্তি সেবকের গান, শিকল-পরার গান, মুক্তবন্দী, যুগান্তরের গান, চরকার গান, জাতের নামে বজ্জাতি, সত্যমন্ত্র, বিজয় গান, পাগল পথিক, ভূত ভাগানোর গান, বিদ্রোহীর বাণী, অভিশাপ, মুক্ত-পিঞ্জর, ঝড় (পশ্চিম তরঙ্গ)।

বইখানা বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত কতকগুলি উদ্দীপনাময়ী কবিতার ও গানের সমষ্টি। এ-বইখানা 'অগ্নিবীণা'র দ্বিতীয় খণ্ড নামে প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু পরে এ-বইয়ের নামকরণ করা হয়—বিষের বাঁশী। পরাধীনতার গ্লানিতে সারা দেশ যখন মুহ্যমান, তখন এ-বইয়ের কবিতা ও গানগুলি মানুষের মনে অপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। আর রাজরোষে পড়ে তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট কতৃক বাজেয়াফ্‌ত হয়েছিল।

প্রথম প্রকাশ : ১৩৩১ সাল।

২৯। বুলবুল

কবির বহু বিখ্যাত গানের বই। যে গজল-গান বাঙলায় আমদানী করে নজরুল এ-দেশে নূতন সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করেন, তার অধিকাংশ গান-ই এ-বইয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৩৫ সাল।

(১৩৫৯ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই শ্রেণীর আরও অনেকগুলি গান গ্রন্থিত করে 'বুলবুল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।)

৩০। বাঁধনহারা

পত্রোপন্যাস। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার ১৩২৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা (প্রথম বর্ষ—প্রথম সংখ্যা) থেকে 'বাঁধন হারা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে। এতে কবি তাঁর ব্যথাদীর্ণ ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ভবিষ্যৎ 'বিদ্রোহী' কবির জন্ম এই ব্যর্থতা থেকেই হয়েছিল কি না, কাল তার বিচার করবে।

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল।

৩১। ব্যথার দান

এতে আছে : ব্যথার দান, হেনা, বাদল বরিষণে, ঘুমের ঘোরে, অতৃপ্ত কামনা, রাজবন্দীর চিঠি।

'ব্যথার দান' পত্রের আকারে লেখা কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। ১৩২৬ সালের কার্তিক সংখ্যা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'হেনা' এবং পৌষ সংখ্যায় 'ব্যথার দান' গল্পটি প্রকাশিত হয়। পরে উহা বাদবাকী গল্পগুলি দিয়ে পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়।

এর ভাষার উদ্দামতা আর কবিত্বময় বর্ণনা পাঠকমনে এক নব আলোড়নের সৃষ্টি করে। এক কথায় একে গদ্যকাব্য বলা যেতে পারে।

প্রথম প্রকাশ : ১৩২৯ সাল।

৩২। ভাঙার গান

এতে আছে : ভাঙার গান, জাগরণী, মিলন গান, পূর্ণ অভিনন্দন, ঝোড়ো গান, মোহান্তের মোহ অন্তের গান, আশু-প্রয়াণ গীতি, দুঃশাসনের রক্তপান, ল্যাবেণ্ডিস বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত, সুপার বন্দনা, শহিদী ঈদ।

এ একখানা উদ্দীপনাময়ী গানের বই। হুগলী জেলের সুপারিন্-টেন্‌ডেন্ট মিঃ থার্সটনকে উদ্দেশ্য করে কবি যে 'সুপার-বন্দনা'

লিখেছিলেন, এ বইয়ে সে গানটিও স্থান পেয়েছে। বইখানা তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াফ্‌ত করেছিলেন।

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল।

৩৩। মক্তব-সাহিত্য

কোনো প্রকাশক-বন্ধুর অনুরোধে কবি এই বইখানা লেখেন। "মহামান্য ডিরেকটর বাহাদুর" কর্তৃক বঙ্গদেশের মক্তব ও মাদরাসা সমূহের প্রথম শ্রেণীর জন্য অনুমোদিত হয়। (কলিকাতা গেজেট : ২৪-৯-১৯৩৬)

একে সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্য-পুস্তকের স্তরে নিয়ে যেতে হয়, এ জন্য বইখানার মোট একুশটি রচনার মধ্যে পাঁচটি অন্য লেখকের রচনা সংগ্রহ করে গ্রথিত করা হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৬ সাল।

৩৪। মরু-ভাস্কর

হজরত মুহাম্মদের জীবনী নিয়ে লেখা একটি কাব্য। এ বই নজরুল ইসলাম প্রথমে লেখা আরম্ভ করেন সওগাতে। (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭)। কিন্তু দীর্ঘ দিনেও এটা তিনি শেষ করতে পারেন নি। কবির ধ্যান-স্তিমিত হওয়ার পর মরু-ভাস্কর অসম্পূর্ণ অবস্থায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৭ সাল।

৩৫। মৃত্যুক্ষুধা

উপন্যাস। ইহা প্রথমে 'মাসিক সওগাতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে পুস্তকে রূপান্তরিত হয়। কবি কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে সেখানকার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বইখানা লেখেন। উপন্যাস-প্লাবিত বাঙলা-সাহিত্যে সে যুগে এ বইখানা বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

প্রথম প্রকাশ : ১৯২৭ সাল।

৩৬। যুগবাণী

এতে আছে : নবযুগ, গেছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ', ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ, ধর্মঘট, লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য, মুহাজেরীন হত্যার জন্য দায়ী কে, বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান, ছুঁৎমার্গ, উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন, মুখবন্ধ, রোজ-কেয়ামত বা প্রলয় দিন, বাঙালীর ব্যবসাদারী, আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন, কালা আদমীকে গুলি মারি, শ্যাম রাখি না কূল রাখি, লাট-প্রেমিক আলী ইমাম, ভাব ও কাজ, সত্যশিক্ষা, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাগরণী।

'নবযুগে' কবির যে সকল প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, এগুলো তারই সমষ্টি। এর জ্বালাময়ী ভাষার জন্য তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট বইটি বাজেয়াফ্‌ত করেন।

প্রথম প্রকাশ....? দ্বিতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল।

৩৭। রাজবন্দীর জবানবন্দী

ছোট পুস্তিকা। কবি জেলে যাওয়ার পূর্বদিন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহোর কোর্টে দাখিলের জন্য এটা তিনি জেল হাজতে বসে (৭-১-১৯২৩) লেখেন। পরে ছোট পুস্তিকা আকারে বের হয়।

৩৮। রিক্তের বেদন

এতে আছে : রিক্তের বেদন, বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী, মেহের নেগার, সাঁঝের বাতি, রাক্ষুসী, সালেক, স্বামীহারা, দুরন্ত পথিক।

প্রথম প্রকাশ : ১৯৩১ সাল।

৩৯। রুদ্রমঙ্গল

এতে আছে : রুদ্রমঙ্গল, আমার পথ, মোহর্‌রম, বিষ-বাণী, ক্ষুদিরামের মা, ধূমকেতুর পথ, মন্দির ও মসজিদ।

কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। এ প্রবন্ধগুলো ধূমকেতুতে বেরিয়েছিল। তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট বইটি বাজেয়াফ্‌ত করেন।

প্রথম প্রকাশ : ১৯২৫ সাল।

৪০। রুবাইয়্যাৎ-ই-হাফিজ

এতে আছে : পারস্যের অমর কবি হাফিজের মূল ফার্সী থেকে তিয়াত্তরটি রুবাইয়্যাৎ-এর অনুবাদ। বাকী দুটোর অনুবাদও কবি গোড়ার দিকে ভূমিকায় দিয়েছেন।

প্রথম প্রকাশ : ১লা আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল।

৪১। রুবাইয়্যাৎ-ই-ওমর খৈয়াম

অমর কবি ওমর খৈয়ামের মূল ফার্সী থেকে নেওয়া মোট ১৯৮টি রুবাইয়্যাৎ-এর অনুবাদ এতে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজী বা অন্য কোনো ভাষায় খৈয়ামের এত অধিক রুবাইয়্যাৎ অনূদিত হয়নি। নজরুল-অনুবাদের একটি নমুনা :

শুক্রবার আজ বলে সবাই পবিত্র নাম জুম্মাবার,
হাত যেন ভাই খালি না যায়, শারাব চলুক আজ দেদার!
এক পিয়ালি শারাব যদি পান কর ভাই অন্যদিন,
দু'পেয়ালী পান কর আজ বারের বাদ্‌শা জুম্মাবার।

অত্যন্ত সুরুচিসম্মত আর চিত্র-সম্পদে গরীয়ান করে, এটা ছাপছেন : জোহরা খানম, কোলকাতা।

৪২। শিউলী-মালা

ছোট গল্পের সমষ্টি। এতে আছে : পদ্মগোখ্‌রো, জিনের বাদশাহ্‌, অগ্নি-গিরি, শিউলী-মালা।

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৩১ সাল।

৪৩। সঞ্চিতা

নজরুলের বাছাই করা কতকগুলি কবিতা দিয়ে 'সঞ্চিতা' প্রকাশ করা হয়। তাঁর কবিতা এত দূর জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, মাত্র কয়েক দিনের আগে পিছে প্রতিযোগিতা করে দু'জন প্রকাশক এর দুটো সংস্করণ প্রকাশ করেন। একটি প্রকাশ করেন : বর্মন পাবলিশিং হাউস, অপরটি ডি. এম. লাইব্রেরী। বর্মন পাবলিশিং হাউস সঞ্চয়িতার যে সংস্করণ প্রকাশ করেন, তার প্রথম প্রকাশ :

২রা অক্টোবর, ১৯২৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩০। এতে অগ্নিবীণা, ঝিঙেফুল, সর্বহারা, ফণি-মনসা, ছায়ানট, দোলন চাঁপা, সিন্ধু-হিন্দোল, চিত্তনামা থেকে কবিতা গৃহীত হয়।

ডি. এম. লাইব্রেরীর সংস্করণে নিম্নলিখিত বইগুলো থেকে কবিতা গৃহীত হয়ঃ অগ্নিবীণা, দোলন চাঁপা, ছায়ানট, সর্বহারা, ফণি-মনসা, সিন্ধু-হিন্দোল, চিত্তনামা, ঝিঙে ফুল, বুলবুল, জিঞ্জীর। এ বইখানার প্রথম প্রকাশঃ ১৪ই অক্টোবর, ১৯২৮ সাল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৩। শেষোক্ত সংস্করণই এখন বাজারে চলছে।

৪৪। **সন্ধ্যা**

এতে আছেঃ তরুণ তাপস, আমি গাই তারি গান, জীবন-বন্দনা, ভোরের পাখী, কাল-বৈশাখী, নগদ কথা, জাগরণ, জীবন, যৌবন, তরুণের গান, চল্ চল্ চল্, ভোরের সানাই, যৌবন-জল-তরঙ্গ, রীফ্ সর্দার, বাঙলার আজীজ্, সুরের দুলাল, নিশীথ অন্ধকারে, শরৎচন্দ্র, অন্ধ স্বদেশ-দেবতা, পাথেয়, দাড়ি বিলাপ, তর্পণ, না-আসা দিনের কবির প্রতি। —কবিতার বই। প্রথম প্রকাশঃ ১৩৩৬ সাল।

৪৫। **সর্বহারা**

এতে আছেঃ কৃষাণের গান, শ্রমিকের গান, ধীবরের গান, চোর-ডাকাত, মিথ্যাবাদী, রাজাপ্রজা- সাম্য, প্রার্থনা, চাষার গান, ছাদ পেটার গান, চীন ও ভারত, নারী, চাষীর গান, এই দেশ কার, বিদায়, মাভৈঃ, ডাকাত লইতে এসেছে ডাকাত চাঁদ, শ্রীমান আব্দুল মোহিত চৌধুরী স্নেহ-ভাজনেষু।

প্রথম সংস্করণের সাথে পরের সংস্করণের মিল নেই। অনেক কবিতা ওলোট-পালোট করা হয়েছে।

কবিতা ও গানের সমষ্টি। প্রথম প্রকাশঃ ১৩৩৩ সাল।

৪৬। **সাত ভাই চম্পা**

অনেকে এ-বইটির কথা উল্লেখ করেছেন। 'সাত ভাই চম্পা' নামে কবির পৃথক কোনো বই আছে কিনা, তা' আমাদের জানা নেই।

'পুতুলের বিয়ে' বইখানায় 'সাত ভাই চম্পা' নামে এক দীর্ঘ কবিতা আছে। কিন্তু উহাতে মাত্র চার ভাই-এর কথা আছে। বাদবাকী তিন ভাই ও চম্পার কথা দিয়ে অন্য কোরো বই হয়তো বেরিয়েছিল। কিন্তু তা' আমার চোখে পড়েনি।

৪৭। **সাম্যবাদী**

'সাম্যবাদী' একটি বড় কবিতা। 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ইহা মাত্র দুই আনা দাম দিয়ে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়। এরপর এই কবিতাটি-ই 'সর্বহারা' কবিতা-বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

'সাম্যবাদী' কবিতাটি কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। যথা: সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, বারাঙ্গনা, মিথ্যাবাদী, নারী, রাজা-প্রজা, সাম্য, কুলি মজুর।

প্রথম প্রকাশ: ১৩৩২ সাল। ইং ১৯২৫ সাল।

৪৮। **সিন্ধু হিন্দোল**

এতে আছে: সিন্ধু (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব), গোপন প্রিয়া, অনামিকা, বিদায় স্মরণে, পথের স্মৃতি, উন্মনা, অতল পথের যাত্রী, দারিদ্র্য, বাসন্তী, ফাল্গুনী, মঙ্গলাচরণ, বধূবরণ, অভিযান, রাখী-বন্ধন, চাঁদনী রাত, মাধবী প্রলাপ; দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর।

কবিতা সমষ্টি। প্রথম প্রকাশ: ১৩৩৪ সাল।

৪৯। **সুরমুকুর**

কতকগুলি গানের স্বরলিপি।

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ১৯৩৪ সাল।

৫০। **স্বরলিপি**

কতকগুলি গানের স্বরলিপি। প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৩৩৪ সাল।

৫১। **সুর-সাকী**

গানের সমষ্টি। এতে নিরানব্বইটি গান আছে।

প্রথম প্রকাশ: আষাঢ়, ১৩৩৯ সাল।